বাংলাদেশ
এশিয়াটিক সোসাইটি পত্রিকা

ISSN 1609-4409

দ্বাত্রিংশ খণ্ড	শীত সংখ্যা	পৌষ ১৪২১/ডিসেম্বর ২০১৪

সম্পাদক
মনসুর মুসা

সহযোগী সম্পাদক
প্রদীপ রায়

এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ
৫ পুরাতন সচিবালয় রোড (নিমতলী)
রমনা, ঢাকা-১০০০
বাংলাদেশ

সম্পাদকীয় পর্ষৎ

সভাপতি	:	অধ্যাপক আকমল হোসেন
সম্পাদক	:	অধ্যাপক মনসুর মুসা
সহযোগী সম্পাদক	:	অধ্যাপক প্রদীপ রায়
সদস্য	:	অধ্যাপক নূরুর রহমান খান
		অধ্যাপক মুফাখখারুল ইসলাম
		অধ্যাপক বিশ্বজিৎ ঘোষ
		অধ্যাপক হাফিজা খাতুন
		জনাব একরাম আহমেদ

মূল্য	:	২০০.০০ টাকা
প্রকাশক	:	সাধারণ সম্পাদক
		এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ
মুদ্রণ	:	ক্রিডেন্স প্রিন্টিং প্রেস
প্রচ্ছদ	:	ভদ্রেশু রীটা

Bangladesh Asiatic Society Patrika (Bengali Journal) edited by Professor Monsur Musa, published by the General Secretary, The Asiatic Society of Bangladesh, 5 Old Secretariat Road, Nimtali, Ramna, Dhaka-1000, Bangladesh. Phone: 02-9576391

Price : Tk. 200.00
US$ 10.00

সূচিপত্র

বাংলাদেশের বিজ্ঞান: একবিংশ শতাব্দীর চ্যালেঞ্জ
হারুন-অর-রশিদ ১৩৫

বিশ শতকে বাঙালি মুসলিম নারীর সাহিত্যচর্চার পরিসর ও তাৎপর্য
বেগম আকতার কামাল ১৫৫

বাংলাদেশের নবম জাতীয় সংসদ : একটি পর্যালোচনা
জালাল ফিরোজ ১৬৯

হাসান আজিজুল হকের গল্পে গ্রামীণ জীবন ও প্রকৃতি
রওশন আরা ২০১

আবুল মনসুর আহমদের কয়েকটি অপ্রধান গ্রন্থ ও কিছু অগ্রন্থিত রচনা
মো: চেঙ্গীশ খান ২১৩

সুবোধ ঘোষের ছোটগল্পে ফ্রয়েডীয় মনোবিকলন
মোমেনুর রসুল ২৩৭

ঢাকার ব্যাংক ব্যবস্থা ১৯২১-১৯৭১
চাঁদ সুলতানা কাওছার ২৬৩

আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের গল্পে মুক্তিযুদ্ধ ও উত্তরকাল
সান্‌জীদা মাসুদ ৩০১

সাঈদ আহমদ-এর ত্রয়ী নাটক: বিষয় ও শিল্পরূপ
সানজিদা হক মিশু ৩১৭

লেখকদের প্রতি জ্ঞাতব্য

বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি পত্রিকা-য় এশিয়ার সমাজ, সাহিত্য, শিক্ষা, দর্শন ও প্রাসঙ্গিক বিষয়ে রচিত মৌলিক গবেষণা-প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। লেখকদের জ্ঞাতার্থে পত্রিকায় প্রবন্ধ জমা দেয়ার নিয়মাবলি নিম্নে প্রদত্ত হলো:

১. পত্রিকায় প্রকাশের জন্য এক কপি পাণ্ডুলিপি কম্পিউটার কম্পোজ করে সিডিসহ বা পেন ড্রাইভ-এ জমা দিতে হবে। কম্পিউটার কম্পোজ করার নিয়ম নিম্নরূপ:

- কম্পিউটার কম্পোজ করার জন্য বাংলা বিজয় সফটওয়্যার ব্যবহার করতে হবে (ভারসন বিজয় ৪.০ বা বিজয় ২০০৩)। টাইপ/ ফন্ট SutonnyMJ ব্যবহার করতে হবে।
- কাগজের সাইজ হবে A4। প্রতি পৃষ্ঠায় মার্জিন থাকবে উপরে ২ ইঞ্চি, নিচে ২ ইঞ্চি, ডানে ১ ইঞ্চি এবং বামে ১.৬ ইঞ্চি। প্রবন্ধে লেখকের পেশাগত পরিচয় ও ঠিকানা থাকতে হবে।

২. প্রত্যেক প্রবন্ধের সাথে লেখক-কে/-দের এই মর্মে একটি প্রত্যয়নপত্র জমা দিতে হবে যে:

- জমাকৃত প্রবন্ধের লেখক তিনি/ তাঁরা;
- এটি একটি মৌলিক গবেষণা প্রবন্ধ;
- প্রবন্ধটি ইতোপূর্বে অন্যকোনো পত্রিকা বা গ্রন্থে প্রকাশিত হয়নি কিংবা প্রকাশের জন্য অন্য কোথাও জমা দেওয়া হয়নি;
- এই প্রবন্ধ বিষয়ক সকল দায়িত্ব লেখক বহন করবেন।

৩. প্রকাশের জন্য মনোনীত কিংবা অমনোনীত কোনো পাণ্ডুলিপি ফেরৎ দেওয়া হয় না। প্রবন্ধ প্রকাশিত হলে লেখক পত্রিকার একটি কপি ও প্রবন্ধের ১০ কপি অফপ্রিন্ট বিনা মূল্যে পাবেন।

৪. প্রবন্ধ *বাংলা একাডেমী প্রমিত বাংলা বানানের নিয়ম* অনুসরণে অথবা *সংসদ বাঙ্গালা অভিধান*, *ব্যবহারিক বাংলা অভিধান*, *চলন্তিকা* প্রভৃতি অভিধানের প্রথম ভুক্তি (entry) অনুযায়ী রচিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

৫. উদ্ধৃতির ক্ষেত্রে মূল বানানের কোনো পরিবর্তন হবে না। লেখক কোনো বিশেষ বানান-বৈশিষ্ট্য রক্ষায় সচেষ্ট হলে তা অক্ষুণ্ন রাখা হবে। টীকা ও বক্তব্যের উৎস ও উল্লেখ স্বতন্ত্রভাবে করতে হবে। টীকার ক্ষেত্রে শব্দের ওপর সুপারস্ক্রিপ্টে (যেমন বাংলাদেশ[১]) সংখ্যা ব্যবহার করাই নিয়ম। প্রবন্ধের শেষে সংখ্যা অনুসারে টীকা উপস্থাপন করতে হবে।

৬. বক্তব্যের উৎস উল্লেখের ক্ষেত্রে সরাসরি গ্রন্থ বা প্রবন্ধ-লেখকের নাম, প্রকাশকাল ও পৃষ্ঠা নম্বর উল্লেখ করতে হবে। এশীয়, বিশেষত বাংলার মুসলমানদের নাম পূর্ণভাবে লেখা যাবে। কিন্তু ইউরোপীয় নামের ক্ষেত্রে প্রথমে পদবি ব্যবহার করা হবে।

৭. মূলপাঠের মধ্যে উদ্ধৃতি তিন লাইনের বেশি হলে পৃথক অনুচ্ছেদে তা উপস্থাপন করতে হবে। কবিতার উদ্ধৃতিতে মূলের পঙ্‌ক্তি-বিন্যাস রক্ষা করতে হবে।

৮. বই ও পত্রিকার নাম বাঁকা (italics) অক্ষরে হবে (যেমন, বই: *বৃহৎ বঙ্গ;* পত্রিকা: *বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি পত্রিকা*)। মূলপাঠে বিদেশী শব্দ থাকলে তা-ও একই নিয়মে লিখতে হবে। বিদেশী শব্দ বাংলা বর্ণীকরণের নিয়ম অনুযায়ী লিখিত হবে। কিন্তু ব্যক্তি ও বইয়ের নাম প্রথমবার উল্লেখের সময় তা প্রথম বন্ধনীর মধ্যে ইংরেজীতে লিখতে হবে।

৯. প্রবন্ধের শেষে টীকা (যদি থাকে) এবং টীকার পরে গ্রন্থপঞ্জি সংযোজিত হবে। প্রত্যেক ভাষার গ্রন্থ ও প্রবন্ধ পৃথকভাবে উপস্থাপিত হবে এবং এ উপস্থাপন রীতি হবে বর্ণানুক্রমিক।

১০. প্রবন্ধের একটি সারসংক্ষেপ অবশ্যই দিতে হবে।

বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি পত্রিকা, দ্বাত্রিংশ খণ্ড, শীত সংখ্যা, পৌষ ১৪২১/ডিসেম্বর ২০১৪

বাংলাদেশের বিজ্ঞান: একবিংশ শতাব্দীর চ্যালেঞ্জ*

হারচন-অর-রশিদ**

সারসংক্ষেপ

ইতিহাসের ঊষালগ্ন থেকেই মানুষ প্রশ্ন তুলেছে, "আমরা কি দিয়ে তৈরি?" এ প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গিয়েই আড়াই হাজার বছর আগে গ্রীক দার্শনিকেরা বিজ্ঞান সৃষ্টি করেছিলেন। তাঁরা ধারণা করেছিলেন বস্তুর চূড়ান্ত উপাদান পরমাণু। চিন্তাবিদ লিউসিপ্পাস এবং তাঁর ছাত্র ছিলেন ডেমোক্রিটাস। ৪৮০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দে ডেমাক্রিটাসের ধারণা জগতের বস্তুর সংগঠন জটিল কিছু নয়। তিনি লিখেছেন যে, পরমাণু এবং শূন্যস্থান ছাড়া বাস্তবতায় আর সবকিছুই শুধু মতবাদ। মানুষের জ্ঞানচর্চার জগতে এই সহজ-সরল ধারণা একটা বিরাট অগ্রগতি। ভারতীয় দার্শনিক মহর্ষি কণাদ মনে করতেন জগৎ ক্ষুদ্রতম কণিকা দিয়ে গঠিত। তিনি এদের নাম দিয়েছিলেন 'কণা'। কিন্তু গ্রীক দার্শনিকেরা পরমাণু নিয়ে আলোচনার সূত্রপাত করলেও তাঁরা তা "দেখতে" চাননি। আজ অবশ্য এই ধারণার আমূল পরিবর্তন হয়েছে। এখন আমরা "মৌলিক বস্তুকণা" নিয়ে আলোচনা করি, "রূপরসবর্ণ গন্ধে"র বিচিত্র কোয়ার্ক জগৎ নিয়ে দীর্ঘ প্রবন্ধ রচনা করি। এমনকি ২০১২ সালের দুই নোবেল পুরস্কার পাওয়া পদার্থবিজ্ঞানী হারোস এবং ওয়াইনল্যাণ্ড প্রাতিম্বিক কোয়ান্টাম ব্যবস্থার ওপর, অর্থাৎ, একক ফোটন এবং আয়নের ওপর পরিমাপণ প্রক্রিয়া এবং তাদের নিপুণ পরিচালনা করার ওপরেও অভিনব পরীক্ষণপদ্ধতি সৃষ্টি করেছেন। এসবই আধুনিক বিজ্ঞানের বিভিন্ন চ্যালেঞ্জসমূহ।

ভূমিকা

আমার প্রবন্ধের দুটি অংশ থাকবে। একটি অংশে থাকবে "মৌলিক বস্তুকণা" এবং দ্বিতীয় অংশে থাকবে বাংলাদেশের বিজ্ঞানচর্চা নিয়ে ব্যক্তিগত কিছু কথা। এই কণাজগতের সত্যিকারের স্রষ্টা আমার দৃষ্টিতে ঢাকার সত্যেন্দ্রনাথ বসু। কেননা কোয়ান্টাম পরিসংখ্যানের ওপর বসুর প্রবন্ধটিই প্রকৃতপক্ষে কণাপদার্থবিজ্ঞানের সত্যিকারের সূচনালগ্ন বলা যায়। আলোক-কণা বা ফোটন শুধু কণা হিসেবে আচরণ করে না, তার তরঙ্গ প্রকৃতিও আছে। বসুর ছোট্ট নিবন্ধটি প্রমাণ করে যে, আলো কেবল বিদ্যুৎ চুম্বকীয় তরঙ্গ নয়, কণাও বটে যার নাম ফোটন (photon)। পরবর্তীকালে দেখা যায় যে প্রকৃতির সব বস্তুকণার ক্ষেত্রে একই কথা সত্য।

---

* বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি-এর বিজ্ঞান সেমিনারে উপস্থাপিত, ২রা নভেম্বর ২০১৩ইং

** প্রাক্তন অধ্যাপক, পদার্থবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ইতিহাসের ঊষালগ্ন থেকেই মানুষ প্রশ্ন তুলেছে, "আমরা কি দিয়ে তৈরি?" এ প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গিয়েই আড়াই হাজার বছর আগে গ্রীক দার্শনিকেরা বিজ্ঞান সৃষ্টি করেছিলেন। তারা ধারণা করেছিলেন বস্তুর চূড়ান্ত উপাদান পরমাণু। চিন্তাবিদ লিউসিপ্পাস এবং তাঁর ছাত্র ছিলেন ডেমোক্রিটাস। ৪৮০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দে ডেমোক্রিটাস লিখেছেন:

> পরমাণুর সংখ্যা অসীম এবং তারা অসংখ্য প্রকারের। তারা পরস্পরকে আঘাত করে এবং তাদের গতি ও বিচলন থেকেই শুরচ হয়েছে বিশ্ব। সব বস্তুর বৈচিত্র্য নির্ভর করে তার সংখ্যায়, তার আকৃতিতে এবং সমষ্টিগতভাবে ওই পরমাণুর বৈচিত্র্যের ওপর।

ডেমাক্রিটাসের ধারণা জগতের বস্তুর সংগঠন জটিল কিছু নয়। তিনি লিখেছেন যে পরমাণু এবং শূন্যস্থান ছাড়া বাস্তবতায় আর কোনো কিছু নেই। জ্ঞানচর্চার জগতে এই সহজ-সরল ধারণা একটা বিরাট অগ্রগতি। কিন্তু গ্রীক দার্শনিকেরা পরমাণু নিয়ে আলোচনার সূত্রপাত করলেও তাঁরা তা "দেখতে" চাননি। আজ অবশ্য এই ধারণার আমূল পরিবর্তন হয়েছে। এখন আমরা "মৌলিক বস্তুকণা" নিয়ে আলোচনা করি, "রূপরসবর্ণ গন্ধ"র বিচিত্র কোয়ার্ক জগৎ নিয়ে দীর্ঘ প্রবন্ধ রচনা করি। এমনকি ২০১২ সালের দুই নোবেল পুরস্কার পাওয়া পদার্থবিজ্ঞানী হারোস এবং ওয়াইনল্যাণ্ড প্রাতিস্বিক কোয়ান্টাম ব্যবস্থার ওপর পরিমাপণ এবং তাদের নিপুণ পরিচালনা করার ওপরেও অভিনব পরীক্ষণপদ্ধতি সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছেন। এই দুই বিজ্ঞানী— সার্জ হারোস এবং ডেভিড ওয়াইনল্যাণ্ড ভঙ্গুর কোয়ান্টাম অবস্থা মাপা এবং নিয়ন্ত্রণ করার ব্যবস্থা করতে সক্ষম হয়েছেন— ওই কণার কোয়ান্টাম-প্রকৃতি বিনাশ না করেই। নিঃসন্দেহে এটা আধুনিক বিজ্ঞানের এক বিরাট অর্জন।

২. মৌলিক বস্তুকণা

সভ্যতার উষালগ্নে এক পরমবিস্ময় নিয়ে মানুষ প্রথম প্রশ্ন তোলে, "বস্তু কি"? এই মাহেন্দ্র ক্ষণটি ইতিহাস তা বলে না। এই প্রশ্ন থেকেই সভ্যতার সৃষ্টি কিন্তু এতদিন পরে আজও তার সুনির্দিষ্ট উত্তর আমরা পাইনি। বিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে সভ্যতা আজ অনেক জ্ঞানে সমৃদ্ধ কিন্তু বস্তুর অন্তর্নিহিত রহস্যটি আজও ধরা-ছোয়ার বাইরে। এই রহস্যের সমাধানই মানুষের মনীষার চরম পরীক্ষা। বস্তুর "তত্ত্ব নিহিতম্ গুহায়াম্"— একথা সত্য, তবে সে তত্ত্ব একদিন মানুষের বুদ্ধির আলোকে উদ্ভাসিত হয়ে উঠবেই।

বস্তুজগৎ সম্পর্কে একটি যৌক্তিক ব্যাখ্যা দেওয়ার প্রচেষ্টা বোধ হয় গ্রীকেরাই প্রথম শুরচ করেন। গ্রীকদের ধারণা অনুসারে বস্তুগঠনের জন্য চারটি মূল উপাদানের প্রয়োজন: বাতাস, পানি, আগুন ও মাটি। ভারতের সাংখ্যবাদী দার্শনিকেরাও প্রায় একই সময়ে ধারণা করেছিল দৃশ্যমান জগতের বাইরে কিছু নেই— আর বস্তুর উপাদান হলো 'মৃত্তিকা, জল, বাতাস আর তেজ বা অগ্নি'। এরও কিছু আগে ভারতীয় এক ঋষি 'কণাদ' অনুমান করেছিলেন যে বস্তুজগৎ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বৈচিত্রময় 'কণার' সমষ্টি। গ্রীকদের এই ধারণা পরবর্তীকালে আরব মনীষীরা গ্রহণ করেন এবং মধ্যযুগের বিজ্ঞান মোটামুটি এই ধারণার ওপরই প্রতিষ্ঠিত। তবে বিজ্ঞানের

সত্যিকারের জয়যাত্রা শুরচ হয় ঊনবিংশ শতাব্দী থেকে। এই সময়ে রসায়নশাস্ত্রবিদেরা অসংখ্য পরীক্ষা-নিরীক্ষা সম্পাদন করে পরিষ্কারভাবে প্রমাণ করেন যে, বস্তু মোট ৯২টি মৌলিক উপাদান বা element দিয়ে তৈরি। এই ৯২টি মৌলিক উপাদান তাদের গুণ এবং প্রকৃতি অনুসারে সাজিয়ে একটি সুন্দর তালিকায় স্থাপন করা হলো— এটি তৈরি করেন রচশ রসায়নবিদ এটির বর্তমান নাম 'Periodic Table' যাকে কোনো এক বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক বলেছিলেন 'It's a jolly good instrument'। ঊনবিংশ শতাব্দীর রসায়নশাস্ত্রের সমগ্র জ্ঞানের আলোকে তৈরি মেণ্ডেলিফের এই তালিকা থেকে এক সময় মনে করা হয়েছিল যে মানুষের আর বোধ হয় অজানা কিছু নেই।

কিন্তু তার পরপরই টমসন, রাদারফোর্ড, কুরি এবং অন্য অনেকে আবার নতুন নতুন পরীক্ষা করে প্রমাণ করলেন যে, প্রকৃতির রহস্য জানা এত সহজ নয়। যে ৯২টি উপাদানকে প্রথমে মৌলিক, অর্থাৎ, অবিভাজ্য ভাবা গিয়েছিল তারা মোটেও মৌলিক নয়। এর প্রতিটির অভ্যন্তরে আছে একটি কেন্দ্রিন এবং তার চারদিকে ঘুরে বেড়ায় বিভিন্ন সংখ্যার ইলেট্রন বস্তুকণা। তারপর প্রশ্ন ওঠে, কেন্দ্রিন কি?

এই প্রশ্ন থেকে শুরচ হয়েছে আধুনিক বস্তকণা গবেষণা বিজ্ঞান। এই পর্যন্ত এই গবেষণায় বস্তুর গঠন সম্পর্কে যেসব উত্তর পাওয়া গিয়েছে তা প্রশ্ন সৃষ্টি করেছে আরো বেশি। কারণ, পরীক্ষাগারে বস্তুকণা পাওয়া যাচ্ছে অনেক কিন্তু আজ পর্যন্ত তত্ত্বগত দিক দিয়ে এতগুলি বস্তুকণাকে বুঝবার প্রচেষ্টা সেরকম সার্থক হয়নি। কোনো বিশেষ তত্ত্ব কোনো কোনো পরীক্ষালব্ধ ফল ব্যাখ্যা করে আংশিক সাফল্য লাভ করে কিন্তু সামগ্রিক সাফল্য আনতে পারে এমন তত্ত্ব আজও পাওয়া যায়নি।

এই ব্যর্থতা সম্পর্কে ধারণা করতে হলে বস্তুকণা জগতের "জনসংখ্যা বিস্ফোরণ" সম্বন্ধে পরিচিত হওয়া প্রয়োজন। প্রতি বছর নবাবিস্কৃত সব বস্তুকণা রোজেনফেল্ড সম্পাদিত বহুল প্রচারিত তালিকায় লিপিবদ্ধ করা হয়। এই তালিকা দেখে প্রথমেই প্রশ্ন জাগে যে, তালিকাভুক্ত এতগুলি বস্তুকণা সবই যদি মৌলিক হয় তবে 'মৌলিক' শব্দের অর্থ কি? বলা হয়েছে যে, "সব মানুষই সমান, তবে কিছু মানুষ অন্য সকলের চেয়ে বেশি সমান।' একইভাবে বলা যায় যে, "সব বস্তুকণাই মৌলিক, তবে কিছু বস্তুকণা অন্য সকলের চেয়ে বেশি মৌলিক।"

কণা-জগতের এই বিশেষ গণতন্ত্রের ধারণা এসেছে এক ধরনের গাণিতিক সমীকরণ থেকে যার মূলে আছে পদার্থবিজ্ঞানের কতগুলি সুদৃঢ় ভিত্তিপ্রস্তর, যেমন, কার্যকারণ সম্পর্ক, আপেক্ষিকতত্ত্ব ইত্যাদি। এই সকল তথ্য থেকে দেখানো যায় যে, যদি ক ও খ দুটি মৌলিক বস্তুকণা পরস্পরের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ায় গ নামে একটি তৃতীয় মৌলিক কণা সৃষ্টি করে, তবে একইভাবে ক ও গ মৌলিক কণাদ্বয় খ মৌলিক কণা সৃষ্টি করার ক্ষমতা রাখে। সুতরাং, এই তিনটির মধ্যে কোনটি বেশি মৌলিক এ প্রশ্ন অবান্তর— প্রকৃতি এবং তত্ত্ববিজ্ঞানীর নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গিতে এরা সকলেই সমান।

কণা-জগতের এই অভিনবত্বের প্রতিফলন হয়েছে নবাবিস্কৃত কণাগুলির নামকরণে। এর আগে প্রতিটি বস্তুকণার একটি স্বতন্ত্র নাম দেওয়া সম্ভব ছিল, যেমন ইলেকট্রন, প্রোটন, নিউট্রন ইত্যাদি। অধুনা তা আর সম্ভব নয়। কারণ বস্তুকণাগুলি এখন আর ঠিক মৌলিক বস্তুকণা হিসেবে হাজির হচ্ছে না— তারা দেখা দিচ্ছে রেজোনান্স বা অনুরণন হিসেবে। এসব অনুরণন-কণা কিভাবে আবিস্কৃত হয় তা বলার আগে আমাদের সুপরিচিত কণাগুলির নাম বলে নেওয়া দরকার। এরা হলো: ফোটন বা আলোক কণা, নিউট্রিনো, ইলেকট্রন, মিউঅন, পাই মেসন বা পায়ন, কে-মেসন বা কেয়ন, ইটা-মেসন, প্রোটন, নিউট্রন, ল্যাম্বডা-হাইপেরন, সিগমা-হাইপেরন এবং ক্যাসকেড-হাইপেরন ইত্যাদি। এর মধ্যে ফোটন বা আলোক কণা এবং নিউট্রিনো উভয়ই ভরশূন্য; তবে ফোটনের স্পিন বা ঘূর্ণন-সংখ্যা ১ এবং নিউট্রিনোর স্পিন সংখ্যা ১/২ ($h/2\pi$ এককে)। ইলেকট্রনের ভর প্রায় ১/২ এম.ই.ভি[১] এবং স্পিন ১/২। মিউঅনের স্পিন-সংখ্যা ১/২, তবে তার ভর ১০৫ এম.ই.ভি। গুণগতভাবে ইলেকট্রন আর মিউঅন সমপর্যায়ের এবং এখনও এ প্রশ্ন অমীমাংসিত রয়েছে যে, মিউঅনের প্রয়োজনীয়তা কি ছিল? পাই এবং ইটা মেসন-কে একত্রে 'বোস-কণা' বা বোসন বলা হয় অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ বসুর নাম অনুসারে, কারণ তারা বসু-পরিসংখ্যান মেনে চলে। ফোটনও একটি বোস-কণা। যেসকল বস্তুকণার স্পিন-সংখ্যা ০, ১, ২, ৩, ... ইত্যাদি তারাই বসু-পরিসংখ্যান মেনে চলে এবং তাদের পারিবারিক নাম বোসন।

অন্যদিকে প্রোটন এবং নিউট্রনের ভর প্রায় ৯৪০ এম.ই.ভি. এবং এদের স্পিন-সংখ্যা ১/২। ল্যাম্বডা, সিগমা এবং ক্যাসকেড হাউপেরনের স্পিন-সংখ্যাও ১/২, তবে এদের ভর যথাক্রমে ১১১৫, ১১৯০ এবং ১৩১৫ এম.ই.ভি। এসকল বস্তুকণা যাদের স্পিন ১/২, ৩/২, ১/২ ইত্যাদি তারা একত্রে ফার্মিয়ন নামে পরিচিত; কারণ এরা ফার্মির পরিসংখ্যান মেনে চলে। বস্তুকণা-জগৎকে এভাবে দুটি পারিবারিক নাম দিয়ে ভাগ করা হয়েছে: বোসন এবং ফার্মিয়ন। নতুন যেসব বস্তুকণা আবিষ্কৃত হচ্ছে তারাও এই দুই পরিবারের মধ্যেই স্থানলাভ করে।

এই সুপরিচিত বস্তুকণাগুলির কয়েকটি স্থায়ী যেমন ফোটন, ইলেকট্রন এবং প্রোটন। অন্যগুলির জীবনকাল খুব কম গড়ে $১০^{-১০}$ সেকেন্ড। অধুনা যে কণাগুলি আবিষ্কৃত হচ্ছে তারা আরো ক্ষণস্থায়ী। অত্যন্ত অল্প সময়ের মধ্যেই এসব নতুন নশ্বর কণা দুই বা ততোধিক উপর্যুক্ত পরিচিত কণায় ভেঙে যায়। যেমন ধরা যাক, ডেল্টা-রেজোনান্সটিক। এই অনুরণন-কণাটি, যার ভর ১২৩৮ এম.ই.ভি., $১০^{-১০}$ সেকেণ্ডের মধ্যে ভেঙে একটি প্রোটন এবং একটি পায়ন তৈরি করে। অর্থাৎ ডেল্ট (১২৩৮)$\rightarrow$ প্রোটন + পায়ন।

সুতরাং, বলা যায় যে একটি প্রোটন এবং একটি পায়ন-কণার যৌগিক অবস্থার নামই হলো ডেল্টা (১২৩৮)। এই অনুরণনটি পায়ন এবং প্রোটনের বিচ্ছুরণ-প্রক্রিয়ায় প্রথম ধরা দিয়েছিল। পায়ন এবং প্রোটনের বিচ্ছুরণ-প্রস্থচ্ছেদ ঠিক ১২৩৮ এম.ই.ভি. শক্তিতে অত্যন্ত

---

[১] ইলেকট্রনের ভর ০.৫ এম.ই.ভি. বা ৯×১০^{-২৮} গ্রাম।

বেশি হয়ে যায়। বিচ্ছুরণ-প্রস্থচ্ছেদের এই সহজ-লক্ষ্য চূড়াকেই ডেল্টা (১২৩৮) কণা বলা হয়। পায়ন এবং প্রোটনের বিচ্ছুরণ-প্রক্রিয়ার আরো ছোট-বড় চূড়া দেখা যায় এবং এর প্রত্যেকটির অনুরূপভাবে নামকরণ করা হয়েছে।

শুধু যে পায়ন এবং প্রোটনের বিচ্ছুরণ-প্রক্রিয়ায় এই অনুরণন-কণা আবিস্কৃত হয়েছে তা নয়। প্রোটনের উপর বিপুল শক্তিসম্পন্ন ফোটন বিচ্ছুরণ করেও এই অনুরণন-কণা পাওয়া যায়। ফোটনের বিচ্ছুরণ প্রস্থচ্ছেদে ঠিক একইভাবে ডেল্টা (১২৩৮) এবং অন্যান্য অনুরণন-কণা ধরা পড়েছে।

এইভাবে এ পর্যন্ত শতাধিক অনুরণন-কণা পরীক্ষাগারে আবিষ্কৃত হয়েছে যার সুদীর্ঘ তালিকা বার্কলে গবেষণাগার থেকে প্রতি বছর দুবার কণাবিদদের কাছে পাঠানো হয়। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, এই বিপুল সংখ্যক বস্তুকণাগুলিকে কিভাবে পর্যায়ভুক্ত করা যায় বা (periodic) তালিকা তৈরি করা যায়? একটি সাধারণ বিভাগ বোসন এবং ফার্মিয়ন, যা ইতিমধ্যেই উলেøখ করা হয়েছে। এ ছাড়া কি কণাজগতের জটিলতার গ্রন্থি খোলার আর কোনো সাধারণ নিয়ম কি নেই?

এই প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে এ পর্যন্ত দুটি বিশেষ কার্যকরী ধারণার অবতারণা করা হয়েছে। একটি হলো এস.ইউ. (৩) নকশা (su(3)) এবং অন্যটি হলো রেজ্জে (Regge) পরিক্রমণ-পথ। এই দুটি নকশাই সম্পূর্ণ গাণিতিক। সুতরাং, সহজ ভাষায় ব্যাখ্যা করা দুরূহ। তবে এই দুই নকশার ফল কিছু উলেøখ করা যায়।

এস.ইউ. (৩) গণিতের গ্রচপ-তত্ত্বের একটি অংশ। পদার্থবিদ্যায় গ্রচপ-তত্ত্বের প্রথম প্রয়োগ আমরা পাই কৌণিক ভরবেগের আলোচনায়।

এই কৌণিক ভরবেগ এস.ইউ. (২) (su(2)) গ্রচপের সুনির্দিষ্ট বীজগণিত অনুসরণ করে। এস.ইউ. (২) বীজগণিতের ১/২-মাত্রিক, ৩/২-মাত্রিক ইত্যাদি বিভিন্ন সম্ভাব্য প্রতিকৃতিতে আমরা আমাদের প্রোটন, ডেল্টা (১২৩৮) ইত্যাদি বস্তুকণাগুলিকে বসাতে পারি, কারণ প্রোটনের স্পিন ১/২, ডেল্টার স্পিন ৩/২ ইত্যাদি। এই ধারণার যৌক্তিক প্রসারণ থেকেই এস.ইউ.(৩)- বীজগণিতের ব্যবহার কণাজগতে সম্ভব হয়েছে। এস.ইউ. (৩) বীজগণিতের সর্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় প্রতিকৃতি অষ্টমাত্রিক। এই অষ্টমাত্রিক প্রতিকৃতিতে ৮টি মেসন যথা ধন (+) ও ঋণ (-) বিদ্যুৎচার্জযুক্ত পায়ন, বিদ্যুৎহীন পায়ন, ধনবিদ্যুৎসম্পন্ন কেয়ন, বিদ্যুৎহীন কেয়ন, বিদ্যুৎহীন প্রতি-কেয়ন (অ্যান্টি-কেয়ন), ঋণ বিদ্যুৎসম্পন্ন কেয়ন এবং বিদ্যুৎহীন ইটা-মেসন-কে বসানো যায়। ঠিক একইভাবে প্রোটন, নিউট্রন, ধন, ঋণ এবং শূন্য বিদ্যুতের সিগমা, ঋণ-বিদ্যুতের আর বিদ্যুৎহীন ক্যাসকেড এবং ল্যাম্বডা— এই আটটি বস্তুকণাকেও অষ্টমাত্রিক প্রতিকৃতিতে বসানো যায়।

এস.ইউ. (৩) নকশা শুধু যে বস্তুকণাগুলিকে এভাবে পর্যায়ভুক্ত করে তাই নয়, এই নকশা থেকে বস্তুকণাগুলির ভর সম্পর্কিত একটি গাণিতিক সমীকরণ নির্ধারণ করা যায়। অষ্টমাত্রিক প্রতিকৃতির বোসন সম্পর্কে এই সমীকরণটি নিম্নরূপঃ

পায়নের ভরের বর্গ + ৩ × ইটা -মেসনের ভরের বর্গ= ৪ × কেয়নের ভরের বর্গ

এই সমীকরণটিকে গেলম্যান-ওকুবো সমীকরণ বলে। পরীক্ষণলব্ধ ভর এই সমীকরণটিকে সুন্দরভাবে সার্থক করে। অষ্টমাত্রিক প্রতিকৃতির নিউট্রন, প্রোটন, সিগমা এবং ল্যাম্বডা বস্তুকণা সম্পর্কেও এই ধরনের একটি সমীকরণ নির্ধারণ করা যায় এবং সেটিও সুন্দরভাবে সার্থক। ডেল্টা অনুসরণগুলি এস.ইউ. (৩) বীজগণিতের দশ-মাত্রিক প্রতিকৃতিতে বসানো হয়েছে এবং একইভাবে একটি ভরের সমীকরণ নির্ধারণ করা হয়েছে। তবে এই গাণিতিক সূত্র যখন নির্ধারণ করা হয় তখন ওই প্রতিকৃতির উপযুক্ত মাত্র নয়টি বস্তুকণা জানা ছিল। সমীকরণটি ব্যবহার করে অজ্ঞাত দশম বস্তুকণার ভর ১৬৭৫ এম.ই.ভি. হবে বলে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন মারে গেলমান। এই ওমেগা (১৬৭৫) বস্তুকণা পরে আবিষ্কৃত হয় এবং এটাকে এস.ইউ. (৩) নকশার অন্যতম বিজয় হিসেবে ধরা হয়।

রেজ্জে তত্ত্বের মূল পরিকল্পনা গণিতের আশ্রয় ছাড়া প্রকাশ করা দুঃসাধ্য। তবে এটুকু বলা যায় যে, রেজ্জে তত্ত্বে স্পিন বা কৌণিক ভরবেগকে বাস্তব সংখ্যা হিসেবে না নিয়ে সম্পূর্ণ গাণিতিক কারণে যৌগিক সংখ্যা হিসেবে ব্যবহার করা হয়। এভাবে কৌণিক ভরবেগের সঙ্গে ভরের একটি রৈখিক নির্ভরশীলতা নির্ধারণ করা যায়। কৌণিক ভরবেগ এবং ভরের এই অপেক্ষককে রেজ্জে-পরিক্রমণ পথ বলে। বস্তুকণা-জগতের প্রায় সবগুলিকেই এই ধরনের অপেক্ষকের উপর সুন্দরভাবে বসানো যায়। রেজ্জে-তত্ত্ব এভাবে ব্যবহার ছাড়াও বিচ্ছুরণ প্রক্রিয়ার প্রস্থচ্ছেদ পর্যালোচনায় তা যথেষ্ট অবদান রেখেছে। অতিসম্প্রতি কণাবিজ্ঞানে যে গবেষণা চলছে তা এস.ইউ. (৩) এবং রেজ্জে তত্ত্বেরই বহুমুখী প্রসারণ—একথা বলা যায়।

তবে কণাজগৎ সম্পর্কে সম্যক ধারণা এই দুই তত্ত্বের কোনোটার মধ্য দিয়ে আসবে তা নিশ্চিত করে বলা যায় না। অতিসম্প্রতি ষ্টানফোর্ড এবং ব্রুকহাভেন গবেষণাগার থেকে যে নতুন সাইজে-বস্তুকণা আবিষ্কারের কথা ঘোষণা করা হয়েছে তা এই দুই তত্ত্বের কোনোটা দিয়েই বোধ হয় ব্যাখ্যা করা যায় না। সুতরাং, নতুন ধরনের তত্ত্বের প্রয়োজন আজ অত্যন্ত জরুরি। পদার্থবিজ্ঞানে এ ধরনের তাত্ত্বিক অসম্পূর্ণতা এই শতাব্দীর প্রথমদিকে এসেছিল যা থেকে সৃষ্টি হয়েছে কোয়ান্টামবাদ। পদার্থবিজ্ঞানে অবশ্যম্ভাবী আর এক বৈপøবিক চিন্তাধারা মানুষের সভ্যতাকে আবার নতুন দিগন্তে নিয়ে যাবে— একথা নিশ্চিত করে বলা যায়।

৩. বিজ্ঞানের সামাজিক পটভূমি ও উৎস

ভূমিকাঃ বিজ্ঞানের অসংখ্য অবদান আজ দৈনন্দিন জীবনের সামগ্রী, বৈজ্ঞানিক চিন্তাভাবনা আজ জনমানসের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতি, অফিস-আদালত-শিক্ষাঙ্গন কিছুই বিজ্ঞানের সোনার পরশ থেকে বঞ্চিত নয়। সবচেয়ে বড় কথা বিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞান মানুষকে

যেভাবে সমাজ সচেতন, অধিকারবোধসম্পন্ন করেছে এর আগে কখনো তা হয়নি। প্রতিটি মানুষ তার মেধা ও কর্মক্ষমতা অনুযায়ী সুখী ও স্বাচ্ছন্দ্যময় জীবনের অধিকারী এ ধারণা বিজ্ঞানই জন্ম দিয়েছে— রুশো-ভল্টেয়ার-মার্ক্স্-লেলিনের লেখনী যার প্রকাশ মাধ্যম মাত্র। বিজ্ঞান প্রমাণ করেছে যে অনাহারে, বিনাচিকিৎসায়, বিনাবাসস্থানে, বিনাবস্ত্রে জীবনধারণের অভিশাপ থেকে মানুষকে মুক্ত করা সম্ভব। তবু কেন দেশে দেশে দুঃখ-দারিদ্র্য-দুর্ভিক্ষ, রোগ-শোক-মহামারী— এ প্রশ্নের উত্তর খোঁজার উদ্দেশ্য নিয়েই এই আলোচনার সূত্রপাত বলে আমি মনে করি।

অবশ্য আলোচনার বিভিন্ন অংশে হয়ত প্রয়োজনীয় আলোকপাত করা আমার পক্ষে সম্ভব হবে না। তা ছাড়া পদার্থবিজ্ঞানের ছাত্র বলে হয়ত আমার আলোচনায় পদার্থবিজ্ঞান বেশি স্থান পাবে। তবু প্রথমেই বলে রাখি যে বিজ্ঞানের সব শাখার প্রতি শ্রদ্ধা সমান।

তবে আলোচনাকে নিতান্ত সহজ এবং হালকা করার ইচ্ছাও আমার নেই। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ এখানে আমার পথপ্রদর্শক। তিনি তাঁর অনবদ্য "বিশ্ব পরিচয়" গ্রন্থের ভূমিকায় লিখেছেন:

> এই বইখানিতে একটি কথা লক্ষ করবে— এর নৌকাটা অর্থাৎ এর ভাষাটা যাতে সহজে চলে সে চেষ্টা এতে আছে কিন্তু মাল খুব বেশি কমিয়ে দিয়ে একে হাল্কা করা কর্তব্য বোধ করিনি। দয়া করে বঞ্চিত করাকে দয়া বলে না। আমার মত এই যে যাদের মন কাঁচা তারা যতটা স্বভাবত পারে নেবে, না পারে আপনি ছেড়ে দিয়ে যাবে, তাই বলে তাদের পাতটাকে প্রায় ভোজশূন্য করে দেওয়া সদ্ব্যবহার নয়। যে বিষয়টা শেখবার সামগ্রী, নিছক ভোগ করবার নয়, তার উপর দিয়ে অবাধে চোখ বুলিয়ে যাওয়াকে পড়া বলা যায় না। মন দেওয়া এবং চেষ্টা করে বোঝাটাও শিক্ষার অঙ্গ, সেটা আনন্দেরই সহচর। ... জ্ঞানের যেমন আনন্দ আছে তেমনি তার মূল্যও আছে, ছেলেবেলা থেকে মূল্য ফাঁকি দেওয়া হয়। চিবিয়ে খাওয়াতেই একদিকে দাঁত শক্ত হয় আর একদিকে খাওয়ার পুরো স্বাদ পাওয়া যায় ...।

বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে বিজ্ঞান নিয়ে আলোচনা রবীন্দ্রনাথ শুরু করেছেন, কিন্তু দ্বিতীয়ার্ধের প্রগতি তিনি দেখে যেতে পারেননি। বিজ্ঞান যেমন আজ দ্রুত পরিবর্তনশীল, মানুষের সমাজও তেমনি আমূল ভাঙাগড়ার বিপøবের মুখোমুখি। বিজ্ঞান এবং সমাজের বিপøব যে প্রায় একত্রে ঘটে এটা কোনো বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে বিজ্ঞানই সমাজ পরিবর্তনের একমাত্র হাতিয়ার। বিগত দুশো বৎসরের বিজ্ঞানের জয়যাত্রা মানুষের অর্থনৈতিক ও সামাজিক জীবনকে যেভাবে ঢেলে সাজিয়েছে এর আগে তা কখনো হয়নি। শুরু থেকেই বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সমাজের নানা সমস্যার সমাধান দিয়েছে এবং একই সঙ্গে সমস্যারও সৃষ্টি করেছে। এরিষ্টটল এবং গ্যালিলিও তাঁদের সমসাময়িকদের শিক্ষা দিয়েছেন এবং সঙ্গে সঙ্গে সমাজের শিরঃপীড়ার কারণও হয়েছেন। জেমস ওয়াট বাষ্পচালিত ইঞ্জিন সৃষ্টি করে শিল্পবিপøবের গোড়াপত্তন করেছেন এবং একই সঙ্গে সমাজে সংকটেরও সৃষ্টি করেছেন। এনরিকো ফার্মি আণবিক চুলিø তৈরি করেছেন, কিন্তু তার থেকেই ভয়াবহ "আণবিক" সভ্যতার উত্তরণ ঘটেছে।

বিজ্ঞানীরা শুধু যে বিমূর্ত গবেষণা নিয়েই খুশি থাকেন তা নয়। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি যেসব সমস্যার উদ্ভব করেছে সে সম্বন্ধেও তাঁরা সম্পূর্ণ সচেতন। গ্যালিলিও শুধু আবিষ্কার করেই নিশ্চিত ছিলেন না- তাঁর আবিষ্কার ব্যাখ্যা করার দায়িত্বও তিনি অনুভব করেছিলেন। অ্যালফ্রেড নোবেল তাঁর আবিষ্কারের ফসল সম্বন্ধে বিবেকের দংশনে ভুগেছেন। শ্রেষ্ঠ জ্ঞানতাপস্বী অ্যালবার্ট আইনষ্টাইনও শতাব্দীর বিজ্ঞান ও সমাজে সংঘাতের সবচেয়ে গুরচত্বপূর্ণ প্রশ্নে দ্ব্যর্থহীন কেন্দ্রীয় ভূমিকা পালন করেছেন।

এই আণবিক যুগে বিজ্ঞানীর পক্ষে সামাজিক বিভিন্ন প্রশ্নে জড়িত হয়ে পড়া সাধারণ ঘটনা। রাসেল, পাউলিং, ম্যাক্স বর্ণ, রেনে ডুবস, জর্জ ওয়াল্ড, নিলস্ বোর, হ্যানস্ রেখে, ভিক্টর ভাইসকফ সামাজিক সমস্যায় তাঁদের অকৃত্রিম উৎকণ্ঠা ব্যক্ত করেছেন। অতি সম্প্রতি পৃথিবীর বিজ্ঞানীরা আণবিক অস্ত্র প্রসাররোধের জন্য সক্রিয় পদক্ষেপ নিয়েছেন।

আমরা এখন এমন এক ক্রান্তিলগ্নে এসে পৌঁছেছি যখন এক সমাজব্যবস্থা থেকে অন্য সমাজব্যবস্থায় দ্রচত যুগ পরিবর্তন হয়ে যাচ্ছে। যেকোনো বিবেকবান বিজ্ঞানী শুধুমাত্র পরীক্ষাগার আর গ্রন্থাগারের চারদেয়ালের মধ্যে আবদ্ধ থাকতে পারেন না। এখন মানুষের ভবিষ্যৎ কেবলমাত্র রাজনীতিবিদ বা সমরনায়কদের হাতে ছেড়ে দেওয়া যায় না।

দৈনন্দিন জীবনে বিজ্ঞান: আমাদের জীবনে বিজ্ঞান প্রযুক্তির প্রভাব আজ সর্বব্যাপী। আজকের নাগরিক জীবনের প্রতিটি জাগ্রত মুহূর্তে, প্রতিটি কর্মকাণ্ডে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ব্যবহৃত হচ্ছে। দিন শুরচ হয় যানবাহনের যান্ত্রিক শব্দ কান নিয়ে যার সামান্য বিরতিও ভরে দেয় পাশের দোকানের রেডিও অথবা আকাশে ধাবমান জেট বিমানের প্রচণ্ড আওয়াজ। ভোরের ফ্লোরাইড টুথপেষ্ট থেকে শুরচ করে রাতের রঙিন টেলিভিশন— এর কোনোটাই আমাদের পূর্বসূরিদের কল্পনার মধ্যেও ছিল না।

গ্রামীণ পরিবেশের ওপরও বিজ্ঞান বিপুল প্রভাব বিস্তার করেছে। রাসায়নিক সার এবং কীটপতঙ্গ নাশক ওষুধের ব্যবহার জমির উৎপাদনশক্তি অভূতপূর্বভাবে বাড়িয়ে দিয়েছে। কিন্তু শস্যের প্রাচুর্যের সঙ্গে প্রকৃতির ওপর এমন প্রতিক্রিয়াও হয়েছে যার সবটাই শুভ নয়। কীটনাশক ওষুধ উপকারী কীট, পাখি এবং নদীর মাছও ধ্বংস করেছে।

প্রকৃতির কোমল ভারসাম্য আজ মানুষের ক্রমাগত আঘাতে বিপর্যস্ত। নদীর উপরে বাঁধ, ভরাট জলাভূমি প্রকৃতিতে আমূল পরিবর্তন এনেছে। চিন্তাহীনভাবে মানুষ দূষিত পদার্থ নদী, খাল, বিলের মধ্যে ফেলেছে, কলকারখানার ধোঁয়া দিয়ে বায়ুমণ্ডলকে বিষাক্ত করেছে। প্রতিদিন আমরা বিপুল পরিমাণ রাসায়নিক পদার্থ গলাধঃকরণ করছি ওষুধ হিসেবে। এ সবই প্রকৃতি এবং মানুষের উপর সুদূরপ্রসারী প্রভাব বিস্তার করেছে।

অন্যদিকে জীববিজ্ঞান ও চিকিৎসাবিজ্ঞানের অগণিত অবদান কোটি কোটি মানুষের জীবন রক্ষা করেছে। অ্যান্টিবায়োটিক, হৃৎপিণ্ড শল্যবিদ্যা, শরীরে নতুন অংশ সংযোজন, তেজস্ক্রিয় পদার্থ দিয়ে রোগনির্ধারণ ও নিরাময়, কম্পিউটার চালিত রঞ্জনরশ্মি দিয়ে মস্তিষ্কের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ছবি

তোলা— এ সবকিছুই চিকিৎসাবিজ্ঞানে বিপøব এবং রোগাক্রান্ত ও মুমূর্ষুর জন্য নতুন জীবনের আশা এনে দিয়েছে। যেকোনো নবজাত শিশু ভবিষ্যতে স্বাস্থ্যবান, সুখী এবং সার্থক জীবনযাপন করবে এটা আজ শুধু কবির কল্পনা মাত্র নয়। অবশ্য সবটাই অবিমিশ্র আশীর্বাদ তাও বলা যায় না। মৃত্যুর হার কমে যাওয়ার ফলে জনসংখ্যার বিস্ফোরণ ঘটেছে এবং আনুষঙ্গিকভাবে এসেছে খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান এবং শিক্ষার চিরাচরিত সমস্যা ও বহুমাত্রিক।

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি যেসব সমস্যার সৃষ্টি করেছে তার সমাধানও বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির মধ্যেই নিহিত। পর্যাপ্ত খাদ্য, বস্ত্র উপাদান, বাসস্থান নির্মাণ, শিক্ষার ব্যবস্থা আজ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ব্যবহার করে সমাধান সম্ভব। কিন্তু মানুষ এই অপার সম্ভাবনার সম্পূর্ণ সুযোগ নেবে কি না তাই আজ প্রধান বিবেচ্য বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে।

ত্বরান্বিত বিজ্ঞান প্রগতি

আমরা সত্যিই আজ এক চাঞ্চল্যকর এবং রোমাঞ্চকর যুগে বাস করছি। এমন কোনো সপ্তাহ যায় না যখন বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির নতুন নানা আবিষ্কারের কথা ঘোষণা করা হয় না। শুক্র গ্রহে রকেট প্রেরণ সৌরজগতের রহস্যের উপর নতুন আলোকপাত করেছে, মারাত্মক রোগের জন্য নতুন প্রতিষেধক আবিষ্কৃত হচ্ছে, উপগ্রহ স্থাপন করে তথ্য আদান-প্রদানের ক্ষেত্রে যুগান্তকারী পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে, জীবকোষের মৌলিক রাসায়নিক প্রক্রিয়া আবিষ্কার করে জীবনরহস্য চূড়ান্তভাবে উদ্ঘাটনের সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়েছে।

কিন্তু ফুটন্ত চঞ্চলতার এই যুগ অতি সাম্প্রতিক। কোটি কোটি বৎসর ধরে মানুষ অজ্ঞানতা আর কুসংস্কারের অন্ধকারে হাতড়িয়ে বেড়িয়েছে। সহস্র কোটি বৎসর আগে উষ্ণ সমুদ্রের মাঝে একটি পরমাশ্চর্য ব্যতিক্রমের উদ্ভব হয়েছিল যা নিজেকে পুনরচৎপাদন করতে পারে। সেই শুরচ থেকে কোটি কোটি বৎসরের বিবর্তনের সুদীর্ঘ পথ পেরিয়ে জীবনের সৃষ্টি হয়েছে যে জীবন একদিন পৃথিবীর পানি, জমি ও বায়ুতে পরিব্যাপ্ত হয়েছে।

তারপর কোনো এক সময়— কখন কেউ জানে না— এমন একটি জীবনের উদ্ভব হয় যে তার সমগ্র জীবনের অভিজ্ঞতা তার বংশধরের কাছে দিয়ে যাবার ক্ষমতা পেয়েছিল। এ হস্তান্তর উত্তরাধিকার সূত্রে নয়, শিক্ষা এবং জ্ঞানের মাধ্যমে। বাঁচার সংগ্রামে এই নতুন ক্ষমতা নিঃসন্দেহে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় শক্তি ছিল। এই শক্তিকে উত্তরোত্তর বৃদ্ধি করেছে মস্তিষ্কের ক্ষমতা বাড়ানোর অবিরাম প্রচেষ্টা। কিন্তু একক মস্তিষ্কের ক্ষমতাও সীমাবদ্ধ। তাই প্রয়োজন হয়েছে যূথবদ্ধ সমাজের যেখানে প্রতিটি মানুষ তার বিশেষ জ্ঞান নির্দ্বিধায় তার বংশধরের কাছে দিয়ে যেতে পারে। এর পরে জ্ঞানার্জনের ক্ষেত্রে আর একটি বিশাল পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে যখন নতুন সভ্য মানুষ তার জ্ঞান লিপিবদ্ধ করার প্রক্রিয়া আবিষ্কার করেছে।

যদিও হাজার বৎসর ধরে জ্ঞান আহরণের প্রক্রিয়ায় উত্থান-পতন হয়েছে তবু বলা যায় যে পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতাব্দীতেই এই প্রক্রিয়ায় একটি ঝলক পরিবর্তন—কোয়ান্টাম জাম্প্-

সংঘটিত হয়েছিল। রেনেসাঁর যুগে এই আকস্মিক পরিবর্তনের কারণ ছিল মানুষের চিন্তা ও কর্মধারায় তখন নতুন জাগরণ ও দিকনির্দেশ।

জ্ঞান আহরণের ত্বরান্বিত প্রক্রিয়া আজও অব্যাহত। ১৫০০ থেকে ১৭৫০ এই আড়াইশো বৎসরে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির যে প্রগতি হয়েছে তা মানবজাতির পূর্ব ইতিহাসের সমগ্র জ্ঞানের সমষ্টির সমান। ১৭৫০ থেকে ১৯০০ এই দেড়শ বৎসরে আবার জ্ঞান দ্বিগুণ হয়েছে। আশ্চর্য হলেও সত্য যে ১৯৫০ থেকে ১৯৬০ এই দশ বৎসরে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ক্ষেত্রে মানুষ যে জ্ঞানার্জন করে তা পূর্ববর্তী দশ লক্ষ বৎসরের আহরিত জ্ঞানের সমান।

যদি ধরে নেওয়া হয় যে প্রতি দশ বৎসরে মানুষের জ্ঞান দ্বিগুণ হবে তাহলে আগামী কয়েক বংশধরদের জীবনে যে জ্ঞান সঞ্চিত হবে তার পরিমাণ অবিশ্বাস্য। ১৯০০ সাল পর্যন্ত অর্জিত মানুষের জ্ঞান সমষ্টিক এক ধরে নিলে, ২০২০ সালে তার পরিমাণ হবে এক হাজার এবং একবিংশ শতাব্দীর শেষে তা হবে দশ লক্ষ। এই অবিশ্বাস্য জ্ঞান বিস্ফোরণের দিনে আমাদের নেপথ্যবাসিনী, অবগুণ্ঠনে আবৃতা বাংলা মায়ের কি অবস্থা হবে? সেদিনও কি আমরা নাটোরের বনলতা সেন-কে খোঁজাই একমাত্র কাজ বলে মনে করব?

বিজ্ঞানের প্রকৃতি

অজানাকে জানার অদম্য কৌতূহলই সৃষ্টি করে বিজ্ঞান। এই কৌতুহলই সভ্যতার চালিকাশক্তি। যুগ যুগ ধরে মানুষ তার চারপাশের ঘটনার পশ্চাতে নিয়ম, আপাতবিশৃঙ্খলার অন্তর্লীন একত্রীকরণের সূত্রটি খুঁজে বেড়িয়েছে। বিশ্বরহস্যের নকশা খোঁজার এই অভিযান শুরচ হয়েছে দুটি প্রশ্ন থেকে— "কেন" এবং "কেমন করে"? "কেন" প্রশ্ন থেকে জন্ম নিয়েছে দার্শনিক এবং আধ্যাত্মিক চিন্তাধারা যার জন্য প্রাচ্য সভ্যতা বিখ্যাত। কিন্তু "কেমন করে" এই প্রশ্নই রেনেসাঁ-উত্তর ইউরোপকে উদ্বুদ্ধ করেছে সবচেয়ে বেশি। বুদ্ধির জগতে আলোড়ন সৃষ্টির সময় তখন অনুকূল, পরিবেশ তখন উপযুক্ত। সমস্যা সমাধানের ঐতিহ্যবাহী পদ্ধতিতে মানুষ আর সন্তুষ্ট নয়— চিরাচরিত প্রথার অন্ধ অনুসরণ থেকে সে চেয়েছে মুক্তি। এইভাবে সত্যের সন্ধানে বেরিয়ে পড়ে মানুষ সৃষ্টি করেছে চিন্তার জগতে নতুন যুগ— বিজ্ঞানের যুগ।

আমরা আজও সেই বিজ্ঞানের যুগে বাস করছি— আগের চাইতে অনেক বেশি নিবিড়ভাবে এবং আমার বিশ্বাস করতে ইচ্ছা হয় যে বাংলাদেশেও এই বিজ্ঞানের যুগেই সগর্বে অবস্থান করছে।

আধুনিক সভ্যতার শুরচ বিজ্ঞানভিত্তিক প্রযুক্তি দিয়ে একথা অবশ্য পুরোটা সত্য নয়। মধ্যযুগের শেষে যে আধুনিকতার ধারা শুরচ হয় তার মূলকারণ ছিল কৃষি থেকে খাদ্যের বাড়তি উৎপাদন। এর ফলে নগরভিত্তিক সভ্যতার উৎপত্তি হয়েছে যেখানে শিল্প-কারখানা এবং শিক্ষা-সংস্কৃতির বিভিন্ন কর্মকাণ্ড সম্ভব ছিল। আর সংস্কৃতির একটি প্রধান অঙ্গ হলো বিজ্ঞান। ফ্রান্সিস বেকনের চিন্তাধারা বা রয়েল সোসাইটির প্রতিষ্ঠা সত্ত্বেও অষ্টাদশ শতাব্দী

পর্যন্ত সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবনে এই নতুন বিজ্ঞানের প্রভাব ছিল খুবই কম। স্যামুয়েল জনসনের ভাষায়:

> আগের যুগের দার্শনিকেরা যখন রয়েল সোসাইটিতে মিলিত হলেন, প্রয়োজনীয় শিল্পের আকস্মিক উন্নতির বিরাট আশা সৃষ্টি হলো। মনে হয়েছিল সময় নিকটবর্তী যখন ইঞ্জিনগুলি অবিরাম গতিতে চলবে, সর্বজনীন ওষুধে স্বাস্থ্যরক্ষা হবে, জ্ঞানার্জন সহজ হবে তার প্রকৃত চরিত্র দিয়ে এবং বাণিজ্যের প্রসার হবে এমন জাহাজ দিয়ে যা ঝড়ের প্রতিকূলে ধাবমান হয়ে বন্দরে পৌঁছাতে পারে। কিন্তু উন্নতি স্বাভাবিক কারণে মন্থর। সোসাইটির সভা হলো এবং জীবনের দুঃখ-দুর্দশার দৃষ্টিগোচর লাঘব হওয়া ছাড়াই সভাটি ভঙ্গ হলো।

বাংলাদেশেও এই ধরনের সভা হয়— অতি সম্প্রতি ঢাকা শহরেও তা অনুষ্ঠিত হয়েছে। কিন্তু এর ফলে মানুষের দুঃখ-দুর্দশার কমতি হয়েছে তা হয়তো বলা যায় না।

আসলে সমাজ যেটুকু বিজ্ঞান চায় তাই সৃষ্টি হয়— তার বেশি নয়। রোমান যুগেও পানির কল-ওয়াটার মিল-জানা ছিল, কিন্তু তা ব্যবহার হয়নি। বায়ুতাড়িত কল নিজের দেশ হল্যান্ডেও খুব বেশি ব্যবহৃত হয়নি। সুরম্য গথিক অট্টালিকা নির্মিত হয়েছে পদার্থের গঠনশক্তির গাণিতিক তত্ত্ব না জেনেই। বিজ্ঞানের ফল প্রযুক্তি— একথা সর্বাংশে সত্য নয়, বরং উল্টোটাই সত্য অন্তত প্রাথমিক যুগে।

ঊনবিংশ শতাব্দীতে এই অবস্থার সম্পূর্ণ পরিবর্তন ঘটে। তাপবলবিদ্যা হলো শেষ বৈজ্ঞানিক শৃঙ্খলা যার মৌলিক তত্ত্ব প্রযুক্তির পথ এসেছে— বাষ্পচালিত প্রযুক্তির ব্যবহারের বহুদিন পর। এরপর থেকেই বিজ্ঞান বিদ্যমান প্রযুক্তির বাইরে নতুন ঘটনা আবিষ্কার করতে প্রবৃত্ত হয়েছে এবং একই সঙ্গে ঘটনা বুঝবার এবং ব্যাখ্যা করবার তাত্ত্বিক অবকাঠামো সৃষ্টি করেছে। প্রযুক্তি এবং শিল্পের অনেক বেশি অগ্রবর্তী থেকে বিজ্ঞান তার নিজস্ব ধারায় অগ্রসর হয়েছে। কৃষি থেকে উৎপন্ন বাড়তি খাদ্য বিজ্ঞানের যাত্রাশুরচ সম্ভব করেছে সত্য এবং শিল্পায়িত প্রযুক্তির অসংখ্য উপকরণ আজ বিজ্ঞানের হাতিয়ার একথাও সত্য। কিন্তু বিজ্ঞান এখন আর প্রযুক্তির কর্তৃত্বাধীনে নেই; যেমন ষোড়শ আর সপ্তদশ শতাব্দীর বিজ্ঞান কৃষকের নিয়ন্ত্রণাধীন ছিল না।

বিজ্ঞান প্রযুক্তির জন্য যে বিপুল সম্ভাবনার দ্বার উদ্ঘাটন করেছে সেগুলি মানুষের উপকারে ব্যবহৃত হবে কি না সে সমস্যার সমাধান বিজ্ঞানীরা দিতে পারেন না। তবে এটুকু বলা যায় যে গত দেড়শো বৎসরে বিজ্ঞানের আবিষ্কার ব্যবহারের পর্যায়ে আসতে গড়ে প্রায় বিশ বৎসর লেগেছে। এখন এই সময়ের ব্যবধান আরো বাড়ছে বলেই মনে হয়।

কিন্তু তবু একটি বিশেষ কথা মনে রাখা প্রয়োজন যে, মাইকেল ফ্যারাডে তাঁর বিদ্যুৎ ও চৌম্বক সম্পর্কীয় পরীক্ষা কোনো শিল্পপতির প্রেরণায় করেননি যিনি বাষ্পচালিত ইঞ্জিনের বিকল্প খুঁজছিলেন। ম্যাক্সওয়েল বিদ্যুৎ-চৌম্বক-তত্ত্ব প্রতিষ্ঠা করেছিলেন এবং হার্তস্ বিদ্যুৎ-চৌম্বক তরঙ্গ আবিষ্কার করেছিলেন ডাক ব্যবস্থার মহাপরিচালকের অভিপ্রায় অনুসারে নয়। টমসন ইলেকট্রন আবিষ্কার করেছিলেন এবং তার থেকে রেকটিফায়ার, অ্যাম্পিস্নফায়ার, ক্যাথোড রে টিউব সৃষ্টি হয়েছে এই জন্য নয় যে বিনোদনলোভী জনগণ ঘরে বসে বিমল আনন্দ ভোগ

করতে পারবেন। বিজ্ঞান সৃষ্ট হয় সমাজের প্রয়োজনই এবং তার বিকাশ ঘটে মানুষের দৈনন্দিন জীবনযাত্রা সহজ করার জন্যেই।

বিজ্ঞান সৃষ্টি হয় তার আপনার অন্তর্নিহিত গতিশক্তি আর সৃজনশীলতার তাগিদে। হাইসেনবার্গ, শ্রডিঞ্জার, ডিরাকের কোয়ান্টাম তত্ত্ব, পর্যায়ক্রমিক ল্যাটিসের ইলেকট্রনগতি এবং ধনাত্মক কোটরের (পজিটিভ হোলের) ধারণার বিশ বৎসর পরে ট্রানজিষ্টর আবিষ্কার হয়েছে। যন্ত্রপাতি প্রস্তুতকারকদের নিবন্ধাতিশয্যে এইসব আবিষ্কার হয়নি— তত্ত্বের অবশ্যম্ভাবী ফল হিসেবেই তা এসেছে। এর আগে চিকিৎসাযন্ত্র-প্রস্তুতকারকদের চাপে রঞ্জনরশ্মি আবিষ্কৃত হয় নি বা আণবিক শক্তির শান্তিপূর্ণ ব্যবহারের সচেতন উদ্দেশ্য নিয়ে ম্যাডাম কুরী তাঁর অমানুষিক প্রচেষ্টার রেডিয়াম পৃথক করেননি। আইনষ্টাইনের বিখ্যাত সমীকরণ (শক্তি= ভর × আলোক গতিবেগের বর্গ), রাদারফোর্ডের পরমাণু কেন্দ্রিণ, অটো হানের কেন্দ্রিণ বিভাজন এর কোনোটাই আবিষ্কৃত হয়নি এই জন্য যে সামরিক মহাপ্রভুরা মহানন্দে মানবতার হত্যাকাণ্ডে লিপ্ত হতে পারেন।

সৃষ্টিশীল প্রতিভাই বিজ্ঞানের উৎস। পদার্থবিজ্ঞান তার সুন্দরতম প্রকাশ। জেমস্ ওয়াট তাপবলবিদ্যা জানতেন না কিন্তু আজ আধুনিক বাষ্পীয় ইঞ্জিন বা টারবাইন এই তত্ত্বের জ্ঞান ছাড়া প্রস্তুত করা অসম্ভব। রাইট ভ্রাতৃদ্বয় গণিতের অরৈখিক আংশিক ব্যাসকলন সমীকরণ জানতেন না কিন্তু আজকের দিনে এই গণিত ছাড়া বিমান গতিবিদ্যা অসম্ভব। অতি উন্নত কম্পিউটার যন্ত্র ছাড়া চাঁদে মানুষ প্রেরণ সম্ভব নয় এবং ট্রানজিষ্টর উদ্ভাবন না হলে কম্পিউটারের আধুনিক আশ্চর্যজনক উন্নতি সম্ভব হতো না। আবার পজিটিভ হোলের ধারণা ছাড়া ট্রানজিষ্টর আবিষ্কৃত হতো না এবং পজিটিভ হোলের ধারণা কোয়ান্টাম গতিবিজ্ঞান ছাড়া করা যায় না। তাই বলা যায় যে মানুষের সৃষ্টিশীল প্রতিভার ফসলই আধুনিক সভ্যতা।

সুতরাং, সৃজনশীল প্রতিভার লালন ও পালনের উপযুক্ত ক্ষেত্র বাংলাদেশে প্রস্তুত হয়েছে কি না এটাই আজ আমাদের প্রধান বিচার্য বিষয় হওয়া উচিত। এই আলোচনার মধ্য দিয়ে এটা স্পষ্ট হবে যে শত অসুবিধা, প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও বাংলাদেশের বিজ্ঞানীরা আজকের বিজ্ঞান-প্রযুক্তি পরিচালিত যুগ থেকে খুব বেশি পিছিয়ে নেই। সমাজ ও রাষ্ট্রের উলেøখযোগ্য কোনো সাহায্য-সহযোগিতা ছাড়াই বাংলাদেশের বিজ্ঞানীরা বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় যেসব অবদান রেখেছেন এবং রাখছেন তার মূল্য নিতান্ত কম নয়। সৃজনশীল প্রতিভার অম্øান অক্ষয়, অব্যয় স্বাক্ষর আমাদের সাহিত্য-শিল্পে যেমন রয়েছে, বিজ্ঞানেও তেমনি আছে। বাংলাদেশের তরুণ বিজ্ঞানীদের উলেøখযোগ্য অবদানের জন্যেই আজ বিজ্ঞানীমহলে বাংলাদেশ নিতান্ত অপরিচিত কোনো দেশ নয়। তাঁদের প্রচেষ্টা আরো ফলপ্রসূ হোক, এটাই আমাদের সকলের প্রত্যাশা।

বাংলাদেশে বিজ্ঞান চর্চা

ভূমিকা: বিজ্ঞান আন্তর্জাতিক এবং সর্বজনীন। শুরচ থেকেই বিজ্ঞান মানবজাতির সর্বকালের সর্বসাধারণের সম্পদ। রবীন্দ্রনাথের ভাষায়:

> ইহার ধারা পৃথক পৃথক ক্ষেত্র হইতে উৎসারিত হইয়া শেষ পর্যন্ত বিশ্ববিজ্ঞানের মহাসমুদ্রে আসিয়া মিলিত হইয়াছে। এই ধারা কোথাও বড়, কোথাও ছোট, কখনও স্ফীত ও দুই কূলপøাবী, কখনওবা একেবারে শুষ্ক ও মৃত— প্রাচীন গৌরবের ক্ষীণ সাক্ষী মাত্র। কিন্তু বিশ্ববিজ্ঞানের মহাসমুদ্র রচনায় প্রত্যেকটি ধারার একটি বিশিষ্ট অবদান আছে।

আধুনিক বিজ্ঞান ইউরোপ এবং আমেরিকার সৃজনশীল প্রতিভার অবদান— একথা অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু বিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞানে এশীয় বিজ্ঞানীদের উলেøখযোগ্য অবদানের কথাও আজ শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করতে হয়। গণিতে রামানুজন হরিশচন্দ্র, পদার্থবিজ্ঞানে সত্যেন বসু, মেঘনাদ সাহা, রমন, সালাম, চন্দ্রশেখর, পদার্থবিজ্ঞানে ও জীববিজ্ঞান জগদীশচন্দ্র বসু, হরগোবিন্দ খোরানা এই উপমহাদেশের বিজ্ঞান প্রতিভার অম্øান স্বাক্ষর। এইসব নাম দিয়েছে উপমহাদেশকে অহংকার, আত্মমর্যাদাবোধ ও আত্মবিশ্বাস। আত্মবিশ্বাসের এই নৈতিক শক্তি ছাড়া বিজ্ঞানে অবদান রাখা অসম্ভব। এমন এক সময় ছিল যখন ইউরোপ অজ্ঞতার নিবিড় অন্ধকারে নিমজ্জিত কিন্তু প্রাচ্য তখন জ্ঞানবিজ্ঞানের প্রদীপের আলোকচ্ছটায় উদ্ভাসিত।

> ভারতবর্ষে, মহাচীনে ও ঐশøামিক মধ্যপ্রাচ্যে, অর্থাৎ, সমগ্র এশিয়ায়, তখন এক অখণ্ড জ্ঞানরাজ্য সুপ্রতিষ্ঠিত। বসুবন্ধু, ঈশ্বরকৃষ্ণ, দিঙনাগ, কুমারজীব, বুদ্ধঘোষ প্রমুখ বৌদ্ধ দার্শনিকগণ প্রাচ্যে বৌদ্ধধর্ম ও দর্শন প্রচারে তৎপর; আর্যভট্ট, বরাহমিহির, ব্রহ্মগুপ্ত, ভাস্কর প্রমুখ জগদ্বিখ্যাত গণিতজ্ঞ ও জ্যোতির্বিদগণ এই সময়ে ভারতীয় গাণিতিক ও জ্যোতিষীয় প্রতিভার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন: নাগার্জুন, নাগভট্ট, মাধবকর, বৃন্দ, চক্রপানিদত্ত ও শঙ্খধর চিকিৎসাবিদ্যা ও রসায়নের বহু উন্নতিসাধন করিতেছেন। মহাচীনে চিন লোচি, হো চেন তিয়েন, সু চুং চি, সিয়া-হু উং, চেন-লুয়ান, চ্যাং চিউ-চিয়েন প্রমুখ চৈনিক গণিতজ্ঞ ও জ্যোতির্বিদগণ দুরূহ গাণিতিক ও জ্যোতিষীয় সমস্যার সমাধানে ব্যস্ত; ফাহিয়েন, হুয়েন সাং, ওয়াং হুয়ান-সে, ইৎসিং প্রমুখ চৈনিক পর্যটক ভৌগোলিকগণ বিচিত্র প্রাচ্য দেশসমূহের বিভিন্ন জাতি, তাহাদের ভাষা, শিক্ষা, সংস্কৃতি, জ্ঞান-বিজ্ঞান সম্বন্ধে তথ্য আহরণ করিয়া অপূর্ব ভ্রমণ কাহিনী ও ভৌগোলিক গ্রন্থ রচনা করিতেছেন। সেই চীন দেশের কারিগর ও বিজ্ঞানীরা এই সময় উদ্ভাবন করিয়াছেন মুদ্রণ-প্রণালি ও মুদ্রণ-যন্ত্র, কাগজ, কম্পাস, বারুদ, ভূকম্পন নির্দেশক যন্ত্র ও আরও কত ব্যবহারিক আবিষ্কার। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে মারাঘায় হুলাগু খাঁর নাসির আল-দিন আল-তুসি যে বিখ্যাত জ্যোতিষীর মানমন্দির নির্মাণ করেন তাহার সাজসজ্জা ও নির্ভুল জ্যোতিষীয় পর্যবেক্ষণ-ব্যবস্থা ষোড়শ শতাব্দীতে স্থাপিত টাইকো ব্রাহের (যুরাণিবোর্গের) যন্ত্রসজ্জা ও পর্যবেক্ষণ-ব্যবস্থা অপেক্ষা যে অনেক উন্নত ছিল, অধ্যাপক সার্টনের মত বিজ্ঞানের বিশিষ্ট ঐতিহাসিক তাহা স্বীকার করিয়াছেন।

চতুর্দশ ও পঞ্চদশ শতাব্দী পর্যন্ত ইউরোপ ও এশিয়ার বিজ্ঞান চর্চা প্রায় সমান্তরাল ধারায় প্রবাহিত হয়েছে। কিন্তু ইউরোপীয় রেনেসাঁর পর থেকে প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের মধ্যে বিজ্ঞানের এই ভারসাম্য ব্যাহত হয়েছে। পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতাব্দীর নবজাগরণের ফলে ইউরোপীয় সমাজব্যবস্থার যে পরিবর্তন হয়েছে তা বিজ্ঞানের দ্রুত উন্নতির পক্ষে ছিল বিশেষ অনুকূল।

> যে কোন কারণেই হউক এশিয়ার কোথাও এইরূপ অনুকূল অবস্থার উদ্ভব হইল না— না ভারতবর্ষে না মহাচীনে। তাই লিওনার্দো, ভিসালিয়াস, গ্যালিলিও, হার্ভি ও নিউটনের জন্ম হইল

ইউরোপ ভূখণ্ডে। এশিয়া সেই পুরাতনের মধ্যেই আবদ্ধ থাকিয়া ইউরোপের শত শত বৎসর পশ্চাতে পড়িয়া রহিল, বর্তমানকে হারাইয়া অতীতকে সম্বল করিল।

বাংলাদেশে বিজ্ঞান চর্চা

বর্তমান থেকে মুখ ফিরিয়ে অতীতকে সম্বল করাই বাংলাদেশের বিজ্ঞান চর্চার একমাত্র বাধা নয়। আধা-সামন্ততান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা, সামরিক-বেসামরিক-আমলা শাসিত প্রশাসনিক কাঠামো এবং প্রশাসনিক কাঠামো এবং সর্বোপরি ব্যাপক দারিদ্র্য এদেশে বিজ্ঞান চর্চার ভিত্তিস্থাপনেরও সুযোগ করে দেয়নি। এর সঙ্গে আছে ঐতিহ্যবাহী সাহিত্যাশ্রয়ী বাঙালি সংস্কৃতি যা মানুষকে খুব বেশি বিজ্ঞান-সচেতন করে না।

তবু এদেশে বিজ্ঞান যে মোটেই হয়নি তা নয়। বলা যায় বাংলাদেশের বিজ্ঞান চর্চা শুরচ হয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে। যে নয়টি বিভাগ নিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের যাত্রা শুরচ (১৯২১) তার মধ্যে ছিল গণিত, পদার্থবিজ্ঞান এবং রসায়নশাস্ত্র। প্রথম দিকে পদার্থবিজ্ঞান বিভাগের ল্যাবরেটরিগুলি "যন্ত্রপাতিতে বেশ সমৃদ্ধ" ছিল বলে ইতিহাসে উলেøখ আছে।

১৯২২-২৩ সালে পদার্থবিজ্ঞান থেকে তিনটি বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। রচয়িতা ছিলেন ওয়াল্টার জেন্‌কিনস এবং এস.এন. বোস। "তারকার বর্ণালী"র উপর বক্তৃতা দেন এম.এন. সাহা এবং "আইনষ্টাইনের সৃষ্টি" সম্বন্ধে আলোচনা করেন অতিথি বক্তা আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ড. জিয়াউদ্দীন আহমদ।

১৯২৪ সালের সেপ্টেম্বর মাসে এস.এন. বোস ইউরোপ যাত্রা করেন, কিন্ত এর আগেই তিনি তাঁর বিশ্ববিখ্যাত প্রবন্ধটি প্রকাশ করেছেন। এই প্রবন্ধ দিয়ে কোয়ান্টাম সংখ্যাতত্ত্বের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হয়েছে এবং বলা হয়েছে যে "চিরায়ত কোয়ান্টাম তত্ত্বে বোসের এই প্রবন্ধটি শেষ মৌলিক অবদান।" এরপর পদার্থবিজ্ঞানে কোয়ান্টাম তত্ত্বের জায়গায় কোয়ান্টাম বলবিদ্যার অভ্যুদয় ঘটে। কিন্তু বোস বা তাঁর সহকর্মীরা কোয়ান্টাম বলবিদ্যার পরবর্তী অগ্রগতিতে বিশেষ কোনো অংশ নিতে পারেননি।

অবশ্য বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ যথারীতি প্রকাশিত হয়েছে। ১৯২৪-২৫ সালে তিনটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। আণবিক গঠনের উপর এস.এন. বোসের একটি এবং বাষ্পীয় চাপের উপর এস.বি. মালির দুটি, যার একটিতে সহরচয়িতা হিসেবে জে.সি. ঘোষের নাম পাওয়া যায়। জ্ঞান ঘোষ রসায়ন বিভাগের প্রধান ছিলেন এবং রসায়ন বিজ্ঞানে প্রচুর কাজ করছিলেন। আর একজন খ্যাতনামা বিজ্ঞানী ছিলেন উদ্ভিদবিদ্যার পি.এন. মাহশ্বেরী। বিজ্ঞান গবেষণার এই প্রতিশ্রচতিপূর্ণ শুরচর পিছনে ছিল বিজ্ঞানের গুরচত্ব সম্বন্ধে বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থপতিদের সচেতনতা। ১৯২৫ সালের ২৫শে নভেম্বর উপাচার্য পি.জে. হার্টগ বলেছিলেন:

> আমাদের প্রধান ব্যয় হয়েছে একটি প্রথম শ্রেণী বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য যা অত্যাবশ্যকীয়— ল্যাবরেটরীর যন্ত্রপাতি এবং গ্রন্থাগার— তা সংগ্রহ করা। বিজ্ঞান গবেষণাগারের যন্ত্রপাতির জন্য আমরা ২,৯০,০০০ টাকা খরচ করেছি। আমার মনে হয় না ভারতবর্ষে এর চেয়ে সমৃদ্ধ কোন ল্যাবরেটরী আছে।

প্রথম উপাচার্যের একথা তখন অবশ্যই যথার্থ ছিল কিন্তু আজকের অবস্থা সম্পূর্ণ ভিন্ন।

১৯২৮ সালের ডিসেম্বরে কে.এস. কৃষ্ণাণ পদার্থবিজ্ঞান বিভাগে যোগ দেন এবং তাঁর যোগদানেই পরীক্ষণ গবেষণাগারে নতুন প্রাণের সঞ্চার হয়। কেলাসের রমন বর্ণালি, তরল পদার্থের ডাই-ইলেকট্রিক গুণ এবং কেলাস গঠনে চৌম্বক বৈষম্যের উপর তিনি এই সময় প্রচুর কাজ করেন। এই সময়কালে কৃষ্ণাণ Crystal magnetism-এর ৫টি ক্লাসিক প্রবন্ধ রচনা করেছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পদার্থবিজ্ঞান বিভাগ থেকে। ১৯৩২ সালে মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এইসব কাজের ভিত্তিতে তিনি ডি.এসসি. ডিগ্রি লাভ করেন।

১৯৩৩ সালে কৃষ্ণাণ বিজ্ঞান বিভাগ পরিত্যাগ করলে তাঁর শূন্যস্থান পূরণ করেন ড. এস.এর. খাস্তগীর। দুই বৎসর আগে খাস্তগীর বিভাগে যোগ দিয়ে দেখেন যে ছাত্ররা সব এস.এন. বোস অথবা কে.এস. কৃষ্ণাণের সঙ্গে কাজ করতেই বেশি আগ্রহী। তাই তিনি তাঁর নিজের অধীত বিষয় রঞ্জনরশ্মি বাদ দিয়ে বেতার-তরঙ্গ সঞ্চালনের উপর কাজ শুরচ করেন। এইভাবেই জন্ম নেয় বিভাগের বেতার গবেষণাগার যা পরে ফলিত পদার্থ ও ইলেকট্রনিক্স বিভাগে রূপান্তরিত হয়েছে। খাস্তগীরের গবেষণার বিষয় ছিল কেলাস রেক্টিফিকেশন, বেতার তরঙ্গের মেরচবর্তিতা, আয়োনাস্ফিয়ারের গতি ইত্যাদি।

ত্রিশ দশকের আরেকজন খ্যাতনামা গবেষক ছিলেন ডক্টর কেদারেশ্বর ওরফে কে. ব্যানার্জি। একক কেলাসের গঠন গবেষণার জন্য তিনি একটি শক্তিশালী দল গড়ে তোলেন। প্যারাডাই নাইট্রোবেনজিন (১৯৩৪), বেনজিন (১৯৩৫), কোলেস্টেরল (১৯৩৫), এনথ্রাকুইনোন (১৯৩৫), এসিন্যাপথিন (১৯৩৭), মেটাডাইনাইট্রোবেনজিন (১৯৪০) ইত্যাদি কেলাসের গঠন তিনি নির্ধারণ করেন।

১৯৩০ থেকে ১৯৪০ সালের মধ্যে পদার্থবিজ্ঞান বিভাগে সৃজনশীল কর্মকাণ্ডের যে আবহাওয়া ছিল চলিøশ দশকের পর রাজনৈতিক ডামাডোলে তা বিনষ্ট হয়ে যায়। ভারত বিভাগের পূর্বে ড. এস.এম. মিত্র প্রতিপ্রভার উপর প্রচুর কাজ করেছেন এবং তাঁর ছাত্র ড. কে. ডি. চৌধুরী রঙিন বস্তুর মেরচবর্তী প্রতিপ্রভার উপর গবেষণা করেছেন এবং ডক্টরেট ডিগ্রী অর্জন করেন। এর পরেই বিভাগে এক শূন্যাবস্থা সৃষ্টি হয় যা পূরণ করতে বহুদিন লেগেছে।

বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার পর পদার্থবিজ্ঞান বিভাগে আবার গবেষণার আবহাওয়া ফিরে আসে। এখন কঠিন অবস্থার পদার্থবিজ্ঞান, কেন্দ্রিণ পদার্থবিজ্ঞান এবং তাত্ত্বিক পদার্থবিজ্ঞান বিশেষ করে উচ্চশক্তি পদার্থবিজ্ঞান— প্রধানত এই তিন দিকে কাজ চলছে।

কঠিন অবস্থার পদার্থবিজ্ঞানে যেসব বিষয়ের উপর গবেষণা চলছে তা হলো: (১) স্পিন রেজোনান্স বর্ণালি; (২) রঞ্জন রশ্মির কেলাসতত্ত্ব; (৩) ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপি; (৪) অকেলাসিত বস্তুর বিদ্যুৎ-ধর্ম; এবং (৫) প্রতিফলনক্ষম পাতলা স্তরের পৃষ্ঠদেশের গুণাবলি। অর্থোডাই নাইট্রোবেনজিন সোডিয়াম এসিটেট ট্রাই হাইড্রেট এবং সালফোনালের সম্পূর্ণ কেলাস গঠন নির্ধারণ করা হয়েছে। তামার ডি.সি. পরিবাহকত্ব নিয়ে গবেষণা করা হয়েছে। পাটতন্ত এবং রঞ্জনরশ্মি দিয়ে দেশজ মাটির গঠন নির্ণয় কাজ করা হয়েছে।

বিভাগে ইলেকট্রন প্যারাম্যাগনেটিক রেজোনান্স নিয়ে কাজ শুরচ হয় ষাটের দশকে। গোড়াতে প্রথম ট্রাঞ্জিশন গ্রচপের মৌলিক পদার্থের উপর গবেষণা করা হয়। এর পরে রাসায়নিক পদার্থবিজ্ঞান, বর্ণালি এবং বিকরণ রসায়নের দিকে গবেষণার মোড় নেয়। জৈব পদার্থে বিকিরণ দিয়ে ইলেকট্রন মুক্ত করে তার প্যারাম্যাগনেটিক বর্ণালি পর্যবেক্ষণ করা হয়। এভাবে অ্যামিনো অ্যাসিড এবং অন্যান্য জৈব পদার্থে রাসায়নিক মিথষ্ক্রিয়া সম্বন্ধে বিস্তৃত জ্ঞানলাভ করা সম্ভব হয়েছে।

কেন্দ্রিণ পদার্থবিজ্ঞানে আণবিক শক্তি কেন্দ্রের ৩ এম.ই.ভি. ত্বরণ-যন্ত্রের সাহায্যে নিউট্রণ পরিচালিত মিথস্ক্রিয়ার উপর গবেষণা হয়েছে। অনেক মৌলিক পদার্থের সামগ্রিক নিউট্রন প্রস্থচ্ছেদ নির্ধারণ করা হয়েছে অতি সূক্ষ্মভাবে। রঞ্জনরশ্মি প্রতিপ্রভা নিয়েও গবেষণা হয়েছে।

কেন্দ্রিণ গঠনের উপর গবেষণার জন্য ইমালসন পেøট বিদেশের কোনো ত্বরক যন্ত্রের ল্যাবরেটরি থেকে বিচ্ছুরিত করে নিয়ে আসা হয়। ডিউটারন, হিলিয়াম-৩ এবং আলফা-কণা দিয়ে এই পেøটগুলির উপর বিচ্ছুরণ করা হয়েছে। পেøটের উপর কণার সঞ্চারপথ অনুসন্ধান করে কেন্দ্রিণ গঠনের বিভিন্ন তথ্য আহরণ করা সম্ভব হয়েছে। বিশেষ করে এভাবে তাত্ত্বিক গুরচপূর্ণ এফ-পি শেলের বর্ণালি উৎপাদক নির্ধারণ করা সম্ভব হয়েছে।

মহাজাগতিক গবেষণাগারে এক সময়ে একটি নিউট্রন মনিটর স্থাপন করা হয়েছিল এবং মহাজাগতিক রশ্মির উপর তথ্য আহরণ করা হয়েছিল। এই গবেষণাগারে বর্তমানে অস্থি-জৈব বৈদ্যুতিক ধর্ম নিয়ে গবেষণা শুরচ হয়েছে।

এ ছাড়াও তাত্ত্বিক পদার্থবিজ্ঞানে কঠিন পদার্থের তেজদল গঠনের উপর বিস্তৃত গবেষণা হয়েছে। ১৯৭৪ সালে সোডিয়াম ক্লোরাইড, পটাশিয়াম ক্লোরাইড ইত্যাদি কেলাসের তেজদল অনুসন্ধানের জন্য এলসিএও পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয়। এর পরে এলসিএও এবং এপিডবিøউ পদ্ধতির সমাবেশে একটি নতুন পদ্ধতির উদ্ভাবন করা হয়। পরীক্ষালব্ধ ফলের সঙ্গে এই নতুন তাত্ত্বিক পদ্ধতির ফল সুন্দরভাবে মিলে যায়।

ধাতু এবং ধাতব সংমিশ্রণের সাংগঠনিক এবং তাপবলবিদ্যাগত গুণসমূহ অনুসন্ধান ধাতুবিদ্যার জন্য অতি প্রয়োজনীয়। এই গবেষণার জন্য সিউডোপোটেনশিয়াল পারটারবেশন পদ্ধতি ব্যবহার করে অত্যন্ত ভাল ফল পাওয়া গিয়েছে।

তেজদল গঠনের গণনায় আপেক্ষিক-তত্ত্বসম্মত এপিডবিØউ পদ্ধতি প্রবর্তন করা হয়েছে এবং আধা পরিবাহীতে অপদ্রব্যের তেজতল নির্ধারণ করা হয়েছে। অন্যদিকে চৌম্বক অপদ্রব্য সংবলিত ধাতুর (কাণ্ডো বস্তু) বৈদ্যুতিক পরিবাহিতা নির্ধারণ করা হয়েছে। কঠিন বস্তুর অতিনিম্ন উষ্ণতার ধর্ম বিশেষ করে সুপারফ্লুইডিটি নিয়ে গবেষণা করা হয়েছে।

বিভাগের গৌরব অধ্যাপক সত্যেন বসু পদার্থবিদ্যার শিক্ষক হিসেবে কর্মময় জীবনের শুরচ করলেও ফলিত সংখ্যায়নই ছিল তাঁর মুখ্য কর্মক্ষেত্র। মুক্তবুদ্ধি আন্দোলনের একজন প্রথম সারির প্রবক্তা হিসেবে বাঙালি সংস্কৃতিতেও তাঁর অবদান শ্রদ্ধার সাথে স্মরণীয়।

তাত্ত্বিক কণাবিজ্ঞানের গবেষণা চলছে প্রধানত ক্ষেত্রতত্ত্ব, মেসন আলোক উৎপাদন, উচ্চতর প্রতিসাম্য নকশা এবং কাইরাল লাগ্রাঞ্জীয় পদ্ধতি নিয়ে। উচ্চতর প্রতিসাম্যের সঙ্গে রেজ্জে পোল তত্ত্ব সংমিশ্রণ করে একটি পদ্ধতি প্রবর্তন করা হয়েছে এবং তা দিয়ে মেসন-নিউক্লিয়ন বিচ্ছুরণ প্রক্রিয়ার উপর বিস্তৃত গবেষণা হয়েছে। কাইরাল এসইউ (৩) × এসইউ (৩) লাগ্রাঞ্জিয়ানের সঙ্গে বিশেষ ধরনের প্রতিসাম্য ভঙ্গন সংশিØষ্ট করে মেসন-নিউক্লিয়ন বিচ্ছুরণের গবেষণায় সার্থক ফল পাওয়া গিয়েছে।

অন্য একটি গবেষণা দল ক্ষেত্রতত্ত্ব থেকে নিউক্লিয়ন আইসোবারের অবদান সুনির্দিষ্টভাবে নির্ধারণ করেছে। নিউক্লিয়ন এবং মেরচবর্তী ইলেকট্রনের বিচ্ছুরণ প্রক্রিয়ায় এই তত্ত্ব প্রয়োগ করে সালাম-ভাইনবার্গ নকশার আর একটি পরীক্ষণযোগ্য প্রমাণের সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়েছে।

এ ছাড়াও বর্তমানে কোয়ান্টাম রঙিন বলবিদ্যা নিয়ে কাজ শুরচ হয়েছে।

পদার্থবিজ্ঞান বিভাগে মৌলিক গবেষণা ছাড়াও সৌরশক্তির উপর ফলিত গবেষণার কাজে কিছু অগ্রগতি লাভ করেছে।

পাশাপাশি রসায়নবিজ্ঞান বিভাগের ভৌত রসায়নাগারে পৃষ্ঠতল রসায়ন, তড়িৎ রসায়ন, কলয়েড রসায়ন এবং দশানিয়মভিত্তিক গবেষণা চলছে। অজৈব রসায়নাগারে সন্নিবেশ রসায়ন, অজৈব প্রাণরসায়ন, বিশেØষণ রসায়ন, অজৈব ঘনবস্তু ও অজৈব চক্রযোগের উপর গবেষণা অব্যাহত আছে। জৈব রসায়নাগারে দেশীয় গাছ এবং ফলমূলের উপর ব্যাপক গবেষণা চলছে।

উদ্ভিদবিদ্যা বিভাগে শৈবাল, কোষবিদ্যা, কোষকৌলিন বিদ্যা, পরিবেশবিদ্যা, লিমনলজি, উদ্ভিদ প্রজনন ও শরীরতত্ত্ব, টিস্যু কালচারাল এবং উদ্ভিদ এবং উদ্ভিদ শ্রেণীবিন্যাসের উপর কাজ চলছে। প্রাণরসায়ন বিভাগে ভিটামিন ও ল্যাতরিজম পুষ্টি সংক্রান্ত গবেষণা ভেষজ উদ্ভিদ, সেলোলাইটিক জীবাণু ও পরিবেশগত অনুজীববিদ্যা, ফার্মেন্টেশন, পুষ্টি ও সংক্রমণে ইমিউনোলজি, কোষের আণবিক জীববিজ্ঞান, এনজাইম জীবরসায়নের উপর গবেষণা চলছে। মৃত্তিকা বিজ্ঞান বিভাগে বাংলাদেশের মাটির উপর গবেষণা এবং অণুজীববিজ্ঞান বিভাগে অণুজীবের শিল্পব্যবস্থায় ব্যবহারের উপর গবেষণা চলছে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়াও দেশের অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণা কর্মকাণ্ড একই রকম সক্রিয়। এ ছাড়া দেশে যে পঞ্চাশটি বিজ্ঞান গবেষণাগার আছে সেখানেও বাংলাদেশের শিল্প ও প্রযুক্তির উপর বিভিন্ন গবেষণা চলছে।

বাংলাদেশ ধান গবেষণা কেন্দ্রের গবেষণা এই প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উলেøখযোগ্য। ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার চাহিদা মেটাতে বাংলাদেশ বছরে গড়ে এক থেকে দেড় মিলিয়ন টন চাল আমদানি করে। ষাট দশকের মাঝামাঝি আন্তর্জাতিক ধান গবেষণা কেন্দ্র আধাবামন আইআর-৮ প্রস্তুত করে এবং বাংলাদেশের কৃষকের কাছে তা গ্রহণযোগ্য হয়। কিন্তু এই ধানগাছের উচ্চতা অল্প, শৈত্য ও খরা এবং লবণাক্ততায় আক্রান্ত হয় তাড়াতাড়ি। আমাদের দেশে বৃষ্টি অধ্যুষিত অঞ্চলে ৩০ দিনের মধ্যে ৪০-৪৫ সেমি লম্বা হয় এই ধরনের ধানের চারা প্রয়োজন। এই গবেষণায় বাংলাদেশ ধান গবেষণা কেন্দ্রের কৃতিত্ব অসাধারণ। বিপøব (বিআর-৩) আউস, আমন ও বোরো মৌসুমে চাষ করার উপযোগী বলে প্রমাণিত হয়েছে। ১৯৭৪ সালের আন্তর্জাতিক ধান উৎপাদন প্রতিযোগিতায় এই ধান সর্বশ্রেষ্ঠ বলে স্বীকৃতি পেয়েছে। ১৯৮১ সালের প্রগতি (বিআর-৯) এবং মুক্তা (বিআর-১১) প্রতিযোগিতার প্রথম তিনটি স্থান দখল করে। বাংলাদেশের কৃষকেরা আজ প্রতি হেক্টরে ১০ টন পর্যন্ত উৎপাদন করতে সক্ষম হয়েছেন। বিআর-৬ আজ কৃষকদের কাছে অত্যন্ত জনপ্রিয়। ১৯৮৩ সালে চার প্রকার নতুন ধান-বিআর-১২, বিআর-১৪, বিআর-১৫ এবং বিআর-১৬ বাজারে ছাড়ার সুপারিশ করা হয়েছে। এইসব ধানের গুণগত মান অনেক বেশি এবং বিভিন্ন প্রকার মৃত্তিকার জন্য উপযোগী।

এ ছাড়াও বাংলাদেশের বিভিন্ন গবেষণাগারে গম, ডাল, চা, তেলবীজ, আলু, ফলমূল নিয়ে বিস্তৃত গবেষণা চলেছে এবং তার সুফল ধীরে ধীরে দেশবাসীর কাছে পৌঁছে যাচ্ছে। এইসব গবেষণা কর্মকাণ্ড সক্রিয় ভূমিকা পালন না করলে দেশের খাদ্যাবস্থা আরো সঙ্গীন হয়ে উঠত— এ সম্বন্ধে কোনো সন্দেহ নেই।

এ প্রসঙ্গেই এসে পড়ে বাংলাদেশ বিজ্ঞান চর্চার তুলনামূলক সমালোচনার কথা। বাংলাদেশে আর সত্যেন বসুর মতো বিজ্ঞানী সৃষ্টি হয় না— এরকম একটি ধারণা বহুল প্রচলিত। একথা যাঁরা বলেন তাঁরা পদার্থবিজ্ঞানের তথ্যবিজ্ঞানের গত পঞ্চাশ বৎসরে সামগ্রিক প্রগতির কথা ভুলে যান। তাঁরা এও ভুলে যান যে ইউরোপ-আমেরিকাতেও আজ অত্যন্ত মুষ্টিমেয় বৃহদাকার গবেষণাগার ছাড়া অন্য কোথাও চাঞ্চল্যকর আবিষ্কার সব সময় সম্ভব হচ্ছে না। বিজ্ঞানের গুণগত পরিবর্তনই এর কারণ। আন্তর্জাতিক বিজ্ঞান প্রগতি ধারার সঙ্গে মোটামুটি সম্পর্কহীন অবস্থায় বাস করেও বাংলাদেশের বিজ্ঞানীরা যেসব অবদান রাখছেন তার মূল্যও কম নয়। ইউরোপ-আমেরিকার শিক্ষা ও বিজ্ঞানকে সরাসরি বাংলাদেশের সুজলা-সুফলা শস্যশ্যামলা পলিমাটিতে রোপণ করা অত্যন্ত সহজ কাজ নয়। দারিদ্র্য ও জনসংখ্যা সমস্যায় জর্জরিত কৃষিভিত্তিক, প্রায় সম্পদবিহীন এমন একটি দেশের উন্নয়নে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির প্রয়োজনীয়তা অবশ্য কেউ অস্বীকার করেন না, এটাই আশার কথা।

বাংলাভাষায় বিজ্ঞান চর্চা

গত তিনশ বৎসরে ইউরোপে বিজ্ঞান প্রগতির কারণ বোধ হয় দুটি: একটি হলো কৃষির উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীলতা পরিত্যাগ করা। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ব্যবহার করেই ইউরোপ তার প্রথম শিল্পবিপøবের মাধ্যমে আর্থ-সামাজিক অবস্থার আমূল পরিবর্তন সম্ভব করেছে। অতি সম্প্রতি কম্পিউটার প্রকৌশল ও ইলেকট্রনিক্সের ব্যাপক উন্নতি এবং মাইক্রোপ্রসেসরের অভ্যুদয় ইউরোপ ও আমেরিকাকে দ্বিতীয় শিল্পবিপøবের দ্বারদেশে পৌঁছে দিয়েছে। দ্বিতীয় কারণটি হলো বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির চর্চায় মাতৃভাষার ব্যবহার। পৃথিবীর কোনো উন্নতিকামী, আত্মসচেতন জাতি বিদেশী ভাষায় জ্ঞানবিজ্ঞানের চর্চার কথা চিন্তাও করতে পারে না।

বাংলাভাষায় বিজ্ঞান চর্চার প্রয়োজনীয়তা রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, জগদানন্দ রায়, জগদীশচন্দ্র বসু, প্রফুলøচন্দ্র রায় অনেক আগেই বিস্তৃতভাবে আলোচনা করেছেন। আমাদের দেশে এ সম্বন্ধে সচেতনতা সৃষ্টি করেছেন কুদরাত-ই-খুদা, কাজী মোতাহার হোসেন, ফলিত পদার্থবিজ্ঞানী শাহ মুহম্মদ ফজলুর রহমান, আবদুলøাহ্ আলমুতী শরফুদ্দীন, অধ্যাপক হারচন অর রশীদ, অধ্যাপক অজয় রায়, ড. আলী আজগর, ড. মহাম্মদ ইব্রাহীম এবং আরো অনেকে। এঁদের প্রায় সকলেই পেশায় বিজ্ঞানী। সম্প্রতি আব্দুলøাহ্ আলমুতী শরফুদ্দীনের "কলিঙ্গ পুরস্কার" প্রাপ্তি নিঃসন্দেহে এই বিজ্ঞান আন্দোলনের জন্য একটি অত্যন্ত গুরচত্বপূর্ণ ঘটনা। কিন্তু তবু অস্বীকার করা যায় না যে বাংলাভাষায় বিজ্ঞান চর্চার এই প্রচেষ্টা এখনও তেমন দানা বেঁধে ওঠেনি। অবশ্য বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে বিজ্ঞান শিক্ষাদান যে আজ সম্পূর্ণ ইংরেজিতে হয় তা নয়। যতটা সম্ভব বিষয়বস্তু বাংলায় বুঝিয়ে দেওয়ার চেষ্টা আজকাল সব বিজ্ঞানের শিক্ষকই করেন। কিন্তু ছাত্র বই পড়ে ইংরেজিতে এবং পরীক্ষার প্রশ্নের উত্তর লিখে ইংরেজিতে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে বাংলায় উচ্চতর বিজ্ঞানের পুস্তক যথেষ্ট সংখ্যক না থাকায় ছাত্র-ছাত্রীদের চরম অসুবিধার মধ্যে ফেলা হয়েছে। বাংলা একাডেমী এ পর্যন্ত উদ্ভিদবিদ্যায় ৩টি, কৃষিবিদ্যায় ৬টি, গণিতশাস্ত্রে ৬টি, চিকিৎসাবিজ্ঞানে ১টি, জ্যোতির্বিদ্যায় ১টি, পদার্থবিদ্যায় ৭টি, প্রকৌশল ও কারিগরি বিদ্যায় ৪টি— মোট ৪৯টি বই প্রকাশ করেছে। জাতীয় প্রতিষ্ঠান বাংলা একাডেমীর পক্ষে এর চেয়ে বেশি কিছু করা সম্ভব ছিল না— একথা আমি বিশ্বাস করি না। প্রয়োজনের তুলনায় এই আয়োজন নিতান্তই নগণ্য— একথা সকলেই স্বীকার করেন।

বাংলাভাষায় উচ্চতর বিজ্ঞানের বই লেখার উপযুক্ত ব্যক্তিত্বের অভাব রয়েছে আমাদের দেশে— তাও আমি স্বীকার করি না। প্রয়োজন আন্তরিকতার— যাঁরা লিখতে পারেন তাঁদের এবং যাঁরা ছাপাতে পারেন তাঁদের। এই গঙ্গা-যমুনার মিলন কিভাবে বাংলাদেশে হবে- এটাই মূল প্রশ্ন।

পাঠ্যপুস্তকের সমস্যা উচ্চতর শিক্ষাদান ক্ষেত্রে যে অসুবিধার সৃষ্টি করেছে তা একদিন দূরীভূত হবে বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস। কিন্তু উচ্চতর গবেষণার ক্ষেত্রে যে শূন্যতার সৃষ্টি হবে আগামী কয়েক বৎসরে বা ইতিমধ্যে হয়েছে- সে সম্বন্ধে বিশেষ চিন্তাভাবনা করা হচ্ছে বলে মনে হয় না। বিজ্ঞান গবেষণার বিভিন্ন শাখায় আজ যে হতাশার ভাব লক্ষ্য করা যায় তার কারণ

বহুবিধ এবং বিভিন্ন মঞ্চ থেকে তা বহুবার আলোচিত হয়েছে। মূল সমস্যা বোধ হয় এই যে গবেষক যথাযথ আর্থিক সহায়তা, আধুনিক যন্ত্রপাতি এবং বই জার্নালের অভাবে এ দেশে খুব বেশিদূর অগ্রসর হতে পারেন না।

বৈজ্ঞানিক গবেষণার অগ্নিমূল্য ইউরোপ-আমেরিকার ধনী দেশগুলিতেও বিজ্ঞান গবেষণায় ক্ষতিকর প্রভাব ফেলেছে। আমার নিজের বিষয় কণা-বিজ্ঞানে আজ নতুন ত্বরণযন্ত্রের আকাশচুম্বী ব্যয় সব বিজ্ঞানের শিরঃপীড়ার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই অসুবিধা দূর করার জন্য উন্নত দেশগুলির বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় একত্রিত হয়ে সকলের ব্যবহারের উপযোগী গবেষণাগার স্থাপন করার পদক্ষেপ নিয়েছে। জার্মানি, জাপান, ইংল্যান্ড, ফ্রান্স, রাশিয়া এবং আমেরিকা সব দেশেই আজ কেন্দ্রীয় গবেষণাগার স্থাপন করা হচ্ছে। এমনকি কয়েকটি দেশ একত্রিত হয়ে আন্তর্জাতিক কেন্দ্র স্থাপন করেছে। ইউরোপের জেনেভায় এইভাবে যে গবেষণাকেন্দ্র স্থাপিত হয়েছে তা কণাবিজ্ঞানের পুরোভাগে অবস্থান করছে।

সুতরাং, বাংলাদেশে ভবিষ্যতে ভারতের সঙ্গে সহযোগিতায় এই ধরনের একটি কেন্দ্রীয় গবেষণাগার স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা অত্যন্ত বেশি। ধান গবেষণা কেন্দ্রের সফল কার্যক্রম থেকে এই ধরনের কেন্দ্রীয় গবেষণাগারের উপযোগিতা সম্বন্ধে আর কারও সন্দেহ থাকা উচিত নয়।

তবে অর্থযোগান এবং গবেষণাগার নির্মাণ ছাড়াও বিজ্ঞান গবেষণায় যা সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন তা হলো মেধাবী তরচ্ণ-তরচ্ণী বিজ্ঞানীর উপস্থিতি। বিজ্ঞান তরচ্ণের একচেটিয়া অধিকার তা নয়, কিন্তু তারচ্ণ্যের কৌতূহল, উৎসাহ, উদ্দীপনা এবং কর্মক্ষমতা বিজ্ঞান গবেষণার মূল চালিকাশক্তি— এ সম্বন্ধে কোনো সন্দেহ নেই। বাংলাদেশের দুর্ভাগ্য যে, তার বিজ্ঞান অঙ্গনে আজও তিরিশ-চলিøশ বৎসর পূর্বের অবসরপ্রাপ্ত ব্যক্তিত্বের অবাধ পরাক্রম। তাঁদের সম্মানিত স্থানে স্থাপন করার সুকৌশল আয়ত্ত করিনি আমরা আজও।

কিন্তু রবীন্দ্রনাথের ভাষায়, তবু মানুষের ওপর আস্থা হারানো পাপ। আমার দৃঢ় বিশ্বাস বাংলাদেশের বিজ্ঞান-উৎসাহী, সৃজনশীল, প্রতিভাধর তরচ্ণ-তরচ্ণী গবেষণায় তাঁদের মনে বিন্দুমাত্র সন্দেহ থাকা উচিত নয়।

"বিজ্ঞান চর্চা আমরা কেন করব?"— এই অতি প্রাসঙ্গিক এবং অতি বিমূর্ত প্রশ্ন আমাদের মতো দরিদ্র দেশে অহরহ উঠতে বাধ্য। এ প্রশ্নের উত্তর আমি আগেই দিয়েছি যে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সমাজ পরিবর্তনের একমাত্র হাতিয়ার। আমাদের এই দরিদ্র দেশ শুধু "একশ বৎসরের নীরবতা"-র পর জেগে উঠেছে তা নয়, আমাদের নিঃসঙ্গতা, নীরবতার ইতিহাস সহস্র বৎসরের। মধ্য আমেরিকার জলাভূমির মধ্যে হারিয়ে যাওয়া গ্রামে মাঝে মাঝে বেদের দল এসে হাজির হতো বহির্বিশ্বের সংবাদ বহন করে। আমাদের পাখিডাকা, ছায়াঘেরা গ্রামের নিস্তরঙ্গ জীবনে অবশ্য আজকাল রেডিও-টেলিভিশন পৌঁছেছে, কিন্তু হাজার বছরে অভ্যস্ত চিন্তাধারায় কি তাতে কোনো মৌলিক পরিবর্তন হয়েছে?

যূথবদ্ধ মানুষের সামগ্রিক সমাজ চেতনায় বিপøব আনাই বিজ্ঞানের মূলকাজ এবং সে কাজ মনে হয় না বাংলাদেশে এখনও শুরচ হয়েছে। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি খুবই দরকার— একথা আমরা

সকলেই বলি যেমন বলি "দুটি সন্তানই যথেষ্ট", কিন্তু এর কোনোটাই বোধ হয় আমরা অন্তর দিয়ে বিশ্বাস করি না।

আসলে সমাজবোধ, আত্মবিশ্বাস, দেশপ্রেম এবং নিজের দেশের ভাবমূর্তি বৃদ্ধি করার অদম্য আকাঙ্ক্ষাই মানুষকে টেনে নিয়ে যায় বিজ্ঞান গবেষণার দিকে। বাংলাদেশের ভাবমূর্তি শুধুমাত্র বিজ্ঞান চর্চার মধ্য দিয়েই বৃদ্ধি পাবে তা আমি বলি না। কিন্তু আমার দৃঢ় বিশ্বাস বিজ্ঞানের চর্চায় নিজের দেশকে গৌরবের আসনে প্রতিষ্ঠা করার যে বিশ্বব্যাপী প্রয়াস আজ চলছে বাংলাদেশের মেধাবী তরুণ-তরুণী তার থেকে দূরে থাকতে পারে না। তাঁদের বিজ্ঞান আরাধনা সফল হোক, এই আশা আন্তরিকভাবে প্রকাশ করছি।

বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি পত্রিকা, দ্বাত্রিংশ খণ্ড, শীত সংখ্যা, পৌষ ১৪২১/ডিসেম্বর ২০১৪

বিশ শতকে বাঙালি মুসলিম নারীর সাহিত্যচর্চার পরিসর ও তাৎপর্য*

বেগম আকতার কামাল**

সারসংক্ষেপ

বাঙালি মুসলিম নারীর সামাজিক মুক্তির পরিসর গড়ে উঠতে থাকে বিশ শতকের প্রথম পাদে এবং সঙ্গে সঙ্গে তাদের সাহিত্যচর্চারও সক্রিয়তা শুরু হয়। তাঁরা সমাজচিন্তা, মুক্তিচেতনা, সংসার-জীবন নিয়ে সংকট ও কল্যাণপ্রশ্নসহ ব্যক্তিস্বাধীনতার ব্যাপারেও সচেতন হয়ে ওঠেন। এ ক্ষেত্রে কতিপয় মহীয়সী-নারী-প্রতিভা অগ্রণী ভূমিকা রাখেন। ভারতীয় রাজনীতিতে স্বাধীনতার দাবি ও আন্দোলন-সংগ্রাম যত তীব্র হতে থাকে ততই নারীদের আধুনিক চিন্তাচেতনায় প্রবেশলাভ ঘটতে থাকে। বিশেষত বাঙালি মুসলিম নারীরা এক্ষেত্রে সংখ্যায় ও গুণে বিশিষ্ট হয়ে উঠতে থাকেন। বহু নারীসাহিত্যিক ব্রতী হন কবিতা-কথাসাহিত্য-নাট্য রচনায়। তাঁদের লেখার জগতে প্রবন্ধ লেখার মননীলতাও গভীরতা পেতে থাকে। আধুনিক চিন্তাচেতনাদীপ্ত নারীরা একাত্তর-পরবর্তী স্বাধীন বাংলাদেশে সাহসিকতা, মেধা ও শ্রমশীলতায় সাহিত্যচর্চায় নিয়োজিত হন এবং বাংলা সাহিত্যকে একটি বিশেষ স্তরে পৌঁছে দেন। বিশেষত, উপন্যাস রচনায় তাঁদের কৃতিত্ব সমধিক উল্লেখযোগ্য। মেধা, কল্পনা ও সৃষ্টিশীলতার সঙ্গে অভিজ্ঞতার সম্পৃক্তি ঘটিয়ে বাঙালি মুসলিম নারী সাহিত্যচর্চার পরিসরকে অনেক দূর বাড়িয়ে দিয়ে কোনো কোনো পুরুষ লেখকদেরও ছাড়িয়ে অনন্য হয়ে উঠছে।

বিশ শতকের প্রখ্যাত ফরাসি সাহিত্যতাত্ত্বিক ও মনীষী রলাঁ বার্ত (১৯১৫-৮০) তাঁর *মিথলজিস* (*Mythologies*: 1957) গ্রন্থে একটি বক্তব্যে প্রশ্ন তোলেন যে নারীর উপন্যাস লেখালেখির সামাজিক তাৎপর্য কি? তাঁর বিবেচনা হলো তাৎপর্যটি সামাজিক স্থিতাবস্থা বজায় রাখার গোপন কৌশল। ফ্রান্সের জনপ্রিয় 'এল' সাময়িকীতে সত্তর জন নারী ঔপন্যাসিকের আলোকচিত্র ছাপা হয়েছিল। রলাঁর ব্যাখ্যা হচ্ছে: এই চিত্র ইঙ্গিত করতে চাইছে নারীরা লেখালেখি করলেও আসলে তারা জীবতাত্ত্বিক প্রজাতি মাত্র। তারা যেমন দ্রুত ও বেশি সংখ্যক সন্তান জন্ম দিতে পারেন তেমনি ভুরি ভুরি উপন্যাসও লিখতে পারেন। নারীরা লেখালেখির ক্ষেত্রে উপন্যাসই কেন বেশি লেখেন সেটাও একটি দামি প্রশ্ন। এভাবে নারীদের সমীকরণ করা হয়, জ্যাকুলিন লেনোয়ার = দুই কন্যা চারটি উপন্যাস; মারিনা গ্রে = এক পুত্র, একটি উপন্যাস; নিকোল ডাটরেল = দুই পুত্র চারটি উপন্যাস। অর্থাৎ, নারী ইনডিভিজুয়্যাল হতে পারবেন, লেখালেখির মতো সৃজনশীল কাজও করতে পারবেন, সমাজ তাকে স্বীকৃতি ও পুরস্কার দেবে। কিন্তু নারীত্বের চিরন্তন আইনটি তারা ভুলবেন না। নারীরা

---

* মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী ট্রাস্ট ফান্ড মেমোরিয়াল লেকচার ২০১৪-এ বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটিতে পঠিত, ১৫ জুলাই ২০১৪

** অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

মর্তে এসেছে পুরুষকে সন্তান উপহার দেওয়ার জন্যে। কারণ এটাই তাদের নিয়তি, নির্ধারিত কর্ম। বিশ শতকেও যদি প্রতীচ্যে এরকম চিন্তা রয়ে যায় সেখানে আমাদের দেশের বাস্তবতা কেমন হতে পারে? রবীন্দ্রনাথের 'খাতা' গল্পে উমাকে দেখা যায় শ্বশুরবাড়িতে এসে সে লেখালেখির জন্যে একটা খাতা সঙ্গে রাখারও অধিকার পাচ্ছে না। ভার্জিনিয়া উলফ তো আরো বেশি দাবি করেছিলেন—নিজের জন্যে একটি ঘর, যেখানে বসে স্বাধীনভাবে লেখালেখি করা যাবে।

এদেশে নারী পরিবার-সমাজে খানিকটা অধিকার পেতে শুরু করে তখনই যখন বঙ্গীয় স্বাদেশিকতার প্রশ্নে রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার কথাটি উচ্চারিত হতে থাকে। আধুনিক রাষ্ট্রের ধারণা হচ্ছে যে, নারী-পুরুষ নির্বিশেষে শিক্ষার অধিকার পাবে। উপনিবেশিত বাংলাদেশে রাষ্ট্রগঠনের লক্ষ্যে আন্দোলন-লড়াই তীব্র হওয়ার আগের প্রস্তুতি-পর্বে এবং সাথে-সাথেও বটে, নারীর আধুনিকায়ন প্রক্রিয়াটি নানা জটিল প্রশ্ন, পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও আপসের মধ্য দিয়ে এগিয়েছে। বলা চলে প্রতীচ্যের প্রভুত্ব-ভাবাদর্শ-সংস্কৃতির আধিপত্য মোকাবেলার সূত্রে নিজেদের শ্রেণী ও ধর্মীয় স্বাতন্ত্র্য রক্ষা ও তার সঙ্গে আপসের দ্বন্দ্ব যেমন ছিল তেমনি ছিল পুরুষতান্ত্রিক মনস্তত্ত্বের জটিলতা এবং উচ্চারিত হচ্ছিল অগ্রসর সময়ধারায় নারীদের আত্মজাগরণের দাবি। এসব জটিল বাস্তবতায় নারীর জীবন সবচেয়ে বেশি সংকটগ্রস্ত হয়েছে, আবার তার আত্মবিকাশের পথও তৈরি হয়েছে। সে পথটি ছিল নারীর জন্যে—খানিকটা হলেও পরিসর যেখানে তারা নিজেকে স্বাধীন রাখতে পেরেছিলেন, যে স্বাধীনতা নারীর সাহিত্যিক-সত্তার জন্ম দিয়েছে, সাহিত্যচর্চার সুযোগ সৃষ্টি করেছে। আমরা তাই রাষ্ট্রগঠন, দেশপ্রেম, স্বাধীনতার আন্দোলন-লড়াইয়ের সক্রিয়তার সঙ্গে যুক্ত করে তাদের বিকাশের ধারাটাও লক্ষ্য করি বিশ শতকের শুরু থেকে ১৯৪৭ সালের দেশভাগ পর্যন্ত। এর পরবর্তী কালটা হচ্ছে তাদের প্রতিষ্ঠা ও বিকাশের ক্ষেত্রে নিজস্ব রূপ ফুটিয়ে তোলার পর্যায়। এ-তথ্য প্রতিষ্ঠিত যে, বঙ্গীয় সমাজের শিক্ষিত মধ্যবিত্ত স্তরেই ওইসব সক্রিয়তা, নিজস্বতা, বিকাশ ইত্যাদি ঘটনা ঘটেছিল, সমাজের সব স্তরে নয়। দুই পর্যায়েই আমরা লক্ষ্য করি পরিবার-সমাজ-রাষ্ট্র এই তিন কাঠামোর সঙ্গে নারীর সাহিত্যচর্চা কখনো ছিল সংঘর্ষশীল, কখনো আপসকামী। তবে, সময় ধর্মে তাদের চর্চা হয়ে উঠেছে বহুমুখী ও সম্মুখগামী—এই সত্যও স্পষ্ট। আমরা তিনটি পর্যায়ে বাঙালি মুসলিম নারীর সাহিত্যচর্চার পরিসর ও স্বকীয়তার একটি রূপরেখা দাঁড় করাব এই প্রবন্ধে বিশ শতকের শুরু থেকে ১৯৪৭, ১৯৪৮ থেকে ১৯৭১ এবং ১৯৭১ থেকে পরবর্তীকাল—এই তিন পর্বে।

১

প্রথমেই আমরা ইঙ্গিত করতে চাই, অতীতের নারীরা সাহিত্যচর্চায় কিভাবে ও কতটুকু পরিসর জুড়ে ছিলেন! নীহাররঞ্জন রায় একাদশ-দ্বাদশ শতকের দুজন বাঙালি নারী কবির তথ্য দিয়েছেন, তাঁরা হলেন ভাবাক বা ভাব-দেবী ও নারায়ণ-লক্ষ্মী (নীহাররঞ্জন: ১৩৫৬,

৫৮৫)। এছাড়া উল্লেখ করা যায় পদাবলির রচয়িতা হিসেবে ইন্দ্রমুখীর নাম (পঞ্চদশ শতক), রামী চন্দ্রাবতী, হেমলতা দেবী, আনন্দময়ী—এঁরাও কবি হিসাবে চিহ্নিত। চন্দ্রাবতী (ষোড়শ শতক) 'রামায়ণ' রচনা করেন, আনন্দময়ী (অষ্টাদশ শতক) 'হরিলীলা' কাব্যের রচয়িত্রী।

মুহম্মদ এনামুল হক কর্তৃক আবিস্কৃত প্রথম মুসলিম নারী কবির নাম রহিমুননিসা (রহিমন্নিচা)। তাঁর অনুলিখিত একটি 'পদ্মাবতী' পুঁথি ও একটি লিখিত কাব্য চট্টগ্রাম থেকে পাওয়া যায়। ওই পুঁথির পাঠোদ্ধারে এনামুল হক লক্ষ্য করেন এটি 'শ্রীমতি রহিমন্নিচা' কর্তৃক অনুলিখিত (ভীষ্মদেব: ২০১১, ৬)। পুঁথিতে রহিমুননিসা লিখিত আত্মবিবরণী, বারমাস্যার আঙ্গিকে লেখা 'ভ্রাতৃবিলাপ' ও 'দোরদানা বিলাপ' পাওয়া যায় (ড. মজিরউদ্দিন: ১৯৬৭)। বোঝা যায় দুঃখবিলাপই নারীর লেখনীতে বেশি জায়গা পাচ্ছে। দ্বিতীয় কবি হিসাবে পাওয়া যায় লতিফন্নেসার নাম (শামসুল, তদেব)। এর পরেই রয়েছে 'রূপজালাল' (১৮৭৬), 'তত্ত্ব ও জাতীয় সঙ্গীত' (১৮৮৭), 'সঙ্গীতসার' ও 'সঙ্গীতলহরী'র লেখিকা নবাব ফয়জন্নেছা চৌধুরানীর (১৮৪০-১৯০৩) নাম (মনিরুজ্জামান: ১৯৮৮, ৯২)। এর মধ্যে 'রূপজালাল' প্রকাশিত, বাকি গ্রন্থ দুটি দুষ্প্রাপ্য। প্রথম মুসলিম গদ্য লেখিকার নাম গবেষক গোলাম মুরশিদ আবিস্কৃত (মুরশিদ: ১৩৮৩-৮৪, ৭১-৭৭) বিবি তাহেরণ নেছা। তাঁর একটি নিবন্ধ ১৮৬৫ সালের ফেব্রুয়ারি-মার্চ সংখ্যা 'বামাবোধিনী' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। কবি হাছন রাজার (১৮৭৪-১৯২২) বৈমাত্রেয় ভগ্নী ছহিফা বিবি (১৮৬০-১৯২৬) 'ছহিফা সঙ্গীত' (১৯০৭), 'ইয়াদ পারে ছহিফা', 'ছহেবারের জারী' নামে কয়েকটি গ্রন্থ রচনা করেন (আহসান; ১৯৯৯; ২২)। উনিশ শতকের করিমুন্নেসা খানম (১৮৫৫-১৯২৬) ছিলেন রোকেয়ার অগ্রজা, তাঁর রচিত কয়েকটি কবিতা 'সাবের বংশের জনৈকা'— এই পরিচয়ে পত্রিকায় ছাপা হতো। জানা যায় তিনি দুঃখ-তরঙ্গিণী' ও 'মানস বিকাশ' নামে দুটি গ্রন্থও লিখেছিলেন। আরো নাম পাওয়া যায় কবি হবিবুন্নেসার। খায়রুন্নেসা খাতুন নামে এক লেখিকার 'সতীর পতিভক্তি' শীর্ষক গ্রন্থের উল্লেখ আছে মুহম্মদ মনসুরউদ্দীনের 'বাংলা সাহিত্যে মুসলিম সাধনা' (১৩৭১, ২০৫) রচনায়। বাসেরা খাতুনের নামও উল্লেখ করা যায় (মজিরউদ্দিন: ১৯৬৭, ১৩৩)। দিনলিপি ও গার্হস্থ্য বিষয়ক রচনায় মীর মশাররফ হোসেনের স্ত্রী বিবি কুলসুমের (১৮৬১-১৯০৯) নামও উল্লেখযোগ্য।

প্রাচীনকাল থেকে উনিশ শতক পর্যন্ত এসব নারী লেখিকার সাহিত্যচর্চার গণ্ডিতে ছিল ধর্ম-পরিবার-দাম্পত্য, সন্তানের কল্যাণ কামনা, কিছু কিছু আত্মবিবরণী ও স্মৃতিকথা। আমরা উনিশ শতকের দুজন নারীর রচনা সম্পর্কে আলোকপাত করব যাদের বলা চলে বিশ শতকের লেখিকাদের পূর্বসূরি। একজন নবাব ফয়জুন্নেসা চৌধুরানী, দ্বিতীয়জন আজিজুন্নেসা খাতুন।

ফয়জুন্নেসার বিত্ত ও কর্মীসত্তা শিক্ষা বিস্তারে ও সমাজহিতকর বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান স্থাপনে ও সহযোগিতায় নিয়োজিত হয়েছিল আর তাঁর লেখনীসত্তা আশ্রয় করেছিল ব্যক্তিজীবনের দুঃখময় অভিজ্ঞতার রূপক রচনায় ও সংগীতের আঙ্গিকে। তাঁর *রূপজালাল* গ্রন্থটি গদ্য-পদ্য মিশ্রণে হয়ে ওঠেছে 'চম্পুকাব্য'—যা প্রমাণ করে ফয়জুন্নেসার সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যজ্ঞান। রচনাটি পরিশীলিত ও পরিমিত, পুরাণ ও লোককাহিনীর ব্যবহার, উপমায় মিশ্র সংস্কৃতির প্রয়োগ, শব্দচয়ন ও অন্তমিলের নৈপুণ্যে রচনাটি অভিনব। তিনি উনিশ ও বিশ শতকের সন্ধিক্ষণকে ধরতে পেরেছেন, তাঁর মধ্যে লক্ষ্য করা যায় অতীতের সংস্কার ও কাব্যরীতি আবার আধুনিক বোধেরও উন্মেষ। এই উচ্চশ্রেণীর অভিজাত নারীটি নিজের সুবিধাজনক জীবনকে সুষ্ঠুরূপে ব্যবহার করতে পেরেছিলেন, যদিও ব্যক্তিগত জীবনে ছিলেন স্বামী-সংসার থেকে বিচ্যুত জীবনসংগ্রামী নারী। তাই কাব্যটিতে হতাশার সুর নেই (আনিসুজ্জামান: ১৯৮৩)। নানা সাহিত্যের প্রভাব থাকলেও মৌলিকতা আছে; 'আত্মকথন' অংশটি ব্যক্তিময়তার প্রকাশ। তাঁর ভাষা ঐতিহ্যিক রীতিশাসিত হলেও 'রসদ্বিগ্ধ ও ভারসাম্যপূর্ণ', আকর্ষণীয়—অনেকটাই বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র, ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের ভাষার সাথে সাদৃশ্যবহ (মনিরুজ্জামান: তদেব; ১০০)। আজিজুন্নেসা খাতুন টমাস পারলেন কৃত *Hermit* কাব্যের বঙ্গানুবাদ করেন *হারমিট* নামে (১৮৮৪)। বাংলা সাহিত্যের সামগ্রিক বিচারে তিনিই প্রথম নারী অনুবাদক। তিনি স্বচ্ছন্দ ও সাবলীল অনুবাদে দক্ষ। কবিতা রচনায় পুরানো রীতির অনুসরণ করলেও কখনো-কখনো দুচারটি উপমা-চিত্রকল্পে নিজস্বতার স্ফুরণ লক্ষণীয়। লোকপ্রিয় আপ্তবাক্য, আদর্শবাণী ও সুনীতিবোধের উচ্চারণও রয়েছে। অর্থাৎ, প্রথাবদ্ধতায় বিচরণ করলেও এই দুই নারীর সৃষ্টিশীলতায় আত্মসত্তার রন্ধ্রপথটি যে প্রকাশের অভিমুখ খুঁজে ফিরছিল তা বোঝা যায়। বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত আজিজুন্নেসা এ-পর্যন্ত চারটি কবিতার সন্ধান পাওয়া গেছে।[২] 'হামদ অর্থাৎ ঈশ্বরস্তুতি ও নাআত' নামে দুটি কবিতা ছাপা হয়েছিল মোহাম্মদ রেয়াজুদ্দীন আহমদ সম্পাদিত 'ইসলাম প্রচারক' পত্রিকায় (নভেম্বর, ডিসেম্বর: ১৯০১ ও মে-জুন ১৯০২)। সৈয়দ এমদাদ আলী সম্পাদিত মাসিক 'নবনূর' পত্রিকায় প্রকাশিত হয় 'গোলাপ ফুল' ও 'কুলীন-পত্নী' নামে দুটি কবিতা (বৈশাখ ১৩১০ ও বৈশাখ ১৩১১)।

এই সব বর্ণনা ও তথ্যের ভিত্তিতে বলা যায় যে, উনিশ শতকে লেখার জগতে বাঙালি মুসলিম নারীর সংখ্যা ছিল খুবই কম। সাহিত্যচর্চার পরিসরও ছিল সীমাবদ্ধ ও বৈচিত্রহীন। কারণ উপনিবেশিত বাঙালি মুসলিমের মধ্যবিত্ত শিক্ষিত শ্রেণী হিসাবে গড়ে ওঠার শ্রেণীতাত্ত্বিক, সমাজতাত্ত্বিক ও ধর্মীয়-মনস্তাত্ত্বিক অবস্থা ছিল ইতিনেতির দ্বন্দ্বে দোদুল্যমান। অন্তত আধুনিকায়নের প্রশ্নে তাঁরা ছিলেন কঠোর রক্ষণশীলতা ও উদার সংস্কারবাদে দ্বিধাবিভক্ত।

কোনো কোনো লেখক-গবেষক যেমন ফাতেমা মারনিসি বলেছেন, ঔপনিবেশিক শক্তির সঙ্গে যোগাযোগের ফলে অধিকাংশ মুসলিম সমাজে যে অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক

পরিবর্তন ঘটেছে, তার পরিপ্রেক্ষিতে সেসব সমাজ কোনো আদর্শগত ভিত্তি তৈরি করতে পারেনি। ফলে তারা সনাতন ঐতিহ্যের উপর জোর দিয়েছে, যার প্রধান লক্ষ্য ও ধারক হয়েছে নারী। গৃহ এবং নারী হয়ে উঠেছে পুরুষের ঐতিহ্যচর্চার স্থান। (উদ্ধৃতি, সোনিয়া: ২০১২, ২০)

ফলে বঙ্গীয় পরিবার–আদর্শই হয়ে উঠেছে পরীক্ষা-নিরীক্ষার বিষয়, সংরক্ষণেরও ক্ষেত্র। ইসলামি বিশ্বের নানা আদর্শিক উপাদান যা সংস্কারবাদী ও মৌলবাদী দুটোই, বঙ্গীয় মুসলিমদের চিন্তাকে চালিত করেছিল যার ফলস্বরূপ তাঁরা মধ্যপ্রাচ্যের ইসলামি ব্যাখার দ্বারস্থ হন, একই সঙ্গে প্রভাবিত হন কলকাতার ব্রাহ্মসংস্কার আন্দোলন দিয়েও। এই প্রেক্ষাপটে মুসলিম নারীর উত্থান ঘটে ও লেখালেখির প্রয়াস গতিশীল হয়, সমসাময়িক পত্রপত্রিকা তাঁদের নান্দনিক আত্মপ্রকাশের সুযোগ তৈরি করে (আকতার: ১৯৮৭; ১৩)। পূর্বে বর্ণিত নবাব ফয়জুন্নেসার সময়কাল ও সাহিত্যাদর্শের সঙ্গে পার্থক্য গড়ে উঠতে থাকে বিশ শতকের প্রথমার্ধের সাহিত্যচর্চার– ভিন্ন আর্থসামাজিক ও সাংস্কৃতিক-রাজনৈতিক কাঠামোর ভিত্তিতে। আগের লেখিকারা যে আধুনিকায়ন ও ঐতিহ্যের দ্বৈরথে নিজেদের স্ববিরোধী করে তুলেছিলেন এ-পর্যায়ের লেখিকারা আত্মপরিচয় সন্ধানে ও নিজেদের দেশ ও রাজনীতির ধারায় নিজের অবস্থান খুঁজে নিতে সক্রিয় হতে থাকেন। যার পুরোধা হচ্ছেন রোকেয়া সাখাওয়াৎ হোসেন, যাঁকে একই সঙ্গে হতে হয়েছিল নারী জাগরণের লড়াকু পথিকৃৎ ও সে-লক্ষ্যে ভাবুক-লেখিকা। এখানে একটি সূত্র বেরিয়ে আসে যে, উপনিবেশিত আধুনিকায়নের মধ্য দিয়ে মুসলিম নারীদের বাঙালিকরণ ঘটেছিল, তাঁদের সাহিত্যচর্চায় বাংলা সাহিত্য ও ভাষার বিকাশ ঘটেছিল। তবে কেন তাঁদের লেখালেখিতে গৃহ ও দাম্পত্য জীবনই প্রাধান্য পেয়েছিল সেটি তৎকালীন সমাজব্যবস্থা ও নারী-মনস্তত্ত্বের বৈশিষ্ট্য সঞ্জাত। প্রশ্ন, কী এই সমাজ বা নারী-মনস্তত্ত্ব-ই-বা কী রকম?

কোনো সমাজ যখন নানা আদর্শের সংঘাতে জড়িয়ে পড়ে, বিশেষত প্রাচ্য যখন প্রতীচ্যের সংস্কৃতির মুখোমুখি হয় তখন আত্মরক্ষার্থে গৃহকে পবিত্র পরিত্রাণের স্থান হিসেবে গড়ে তোলে। আর তার সব চাপটা পড়ে নারীর ওপর, তার ফলে তাদের জীবনে এক নতুন ভূমিকার সূচনা ঘটে। আরেকটি সূত্র এখানে মনে রাখা আবশ্যক যে, যে-মধ্যবিত্ত শিক্ষিত শ্রেণী ইংরেজ প্রভু কর্তৃক সৃষ্ট ও বিকশিত তারা ভদ্রলোক সংজ্ঞায়নের ধারায় বৃহত্তর জনজীবন থেকে দূরে সরে গিয়েছিল। এটা ঔপনিবেশিক দেশেরই নিয়তি যে মূলজীবন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে-পড়া। জনজীবনের ওপর নিয়ন্ত্রণ ও প্রভাব কমে গেলে এইসব ভদ্রলোক শিক্ষিত শ্রেণীবর্গ ওই রকম বিচলন মুহূর্তে আঁকড়ে ধরে গৃহকেই, গৃহের নিরাপত্তাই তাদের আত্মরক্ষার আশ্রয়স্থলই শুধু হয় না, তাদের ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রও হয়ে ওঠে। গৃহ তাই হয়ে ওঠে জাতীয়তাবাদী জাগরণ, আধুনিক পরিবর্তনের ক্ষেত্র এবং আধুনিক জীবনযাত্রার পরীক্ষা-নিরীক্ষার ক্ষেত্র। এভাবেই ভিতর মহলকে বহির্জগতের যাবতীয় সংস্কার ও রক্ষণশীল সংঘাতের মুখোমুখি হতে হয়েছে। (সোনিয়া: তদেব, ২৯)। তাই দেখি

নারীদেরকেই শিক্ষার কার্যক্রম যেমন শুরু করতে হয়, তেমনি আধুনিক দাম্পত্য জীবনের নীতিমালাও নির্ধারণ করে লেখালেখি করতে হয়। ইতিহাসে রোকেয়া এই ভূমিকাই পালন করেছিলেন। মনে রাখা দরকার বিশ শতকের এই ক্রান্তিকালেই নতুন ধরনের মধ্যস্থতাকারী— যাঁরা নতুন ও পুরানোর মধ্যে সমন্বয়কারী ছিলেন, তাঁদের আবির্ভাব ঘটে। তাঁরা বাঙালিকরণ প্রক্রিয়াকে সুসংগঠিত করার দায়িত্ব নেন যা ইতিহাসধারায় '৫২-এর বাংলা ভাষা আন্দোলনে বিস্ফোরিত হয়। এই ভাষা আবার মুসলমানের ধর্মীয় চেতনার সঙ্গে ছিল নানা অর্থেই গোলমেলে, বিশেষ করে আরবি-ফারসি ভাষাভিত্তিক ধর্মচেতনা আর মাতৃভাষা বাংলার বৈপরীত্য চিহ্নিত করার একটা প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়। যাঁরা ভাষা প্রশ্নে দ্বিধা কাটিয়ে সাহিত্যচর্চা করতে থাকেন তাঁরাই পরবর্তী লেখালেখির পথ তৈরি করে দেন। মুসলিম লেখিকারা ভাষা প্রশ্নে কতটা নির্দ্বন্দ্ব ও ইতিবাচক দায়িত্ব পালন করেছেন তাঁদের সাহিত্যচর্চা ও চিন্তাভাবনার আলোচনায় সেটি স্পষ্ট করা সম্ভব।

এসব নারী তাঁদের আধুনিক ও খাঁটি সংস্কৃত ঘেঁষা বাংলায় গদ্য রচনা করতে থাকেন, এর ফলে এতকালের চর্চিত ও অনুসৃত উত্তর ভারতীয় মুসলিম সংস্কৃতি ও চিন্তাদর্শের সঙ্গে দূরত্ব তৈরি হয়। তাঁরা স্বতন্ত্র পরিচিতি গড়ে তুলতে থাকেন। এঁরাই নাগরিক বাঙালিকরণের পুরোধা, শহুরে ও আধা-শহুরে উদারনৈতিক চিন্তাবিদ এবং মুসলিম সংস্কৃতির ধারা তৈরির লক্ষ্যে সক্রিয় ছিলেন। রোকেয়া এবং অনতিপরের প্রজন্ম ফজিলাতুন্নেসা এই ধারার প্রতিনিধিত্বকারী। আগেই বলা হয়েছে যে, এঁরা নিজেরা যেমন পরিবর্তনের বস্তু হলেন তেমনি হলেন নিয়ন্ত্রকও। ইতিহাসের দাবিতেই এঁদের বহুমুখী হতে হলো—একাধারে ভাষাচর্চাকারী—গদ্য-নিবন্ধ-প্রবন্ধ-উপন্যাস-কবিতা সৃষ্টির, পাশাপাশি সমাজ সংস্কার ও নারী শিক্ষা নিয়ে সক্রিয়। আমরা লক্ষ্য করি এই সময় হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ শিক্ষিতরা উপনিবেশবিরোধী জাতীয়তাবাদের চেতনায় সক্রিয় হচ্ছেন আর মুসলিমরা খুঁজছেন 'স্বরূপসন্ধানী আধুনিকতা'। এই সন্ধানকল্পই রোকেয়াকে নারীত্বের নতুন সংজ্ঞায়নে নিয়ে যায় যা আজও আমাদের ক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক। কিন্তু তিনিও নারীর পর্দা এবং পারিবারিক জীবনের আড়াল রেখেই মতাদর্শ প্রকাশ করেছেন। উল্লেখ করা যায় 'গৃহ', 'অর্ধাঙ্গী' 'সুগৃহিণী', 'বঙ্গীয় নারী সমিতির সভাপতির ভাষণ', 'ধংসের পথে বঙ্গীয় মুসলিম', 'আধুনিক ভারতীয় মেয়েদের জন্য শিক্ষার আদর্শ' ইত্যাদি প্রবন্ধ। তবে উপন্যাসে তিনি জোর দিয়েছেন নারীর অর্থনৈতিক স্বাধীনতার ওপর। কিন্তু রোকেয়ার ভিন্ন তাৎপর্য ধরা পড়ে 'সুলতানার স্বপ্ন' বা 'মুক্তিফল' জাতীয় রূপক রচনায়। এখানে তাঁর চেতনার ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধতা ও নারীসত্তার ইতিবাচক ভূমিকাটি স্পষ্টভাবে প্রকাশিত। তাঁর *পদ্মরাগ* (১৯২৪)-এর 'তারিনীভন' আশ্রমটি বলা চলে রোকেয়ার ইউটোপিয়া। ব্যক্তিগত আবেগ অভিজ্ঞতা, বেদনার রোমান্টিক অর্তি প্রতিফলিত হয়েছে তাঁর রচিত কিছু কবিতায়। কিন্তু অন্তর্গত নিঃসঙ্গতা, নারীর শারীরিক অতৃপ্তি-বেদনার কোনো সরাসরি প্রকাশ ঘটেনি তৎকালীন নারীদের লেখায়। রোকেয়া থেকে শুরু করে নুরুন্নেছা খাতুন (১৮৯৪-৯৫),

সৈয়দা মনোয়ারা খাতুন (১৯০৯-১৯৮১), রাজিয়া খাতুন চৌধুরানী (১৯০৭-১৯৪), শামসুন্নাহার মাহমুদ প্রমুখের রচনায় এমনকি সুফিয়া কামালের প্রথম পর্যায়ের সাহিত্যচর্চার পরিসরেও রয়েছে শুধু অন্দরমহল, বারান্দা, উঠান জাতীয় সনাতনী পরিবার কাঠামোর যাবতীয় অনুষঙ্গ। কারণ এগুলো হচ্ছে নারীর অধিকার ও কর্তৃত্বের জায়গা। এর বাইরে তাঁদের কবিতায় বিধৃত হতো শৈশব স্মৃতি (তখন নারী কিছুটা মুক্ত থাকে) ও নিদ্বন্দ্ব প্রকৃতি-প্রীতি, সৌন্দর্য বর্ণনা। আরেকটি প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়, আন্তর্জাতিক ইসলামি সংস্কৃতির পরিচর্যাও তাঁদের আকৃষ্ট করে। তবে সংস্কৃতি-ভাবনায় মুসলমানদের মানসজগৎ জটিল হতে থাকে এই বিশ শতকের প্রথমার্ধেই—যা পবিত্র কোরআনকেন্দ্রিক হাদিসনির্ভর ব্যাখ্যায় ভরপুর ছিল। কিন্তু জনজীবনে ধ্রুপদী কোরআন হাদিস চর্চার চেয়ে বেশি প্রভাবক ছিল মোল্লাদের নিজস্ব বয়ান-ফতোয়া-খুতবা। কিন্তু শিক্ষিত নারীরা রাজনৈতিক নানা আদর্শের সংঘর্ষশীল পরিপ্রেক্ষিতে অবস্থান করছিলেন বলে তাঁদের রচনাকর্ম হয়ে ওঠে কখনো-কখনো রাজনৈতিক ভাবনাযুক্ত। এবং সমাজ ব্যবস্থার বিশ্লেষণে মুক্তচিন্তক। সতীত্ব, পিতৃতান্ত্রিকতা, অবরোধ প্রথা—এসব বিষয় নিয়ে রাজিয়া খাতুন চৌধুরানী, মিসেস এম. রহমানের মৌলিক কণ্ঠস্বর শোনা যায়:

> ক. পশুক্লেশ নিবারণী সমিতি হইয়াছে, গভর্নমেন্টের দয়ায়; মানুষ খুন করিলে ফাঁসি হয়, আর আমরা যে এতগুলি প্রাণী আলো হাওয়া হইতে বঞ্চিত হইয়া আশা, আনন্দ ও উৎসাহশূন্যভাবে অন্তঃপুরে কঠোর অবরোধ ও পাষাণ প্রাচীরের অন্তরালে তিলে তিলে মরিতেছি, সেদিকে কাহারো দৃষ্টি নাই। (রাজিয়া খাতুন: *সওগাত*, ভাদ্র, ১৩৩৪, ২৭৩)।
>
> খ. এই 'সতী' শব্দটা এক প্রহেলিকা! ইহা নারীদের প্রতি সর্বস্থানে এবং যখন তখন প্রয়োগ করা হয়, কিন্তু পুরুষের প্রতি প্রয়োগ করার মতো ইহার প্রতিশব্দ বাংলা বা এমনকি সভ্য ইংরেজি ভাষা তাহাতেও নাই। 'সতীত্ব' (Chastity) এসব বুলি একমাত্র নারীর জন্যেই একচেটিয়াভাবে তৈরি হইয়াছে। (রাজিয়া: *সওগাত*, ভাদ্র ১৩৩৪, ২৭৩)।

আমরা ইংরেজি সাহিত্যের ক্ষেত্রেও লক্ষ্য করি নারীদের রচিত উপন্যাসে শুধুই বর্ণিত হয় অ্যাডভেঞ্চার, নারীর রোমাঞ্চকর বিচিত্র অভিজ্ঞতা। এবং নারীরা উপন্যাসই বেশি লিখছেন— কবিতার তুলনায়। নারীবাদের তাত্ত্বিকরা এর নানা কারণ চিহ্নিত করেছেন। নারীর কল্পনাশক্তি কম এবং কামনা-বাসনার প্রকাশে তারা কুণ্ঠিত, উপন্যাস তখনো নতুন আঙ্গিক বলে এখানে তাঁরা একটি অকর্ষিত জায়গা খুঁজে পান, সর্বোপরি কবিতায় আত্মসত্তা প্রকাশের চাপ থাকে যা নারীদের মধ্যে পরিপক্ক হয়নি তখনও। আমরা এই ব্যাখ্যার বিপরীতে দুজন নারীকবিকে দেখি যাঁরা মুখ্যত কবিতা চর্চা করেছেন। মাহমুদা খাতুন সিদ্দিকা (১৯০৬-১৯৭৯) এবং সুফিয়া কামাল (১৯১১-১৯৯৯)—রবীন্দ্রনাথের ধারানুসারী ও নজরুলের সমসাময়িক। বস্তুত, এঁদের বিকাশ ঘটে উন্নতমানের পত্রিকার প্রকাশে—যা ব্যক্তির নান্দনিক প্রকাশকে ত্বরান্বিত করায় যথেষ্ঠ ভূমিকা রেখেছে। এঁরা উনিশ শতকীয় রেনেসাঁসের বৈশিষ্ট্য আত্তীকরণের মধ্য দিয়ে নিজেদের মনোভুবন গঠন করেন এবং

জীবনবোধের স্ফূর্তি ও শিল্পচেতনার অঙ্গীকারে কাব্যযাত্রা শুরু করেন। এই ধারায় ক্রমে মুসলিম নারীকবির সংখ্যা বাড়তে থাকে। এই দুজন কবিকে বলা যায় আধুনিক মুসলিম নারীর প্রথম প্রজন্মের কবি। এবং এঁদের কাব্যচর্চায় সংস্কৃতির ও ভাষার সংকট-দ্বিধা বড় হয়ে ওঠেনি, এঁরা নিকটবর্তী হতে পেরেছিলেন তৎকালীন মূল কবিতাধারার হিন্দু নারী বা পুরুষ কবিদের রচনারীতির, ভাববস্তুর। ফলে কবিতার মূলধারায় মুসলিম নারীদের একটা পরিসর তৈরি হয়, কিন্তু স্বাতন্ত্র্যও বজায় থাকে, সেটি ১৯৪৭-এর দেশ বিভাগের ফলে আলাদা মানচিত্র ও জীবনবোধের চিত্রায়ণে হয়ে ওঠে আরো বহুমাত্রিক। নারী তার যে সামাজিক-পরিস্থিতির প্রকাশ ঘটাতে লেখালেখিতে আত্মনিয়োগ করেছিলেন তা ক্রমে স্বাধীন নান্দনিক চর্চার পরিসর তৈরির লক্ষ্যে এগুতে থাকে। রাষ্ট্রগঠন ও শিক্ষার প্রসার এই লক্ষ্যকে শক্তিশালী করে, আবার সময়ের বিবর্তন তার অস্তিত্ব ও অবস্থানকে নিয়ে নানা জিজ্ঞাসায় তাকে আন্দোলিতও করে।

২

১৯৪৭–'৭১ পর্যন্ত আমরা সৃজনশীল ও মননশীল—দুই ক্ষেত্রেই নারীদের সংখ্যাবৃদ্ধি ও গুণগত পরিবর্তন লক্ষ্য করি। এবং সে পরিবর্তনের পরিপ্রেক্ষিত গড়ে দেয় ভাষা আন্দোলন। আমরা জানি যে ভাষাই বাস্তবতা, মানুষ তার সত্তাবিকাশে ও বাস্তবতাকে অধিকার করার জন্যে ভাষাকেই আশ্রয় করে, তার বিবর্তন ও বিকাশ ঘটায়—যা গভীর ভাবে ঘটান সাহিত্যব্রতীরা। ভাষা সমাজের উৎপাদন কাঠামো থেকে উপরিতলে গিয়ে পল্লবিত ও নান্দনিকতা প্রাপ্ত হয়। পাকিস্তান-পর্বে পূর্ববর্তী মাহমুদা খাতুন সিদ্দিকা ও সুফিয়া কামালের লেখালেখির যেমন বিকাশ ও স্ফূর্তি ঘটে তেমনি আবির্ভূত হন কতিপয় নারী সাহিত্যিক যাঁরা সৃজনে-মননে পুরুষ সাহিত্যিকদের সমকক্ষ হয়ে ওঠেন। যেমন, নীলিমা ইব্রাহিম (১৯২০-২০০২), জোবেদা খানম (১৯২০-১৯৮৫) জেব-উন-নিসা জামাল, রাজিয়া মাহবুব (১৯২৮), লায়লা সামাদ (১৯২৮-১৯৮৯), জাহানারা আরজু (১৯৩২), সন্‌জীদা খাতুন (১৯৩৩), রাবেয়া খাতুন (১৯৩৫), নাহার কামাল আহমদ (১৯৩৫), রাজিয়া খান (১৯৩৬) প্রমুখ। এঁদের আবির্ভাব পঞ্চাশের শেষের দিকে, বিকাশ ষাটের দশকে এবং পরিণতি '৭১-পরবর্তী বাংলাদেশে। উল্লিখিত নারীদের মধ্যে নীলিমা ইব্রাহিম, রাজিয়া খান ও সন্‌জীদা খাতুন গদ্যশিল্পী ও উচ্চডিগ্রিধারী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক। তাঁদের সংযোগ ও চলমানতা ছিল বাংলাদেশের রাজনীতি-সংস্কৃতি ও বিদ্যা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে। বিশেষ করে সন্‌জীদা খাতুনের 'ছায়ানট' প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম ও প্রতিষ্ঠান গঠন-পরিচালনার মধ্য দিয়ে গড়ে-ওঠা সাংস্কৃতিক লড়াকুর ভূমিকাটি ন্যস্ত হয়েছে এদেশে রবীন্দ্রনাথের সংগীত ও সাহিত্য প্রসারে ও পরিচর্যায়। আর নীলিমা ইব্রাহিম একই সঙ্গে উপন্যাস-ছোটগল্প ও সাহিত্য সমালোচনা রচনায় ছিলেন স্বচ্ছন্দ। তাঁর লেখনীতে প্রথম পর্যায়ে রোমান্টিসিজম ও প্রকৃতিপ্রেম প্রধান ছিল, পরে রাষ্ট্রীয় জীবনের রক্তাক্ত অভিজ্ঞতার পটে হয়ে ওঠে জীবনযুদ্ধের প্রকাশক, স্মরণীয় রচনা—*আমি বীরাঙ্গনা বলছি* (১ম খণ্ড, ১৯৯৬, ২য় খণ্ড, ১৯৯৭)। কবি মাহমুদা

খাতুন সিদ্দিকার প্রথম গ্রন্থ *পশারিণীর* (১৩৩৮) পর দুটি কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয় *মন ও মৃত্তিকা* (১৯৬০) ও *অরণ্যের সুর* (১৯৬৩) যার বিষয়বস্তু ছিল প্রেম-প্রকৃতি-সৌন্দর্যের গভীরতা সন্ধান ও রবীন্দ্রকাব্য ভাষার অনুসরণ, তবে কাব্যগুলিতে বিমূর্ত ভাববাদের চেয়ে বস্তুবাদী দৃষ্টিভঙ্গির প্রকাশ ঘটেছে। এসময় সুফিয়া কামাল বিচিত্রমুখী হয়ে ওঠেন এবং রাজনীতি-সংস্কৃতির সঙ্গে সক্রিয় অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে বাঙালি মুসলিম নারীদের নেতৃত্ব পদে অধিষ্ঠিত হন। তাঁর লেখনীতে যেমন প্রকৃতি-প্রেম-সৌন্দর্য ও মুসলিম সংস্কৃতি ও দেশচেতনার সংমিশ্রণ ঘটেছে তেমনি আছে জীবনকে বোধে ও ভাষায় অভিব্যক্ত করার স্বকীয় শৈলী। তিনি রোমান্টিক বাস্তববাদ ও উদারনৈতিক ভাববাদের এক শক্তিশালী উত্তরাধিকারী। জাহানারা আরজুর কবিতাবলি, জেব-উন-নিসা জামালের গান-ছোটগল্প নারীদের সাহিত্যচর্চাকে সামনে এগিয়ে নিয়ে গেছে। তবে উপন্যাসই হয়ে উঠেছে তাঁদের সদর্প উপস্থিতি ও স্বকীয়তা তুলে ধরার বিচরণ ভূমি। বিশেষত রাবেয়া খাতুন নিরলসভাবে উপন্যাস লিখে একজন অন্যতম শ্রেষ্ঠ কথাশিল্পী হিসেবে বৃত হয়েছেন। তাঁর লেখার বিষয়ে বিচিত্র স্থানকাল ও ঘটনা প্রবেশ করে, বাঙালি মুসলিম নারীদের জীবন-পরিসর ও ঘটনাবহুল হয়ে ওঠার তাৎপর্যটি তিনি ধারণ করতে পেরেছেন। এবং আখ্যানমূলক উপন্যাস ধারার পরিচর্যা করে গল্পকাহিনীকে পাঠকপ্রিয়তা দিয়েছেন। রাজিয়া খানের বৈশিষ্ট্য তিনি জীবনচিত্রকে খুবই আধুনিক দৃষ্টিকোণে দেখেছেন এবং তাঁর ভাষা, অন্তর্বয়ন ও রূপকল্প খুবই পরিশীলিত ও উন্নতমানের। *বটতলার উপন্যাস* (১৯৫৯), *অনুকল্প* (১৯৫৯), *প্রতিচিত্র* (১৯৭৬), *চিত্রকাব্য* (১৯৮০), *দ্রৌপদী* (১৯৯৩), *পাদবিক* (১৯৯৮) ইত্যাদি রচনায় রাজিয়া খান হয়ে ওঠেন 'জটিলায়তন নগরজীবন–অর্ন্তগত ব্যক্তিমানুষের নৈঃসঙ্গ্য, বিচ্ছিন্নতা ও আত্মরক্ত ক্ষরণের' (রফিকউল্লাহ: ১৯৯৭, ১৪৬) রূপায়ণকারী। মনোজগতের জটিল চিত্রণে, বিশেষ করে বাক্যপুঞ্জে ঘটনার ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া ও চরিত্রচিত্ত উন্মোচনে তাঁর কৃতিত্ব উল্লেখযোগ্য। জীবনযাপনের ব্যাপ্তি আর মনস্তাত্ত্বিক কূটস্তরকে ধারণ করায় তাঁর রচনাকর্ম প্রকারান্তরে নারীর মননশীল শিল্পসত্তাকেই প্রকাশ করেছে। তিনিই প্রথম সৃষ্টিশীলতার চর্চায় ইংরেজিতে লিখেছিলেন *Arus* (১৯৭৮) ও *Cruel April* (১৯৭৭) গ্রন্থ দুটিকে এখানে উল্লেখ করা যায়।

এই পর্বের দ্বিতীয় পর্যায়ের নারী লেখিকারা লেখার বৃত্ত আরো বাড়িয়ে দেন, কবিতা ও গদ্যশিল্পে সমান পদচারণায় গতিশীল হন। দেশ-জাতি-সমাজ সম্পর্কে তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গি একদিকে বাস্তবঘনিষ্ঠ হয় আরেক দিকে প্রকাশ ও রূপায়ণের নান্দনিক কুশলতা অর্জনের দক্ষতাও বৃদ্ধি পেতে থাকে। শিক্ষাক্ষেত্রে নারীর সংখ্যাবৃদ্ধি বিশেষ করে উচ্চশিক্ষার পর্যায়ে তাদের অংশগ্রহণ, সাহিত্য পঠনপাঠনের ক্ষেত্রে মনোযোগ ও সুযোগ লাভ, পেশাগত জীবন বেছে নেওয়ার স্বাধীনতা ইত্যাদি সমাজবাস্তবতা বাড়িয়ে দেয় নারীর সাহিত্যচর্চার পরিসরকে। তৎকালীন রাষ্ট্রনৈতিক পরিবেশ ছিল সামরিক শাসনের অর্ধসামন্ত অর্ধউপনিবেশের বিরুদ্ধে বাঙালির আত্মনিয়ন্ত্রণ ও অর্থনৈতিক-সাংস্কৃতিক মুক্তিলাভের

আকাঙ্ক্ষা-আন্দোলন-সংগ্রামের ঘটনায় কল্লোলিত। এই ঘটনাবলিতে বাঙালিরা রাজনীতিচেতনায় ও সাংস্কৃতিক বোধে শক্তিশালী হয় যার সক্রিয় প্রকাশ ঘটে একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধে। তাই এ-পর্যায়ের লেখালেখিতে যুক্ত হতে থাকে ঐতিহ্যচেতনা, ইতিহাসদৃষ্টি, দেশের মূল জীবনধারার ও প্রান্তিক মানুষের জীবনচিত্র, বিশেষ করে কথাশিল্পের পরিধি বিস্তৃত হতে থাকে, নারীর দৃষ্টিলোকে বহু মানুষের সমস্যা ও গণমানুষের জীবন ধরা দেয়। নারীর একলা সমস্যাকে বৃহত্তর সমাজ সমস্যার সঙ্গে মিলিয়ে নেয়, এক অর্থে তাঁদের লেখালেখি হয়ে ওঠে প্রকৃত জীবনশিল্পীর মতো সর্বমাত্রিক ও সর্বজ্ঞ। কবিতা, গল্প-উপন্যাস ও প্রবন্ধ রচনায় নিবেদিত অনেক নারী লেখকের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছেন আখতার ইমাম (১৯১৭-২০০৯), মেহের কবির (১৯২১), সৈয়দা লুৎফুন্নেসা (১৯২৪), হামিদা রহমান (১৯২৭), হেলেনা খান (১৯২৯), রাজিয়া মাহবুব (১৯২৮), জাহানারা ইমাম (১৯২৯-৯৪), মনোয়ারা বেগম (১৯৩০), রাজিয়া মজিদ (১৯৩০), খালেদা সালাহউদ্দিন (১৯৩০), দিলারা হাশেম (১৯৩৬), মকবুলা মনজুর (১৯৩৮), সালেহা চৌধুরী (১৯৪৩), দিলারা জাহান (১৯৪৩) প্রমুখ (ভীষ্মদেবঃ তদেব, ৪৫)। এঁদের প্রায় সকলেই উচ্চশিক্ষিতা, ষাটের দশকের হলেও এঁদের লেখালেখির বিশেষ বিকাশ ঘটে স্বাধীনতা-পরবর্তী বাংলাদেশে। মননশীলতা ও সৃষ্টিশীলতার সহযোগে এঁদের রচনাকর্ম হয়ে ওঠে বিশেষ মানসম্পন্ন। এ-সময়ের শেষ পর্যায়ে গণআন্দোলন-জাতীয়তা-সমাজতান্ত্রিক চেতনার অবলম্বনে রাজনৈতিক বীক্ষা ও জীবনসচেতন সাহিত্যচর্চার যে ভিত্তি গড়ে উঠতে থাকে তার প্রসারণ ঘটে সত্তরের দশকে। রিজিয়া রহমান (১৯৩৯), সেলিনা হোসেন (১৯৪৭) ছাড়াও আরো একঝাঁক নারী লেখকের রচনায় আমরা এর প্রমাণ পাই—যাঁরা একাত্তর-পরবর্তী পরিপ্রেক্ষিতে নিজেদের ছড়িয়ে দিয়েছেন সমাজের বৃত্তকেন্দ্র থেকে পরিধি পর্যন্ত। বস্তুত, বাংলাদেশ রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা ও স্বাধীনতাবোধ, নারীকে খোলা আকাশের নিচে দাঁড়ানোর সাহসই শুধু দেয় না তাঁকে আত্মপ্রকাশের ক্ষেত্রে পুরুষের কাতারে এনেও দাঁড় করায়। এর ফলে একদিকে জেন্ডার বৈষম্য যেমন উন্মোচিত হয়ে পড়ে, তেমনি সমাজে সমতার একটা ধারাও তৈরি হতে থাকে এবং আরো লক্ষণীয় এ সময় অধিক সংখ্যায় নারীরা কবি হয়ে উঠছেন, যা প্রমাণ করে যে, নারীর কল্পনাশক্তি বহির্জগতের অভিজ্ঞতায় বিচিত্ররূপ নিচ্ছে, শক্তিশালী হচ্ছে এবং তাদের অর্জিত বুদ্ধি-বৈদগ্ধ্যের সংস্পর্শে ওই কল্পনা আধুনিক কবিতার শব্দে-ছন্দে দানা বাঁধছে। নিছক জীবতাত্ত্বিক পরিচিতির বাইরে নারী তার সৃজনশীল মানবিক সত্তাকে অর্জন করতে সমর্থ হচ্ছেন।

৩

একাত্তর পরবর্তী কাল থেকে বর্তমান পর্যন্ত স্বাধীন বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে নারীদের সাহিত্যচর্চায় নতুন মাত্রা যুক্ত হয়, তাঁদের সংখ্যা বাড়তে থাকে—গুণগত তাৎপর্যেও তাঁরা দৃশ্যমান হতে থাকেন। বিশেষ করে কথাশিল্পের ক্ষেত্রে শক্তিমান নারী সাহিত্যিকরা বিষয় ও নির্মাণশৈলীতে শুধু দক্ষতাই দেখান না, নানা রকম আধুনিক নিরীক্ষাও করতে থাকেন।

রিজিয়া রহমান যুদ্ধোত্তরকালীন সমাজের ক্ষত ও ক্ষতির ছবি আঁকেন *রক্তের অক্ষর* (১৯৭৮) উপন্যাসে। এবং 'ব্যর্থতা, যন্ত্রণা ও পরাভবের সর্বগ্রাসী প্রতিষ্ঠার মধ্যেও ... সন্ধান করেন আলো ও শুশ্রূষা' (রফিকউল্লাহ: তদেব, ২৭৪)। তাঁর বিষয়বস্তু বহুমাত্রিক, মুক্তিযুদ্ধ, বীরাঙ্গনার জীবন ছাড়াও তুলে ধরেন বাঙালি জাতির নৃতত্ত্ব-ভূগোল-সমাজ-সংস্কৃতি-রাজনীতির দীর্ঘ পরিসর— *বং থেকে বাংলায়* (১৯৭৮)। এবং পরিসরকে কেন্দ্রবদ্ধ করেন স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার অহংকারে। এছাড়াও আঞ্চলিক উপন্যাস রচনায় তাঁর কৃতিত্ব সমান প্রশংসনীয়। সেলিনা হোসেনের সাহিত্যসাধনা দীর্ঘপ্রবাহী ও আজো অব্যাহত। ঐতিহ্যের পুনর্সৃজন, সম্প্রীতি ও মানবীয় স্বাধীনতার চেতনা, রাজনীতির অন্তর্সত্য, নারী ব্যক্তিত্বের জাগরণ, লৈঙ্গিক বৈষম্যের নিরসন (ভীষ্মদেব: তদেব, ৪৭) তাঁর বিষয়বস্তু। আঞ্চলিক জীবনপটে মানুষের অস্তিত্বসংগ্রাম রূপায়িত হয়- *জলোচ্ছ্বাস* (১৯৭২), *পোকামাকড়ের ঘরবসতি* (১৯৮৬) উপন্যাসে এবং রাজনৈতিক চরিত্র-ঘটনার শিল্পায়ন ছাড়াও মধ্যবিত্ত-নিম্নবিত্ত জীবনের গভীরে তিনি বিচরণ করেন। এই দুই নারীলেখকই উপন্যাস-গল্পের ক্ষেত্রে নব্য বাস্তবতাবাদের (Neo-realism) চর্চাকারী এবং সমাজ ও নারীর মুক্তিকল্পনার মঙ্গলবোধে ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গির ধারক-বাহক।

একথা বলা বাহুল্য যে, একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের সঙ্গে জড়িয়ে গিয়েছিল বীরাঙ্গনা নারীর জীবন সংকট এবং সমবেত ভাবেই নারীমুক্তির প্রকল্প। নারীলেখকদের রচনায় এই পরিসরটি শিল্পিত হয়ে একটি ভিন্ন তাৎপর্য সৃষ্টি করে: ব্রিটিশ উপনিবেশে নারীর যে সাহিত্যচর্চা ছিল অবগুণ্ঠিত ও ক্ষুদ্র পরিসরে-পরিমাপে আবদ্ধ; পাকিস্তান-পর্বে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর আধুনিকায়নের রাজনীতি-সংস্কৃতিকেন্দ্রিক সংগ্রামে তাঁদের সে প্রকাশ ছিল নিছক আত্মজাগরণমূলক ও কল্পনাদর্শী, একাত্তরের যুদ্ধ ও পরবর্তী পরিপ্রেক্ষিতে তাঁরা হলেন রাষ্ট্রের মূলধারায় সম্পৃক্ত, সক্রিয় সামাজিক ইউনিট রূপে দৃশ্যমান। বিগত তিন-চার দশক জুড়ে রাষ্ট্রকাঠামোতে তাঁদের ক্ষমতায়ন, কৃষি ও শিল্পের উৎপাদনে অংশগ্রহণ ও শিক্ষায়নের মধ্য দিয়ে যে বিস্তার ঘটে চলছে তা সাহিত্যচর্চাকেও প্রসারণশীল করে তুলছে, এবং সবচেয়ে লক্ষণীয় কবিতার ভুবনে নারীর লেখনীতে আধুনিক ধারার আত্তীকরণ ঘটছে। সত্তরের দশকে জিনাত আরা রফিক, সুরাইয়া খানম, নাসিমা সুলতানা, জরিনা আখতার, নাসরীন নঈম, শামীম আজাদ, শাহানা মাহবুব, দিলারা হাফিজ নুরুন্নাহার শিরীন, শাহজাদী আঞ্জুমান আরা প্রমুখ কবির নাম উল্লেখযোগ্য। সুরাইয়া খানমের কণ্ঠস্বর রোমান্টিক আর্দ্র আবেগ কম্পিত; নাসিমা সুলতানা 'ঋজু সাহসী স্পষ্ট ও দ্বিধাহীন, জিনাত আরা রফিক শমিত, মননশীলতায় আবেগময়, শব্দছন্দ নির্মাণে পরিশীলিত। লক্ষণীয় সত্তরের পুরুষ কবিরা যখন উচ্চকণ্ঠ শ্লোগানমুখর—মুক্তিযুদ্ধ ও স্বপ্নভঙ্গের বেদনায় দীর্ণ তখন নারীকবির লেখনীতে ফুটে ওঠে চাওয়ার সঙ্গে পাওয়ার অসদ্ভাব সত্ত্বেও পুনর্জন্মের আশ্বাস, সৃষ্টির প্রাণলীলা ও ভ্রূণকে বাঁচিয়ে রাখার প্রতীতি; এটা বোধকরি এজন্যে যে বৈশ্বিক-দৈশিক জীবন-জটিলতায় নারীই হয় 'রক্ষয়িত্রী' (রবীন্দ্রনাথের 'নারী' প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য, ১৩৪৩)। তাঁর

গর্ভধারণ শক্তিটি নারীকে যে সৃষ্টিশীল ক্ষমতার ও বেদনার অধিকারী করে তাই-ই সম্পৃক্ত হয় কবিতার জন্মেও, শব্দে-ছন্দে-অলংকারে। ফলে কারো কারো লেখায় এক ধরনের জীবতাত্ত্বিকতা ভর করে, নারীমুক্তির নামে যৌনতার প্রকল্প দেখা দেয়—যেমন তসলিমা নাসরীনের সাহিত্যচর্চা—যা শেষ পর্যন্ত নারীবাদী তত্ত্বের উগ্রফেমিনিস্ট ধারায় যুক্ত হয় এবং এক ধরনের পুরুষ বিদ্বেষী হিংস্র মনোভাবে পর্যবসিত হয়। নারীর ব্যক্তিসত্তাকে মানবিক ও মুক্তসত্তায় উত্তরণের ক্ষেত্রে এই মনোভাব কতটা সহায়ক তা প্রশ্নসাপেক্ষ। তবে, আশি ও নব্বইয়ে এমনকি একুশ শতকের শূন্য দশকেও, নারীদের কবিতা ভাবে ও শৈলীতে ধারণ করতে চাইছে কবিব্যক্তিত্বের স্বকীয়ত্ব—নিছক নারীত্ব নিয়ে অহঙ্কার বা পুরুষবিমুখতা প্রধান হয়ে ওঠেনি। পরিবার-দাম্পত্য-সমাজ-দেশ ও বিশ্ব–সবই এঁদের লেখনীতে পরীক্ষিত হচ্ছে, প্রশ্নবিদ্ধ হচ্ছে, আবার দিক-নির্দেশনাও দিচ্ছে। আত্মবিস্তারের যে স্পেস নারীর চাই তা প্রেমের প্রতিবন্ধকতার দেয়াল যেমন ভাঙতে চায় তেমনি তার মানুষী-সত্তায় যে সামাজিক মন ও স্নেহশীলতা আছে তাকেও পরিত্যাগ করে না।। যদিও তাঁরা পুরুষরচিত ভাবানুষঙ্গই কবিতায় ব্যবহার করেন, তবুও প্রেমের পদাবলি নারীর কণ্ঠে নতুন হয়ে ওঠে:

> ভালোবাসার জন্যে চাই বিশাল আকাশ উন্মুক্ত প্রান্তর গভীর জলাশয় দীর্ঘ বেলাভূমি ভালোবাসার জন্য চাই চক্ষু কর্ণ ওষ্ঠ নাসিকা ত্বক আপাদমস্তক সমস্ত শরীর, ভালোবাসা একটি শিল্পের মতন ভালোবাসা দিয়ে একটি চুম্বন আঁকা যায় আঁকা যায় আলিঙ্গন আশ্লেষ সঙ্গম ও শীৎকার ভালোবাসা দিয়ে পান করা যায় সুন্দর মুখ, পবিত্র আত্মা ('যদি ভালোবাস', নাসিমা সুলতানা)।

এই ধরনের ভালোবাসা প্রকাশ এতকাল পুরুষ কণ্ঠেই উচ্চারিত হতো। ফলে বলা চলে অন্তত প্রেমপ্রকাশে অলজ্জ হলেও নারীর কবিতায় ভিন্ন ভাষানুষঙ্গ এখনো আসছে না। বোধ করি বিদ্যমান সমাজকাঠামো, ঐতিহ্যবহ পরিবারতন্ত্র ইত্যাদি কাঠামোর মধ্যে আবর্তিত জীবনের এটাই ভাষারূপ, তা আরো দীর্ঘকাল বহাল থাকবে। তবে, বিশ্বায়ন ও কর্পোরেট পুঁজিবাদের চক্রে আবদ্ধ আজকের রাষ্ট্রকাঠামো, একই সঙ্গে বিশ্বসংস্কৃতি ও সাহিত্যের প্রভাব-প্রেরণা এবং শিক্ষা-রাজনীতি-সংস্কৃতি ও উৎপাদন ব্যবস্থার মধ্যেও নারীদের ব্যাপক অংশগ্রহণ ইত্যাকার বাস্তবতায় তাঁদের সাহিত্যচর্চা দিগন্ত বিস্তারী ও বহুমুখী হচ্ছে, একই সঙ্গে বাংলা সাহিত্যশিল্পের পরিসরকেও ব্যাপ্ত ও বর্ণগভীর করছে। যেমন, এখানে ঔপন্যাসিক নাসরীন জাহানের নাম উল্লেখ করতেই হয়। তিনি ঢাকার নগর চেতনার নানা সংকটের সঙ্গে নারী ও পুরুষের বোধ-অনুভূতি ও মনস্তাত্ত্বিক জটিলতার ও ব্যাপ্তির ভাষাচিত্র তৈরি করতে সক্ষম হয়েছেন। লক্ষণীয়, এই ব্যাপ্ততা ও গভীরতায় বাঙালি মুসলিম নারী সাহিত্যিকের অবস্থান এখন সুদৃঢ়। এবং মেধাবী কল্পনা ও সৃষ্টিশীলতার যৌগপদ্যে পুরুষ লেখকের সমকক্ষ, কখনো বা উচ্চ। তাঁরা সাহিত্যের সকল শাখায় পদচারণা করছেন, বিষয়ের বহুমুখিতাই নয়, তাঁদের রচনারীতিও অগ্রসর পরীক্ষা-নিরীক্ষায় যত্নশীল, কেউবা নতুন রীতির জন্মও দিচ্ছেন।

গ্রন্থপঞ্জি

১. আনিসুজ্জামান, *মুসলিম মানস ও বাংলা সাহিত্য*, মুক্তধারা, ১৯৬৪ (১ম প্রকাশ)
২. অধ্যাপক মজিরউদ্দিন, *বাংলা সাহিত্যে মুসলিম মহিলা*, দিদার পাবলিশিং হাউস, ঢাকা, ১৯৬৭
৩. গোলাম মুরিশিদ, 'প্রথম মুসলমান গদ্য লেখিকা: তাহেরণ নেছা', বাংলা একাডেমী গবেষণা পত্রিকা, ঢাকা, মাঘ-আষাঢ়, ১৩৮৩-৮৪
৪. আবুল আহসান চৌধুরী, *সাহিত্যের রূপকার; পুনর্বিচারের অবলোকন*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ২০১১
৫. ভীষ্মদেব চৌধুরী, *সাহিত্য-সাধনায় ঢাকার নারী*, ধ্রুবপদ, ঢাকা ২০১১
৬. মুহম্মদ মনসুরউদ্দিন, *বাংলা সাহিত্যে মুসলিম সাধনা*, (২য় খণ্ড), ঢাকা, ২০০৫
৭. রফিকউল্লাহ খান, *বাংলাদেশের উপন্যাস, বিষয় ও শিল্পরূপ*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৯৭
৮. নীহাররঞ্জন রায়, *বাঙালির ইতিহাস, আদিপর্ব*, দেজ পাবরিশিং কলকাতা, ১৩৫৬, ২য় সংস্করণ, ১৪০২
৯. মাহমুদ শামসুল হক, *বাঙালি নারী*, পাঠক সমাবেশ, ঢাকা, ২০০০
১০. সোনিয়া নিশাত আমিন, *The World of Muslim Women in Colonial Bengal*, BRILL এর অনুবাদ-*বাঙালি মুসলিম নারীর আধুনিকায়ন*, পাপড়ীন নাহার, বাংলা একাডেমি, ঢাকা ২০০২
১১. সৈয়দ মূর্তাজা আলী, 'মরমী কবি হাসন রাজা', লোকসাহিত্য পত্রিকা, কুষ্টিয়া ইলাই/ ডিসেম্বর, ১৯৭৯
১২. মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান সম্পাদিত, 'সাহিত্য পত্রিকা', বাংলা বিভাগ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, প্রথম সংখ্যা, শীত, ১৩৮৭
১৩. রলাঁ বার্ত, *Mythologies*, Glassgow, 1957

বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি পত্রিকা, দ্বাত্রিংশ খণ্ড, শীত সংখ্যা, পৌষ ১৪২১/ডিসেম্বর ২০১৪

বাংলাদেশের নবম জাতীয় সংসদ : একটি পর্যালোচনা

জালাল ফিরোজ*

সারসংক্ষেপ

২০০৮ অনুষ্ঠিত একটি প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ নির্বাচনের পর বাংলাদেশের নবম জাতীয় সংসদ গঠিত হয়। এই সংসদ মেয়াদপূর্তির পর বিলুপ্ত হয়েছে। নবম সংসদ সংবিধান সংশোধনীসহ অনেক গুরুত্বপূর্ণ আইন প্রণীত, বাজেট উত্থাপিত ও আলোচিত হয়। সংসদীয় কমিটিসমূহ কাজ করেছে। সরকারের কাজ তদারকির চেষ্টাও সংসদীয় কমিটিসমূহের পক্ষ থেকে হয়েছে। এসব ঐতিহাসিক দিক সত্ত্বেও নবম সংসদ বিরোধী দলের সংসদ বর্জন এবং সরকারী ও বিরোধী দলের সদস্যদের পারস্পরের প্রতি আশোভন আচরণের জন্য বেশি বিতর্কিত ও সমালোচিত হয়। সমসাময়িক বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ আইনী ও রাজনৈতিক বিষয়ে সংসদে আলোচনা/বিতর্ক হয়েছে। এসব আলোচনা/বিতর্ক এবং সংসদের কার্যক্রম নিয়ে দেশের নাগরিক সমাজ বিভিন্ন সময় প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছে। বর্তমান প্রবন্ধে নবম সংসদের সামগ্রিক কাজের একটি বিশ্লেষণ করা হয়েছে। রাজনৈতিক উন্নয়নে এবং বাংলাদেশে সংসদীয় সংস্কৃতি বিকাশে এই সংসদের অবদান/অবস্থান নির্ণয় এই প্রবন্ধের লক্ষ্য।

১. ভূমিকা

রাজনৈতিক ব্যবস্থায় পার্লামেন্টের অবস্থান রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের কাছে বিভিন্নভাবে বিশ্লেষিত হয়েছে। কেউ কেউ পার্লামেন্ট বা আইনসভাকে দেখেছেন 'as a sub-system of a political system'[১] হিসেবে। আবার এটাও বলা হয়েছে যে, পার্লামেন্টারী বা সংসদীয় ব্যবস্থা (parliamentary system) 'a form of government' এবং a way of life'[২]-ও। পার্লামেন্ট-অধ্যয়নের অনেক পদ্ধতি (approaches) রয়েছে। একটি হলো 'ইনপুট-আউটপুট' পদ্ধতি। এই পদ্ধতি অনুযায়ী বিভিন্ন রাজনৈতিক দল, চাপসৃষ্টিকারী গ্রুপ (pressure groups) ও অন্যান্য এজেন্সি কি কি দাবিনামা ও স্বার্থের কথা পার্লামেন্টের কাছে তুলে ধরে এবং এসব বিষয়ে পার্লামেন্ট কিভাবে নীতি নির্ধারণ/পরিবর্তন করে তা গভীরভাবে আলোচিত ও বিশ্লেষিত হয়। অন্য পদ্ধতি হলো বা সাংসদকেন্দ্রিক বা legislator-oriented। এই পদ্ধতিতে একজন সাংসদের রাজনৈতিক, শিক্ষাগত, অর্থনৈতিক ও পেশাগত পটভূমি জানা হয় এবং এগুলো কিভাবে তার দলীয় ও সংসদীয় আচরণ ও কার্যক্রমকে প্রভাবিত করে তা আলোচিত ও মূল্যায়িত হয়। আরেকটি হলো সংসদকেন্দ্রিক রাজনৈতিক প্রক্রিয়া অন্বেষণ পদ্ধতি।[৩] এই পদ্ধতি সংসদে অংশগ্রণকারী বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের ভূমিকা এবং এসব দলের পারস্পরিক সম্পর্ক বিশ্লেষণের মাধ্যমে পার্লামেন্টের অগ্রগতি, মান এবং সাফল্য ব্যর্থতা নিরূপণ করে।

---

* উপ-পরিচালক, বাংলা একাডেমী, ঢাকা-১০০০

বাংলাদেশের নবম জাতীয় সংসদ দেশের চতুর্থ সংসদ[৪] যা পূর্ণ মেয়াদ টিকে থাকার পর স্বাভাবিকভাবে বিলুপ্ত হয়েছে। নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে আওয়ামী লীগের নেতৃত্বাধীন মহাজোট দুই-তৃতীয়াংশের বেশি আসনে বিজয়ী হয়। সরকারী দল বা জোটের বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা কি সংসদীয় কার্যক্রমে নেতিবাচক প্রভাব ফেলে? নবম সংসদ বাংলাদেশের জাতীয় সংসদের প্রাতিষ্ঠানিক বিকাশে কি রকম অবদান রেখেছে? এই সংসদের আইন প্রণয়ন কার্যক্রম কিভাবে মূল্যায়িত হবে? সরকারী কাজের উপর সংসদীয় নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠায় এই সংসদ কতটুকু সাফল্য দেখিয়েছে? এই সংসদ আমলে কমিটি ব্যবস্থা কিভাবে কার্যকর থেকেছে? বিভিন্ন সংসদীয় প্রতিষ্ঠান যেমন, স্পীকার, সংসদ-নেতা, বিরোধী দলের নেতা কিভাবে কাজ করেছেন? নবম সংসদে সরকারী ও বিরোধী দলের পারস্পরিক আচরণ কেমন ছিল? বিরোধী দলের সংসদ বর্জন ও ওয়াকআউটে কি কোনো নতুন মাত্রা যুক্ত হয়েছে? হয়ে থাকলে এর ধরন কেমন? সরকারী ও বিরোধী দলের সদস্যদের অ-সংসদীয় আচরণ নিয়ন্ত্রণে নবম সংসদ কত দক্ষতা দেখিয়েছে? বাংলাদেশের রাজনীতিতে সংঘটিত সাম্প্রতিক সহিংসতায় নবম সংসদের কি কোনো দায় আছে? সর্বোপরি, বাংলাদেশে সংসদীয় সংস্কৃতি বিকাশের ইতিহাসে নবম সংসদ কিভাবে মূল্যায়িত হবে, এটি কি সফল না ব্যর্থ? বর্তমান প্রবন্ধে উপর্যুক্ত কোনো একটি নির্দিষ্ট পদ্ধতির (approach) প্রয়োগে নয় বরং একাধিক পদ্ধতি ব্যবহার করে উত্থাপিত প্রশ্নসমূহের উত্তর অনুসন্ধানের চেষ্টা করা হয়েছে। এই গবেষণা-প্রবন্ধটি বর্ণনা ও বিশ্লেষণমূলক। উপাত্ত সংগৃহীত হয়েছে প্রধানত পরোক্ষ (secondary) উৎস থেকে।

২. নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচন

নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচন হয় ২০০৮ সালের ২৯ ডিসেম্বর, এক জটিল রাজনৈতিক পটভূমিতে। সংবিধানের ত্রয়োদশ সংশোধনী অনুযায়ী গৃহীত তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থার অধীনে সপ্তম ও অষ্টম সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এই সংশোধনীতে সর্বশেষ অবসরপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতির নেতৃত্বে গঠিত একটি নির্দলীয় সরকারের অধীনে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠানের বিধান রাখা হয়। এই ব্যবস্থার অধীনে নবম সংসদের নির্বাচন অনুষ্ঠানের আয়োজনও চলতে থাকে। কিন্তু সংবিধানের চতুর্দশ সংশোধনী রাজনীতিতে নতুন বিতর্ক ও সংকটের জন্ম দেয়। এই সংশোধনী বিচারকদের কর্মে বহাল থাকার মেয়াদ ৬৫ থেকে ৬৭ বছরে বর্ধিত করে। আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে বিরোধী দলগুলো এই সংশোধনীর বিরোধিতা করে। বলা হয় যে, এর ফলে অবসরপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি হিসেবে কে. এম. হাসান তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান হবেন যিনি এক সময় সরকারী দল বিএনপি-র রাজনীতির সঙ্গে সরাসরি যুক্ত ছিলেন। বিরোধী দল কেবল বিরোধিতা নয় বিচারপতি কে. এম. হাসান যাতে তত্তাবধায়ক সরকারের প্রধান হতে না পারেন সেজন্য আন্দোলনও শুরু করে। এক পর্যায়ে বিচারপতি হাসান তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা হতে অনীহা প্রকাশ করেন। এরপর রাষ্ট্রপতি ইয়াজুদ্দিন আহমেদ সংবিধানে বর্ণিত অন্য কিছু বিকল্প শর্ত

প্রয়োগের চেষ্টা না-করে নিজেই তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। বিরোধী দলগুলো রাষ্ট্রপতির এই সিদ্ধান্তের সমালোচনা ও বিরোধিতা করে। ইয়াজুদ্দিন আহমদের নেতৃত্বাধীন তত্ত্বাবধায়ক সরকার ২০০৭ সালের ১১ই জানুয়ারি নির্বাচন অনুষ্ঠানের দিকে অগ্রসর হতে থাকে। অন্যদিকে বিরোধী পক্ষও নির্বাচন প্রতিহতকরণের আন্দোলন শুরু করে। এক পর্যায়ে আন্দোলন তীব্রতর ও সহিংস রূপ ধারণ করে। জনজীবন অশান্ত ও বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। এই অবস্থায় সামরিক বাহিনীর চাপে রাষ্ট্রপতি ইয়াজুদ্দিন আহমেদ ১১ জানুয়ারি সারাদেশে জরুরি অবস্থা ঘোষণা করেন। ফখরুদ্দিন আহমেদের নেতৃত্বে নতুন সরকার গঠিত হয়। এই সরকার নির্ভুল ভোটার তালিকা প্রণয়ন এবং ভোটারদের পরিচয়পত্র প্রদানসহ কিছু নির্বাচনী সংস্কার বাস্তবায়ন করে। এই সরকারের অধীনে নবম সংসদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়।

৩. দলীয় অবস্থান

এই নির্বাচনে আওয়ামী লীগের নেতৃত্বাধীন মহাজোট ৩০০ সাধারণ আসনের মধ্যে ২৬২টি এবং বিএনপির নেতৃত্বাধীন চার দলীয় জোট ৩২টি আসন লাভ করে। আওয়ামী লীগ এককভাবে ২৩২টি এবং বিএনপি ৩০টি আসনে বিজয়ী হয়। নিম্নের সারণি থেকে দেখা যায়, সরকারী দল আওয়ামী লীগ ৪৯ শতাংশ ভোট পেয়ে ৭৭.৩৩ শতাংশ আসন লাভ করে। অন্যদিকে প্রধান বিরোধী দল বিএনপি-র প্রাপ্ত ভোট ৩৩.২০ শতাংশ অথচ আসন পায় মাত্র ১০ শতাংশ। বড়ো দুই দলের প্রাপ্ত ভোটের ব্যবধান ১৫.৮ শতাংশ অথচ আসনের পার্থক্য ২০০-এর বেশি। নির্বাচনের এই ফল সংসদে এক দলের একাধিপত্য প্রতিষ্ঠিত করে। সরকারী ও বিরোধী দলের সংখ্যা-বৈষম্য সংসদের সামগ্রিক কার্যক্রমে নেতিবাচক প্রভাব ফেলে।

সারণি-১: নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের ফল: বিভিন্ন দলের প্রাপ্ত আসন, ভোট এবং শতকরা হার

ক্রমিক	দল	প্রাপ্ত আসন	প্রাপ্ত ভোট	শতকরা হার
১	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	২৩২+৩২	৩,৩৮,৮৭,৪৫১	৪৯%
২	বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল	৩০+৫	২,২৯,৬৩,৮৩৬	৩৩.২০%
৩	জাতীয় পার্টি (এরশাদ)	২৫+৪	৪৮,৬৭,৩৭৭	৭%
৪	জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (ইনু)	৩	৪,২৯,৭৭৩	০.৬%
৫	বাংলাদেশ ওয়ার্কার্স পার্টি	২	২,১৪,৪৪০	০.৩%
৬	জামায়াত-ই-ইসলামী	২	৩১,৮৬,৩৮৪	৪.৬%
৭	জাতীয় পার্টি (নাজিউর)	১	৯৫,১৫৮	০.১%
৮	লিবারেল ডেমোক্রেটিক পার্টি	১	১,৬১,৩৭২	০.২%
৯	স্বতন্ত্র	৪	৩৩,৬৬,৮৫৮	৪.৯%
	মোট	৩০০+৪৫	৬,৯১,৭২,৬৪৯	৯৯.৯৯%

উৎস: বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন এবং জালাল ফিরোজ, *পার্লামেন্টারি শব্দকোষ*, বাংলা একাডেমী, দ্বিতীয় সংস্করণ, ২০১০, ঢাকা, পৃ. ৩০৯

৪. অধিবেশন

নবম জাতীয় সংসদদের প্রথম অধিবেশন বসে ২০০৯ সালের ২৫ জানুয়ারি। এই সংসদের সর্বশেষ বৈঠক হয় ২০১৩ সালের ২০শে নভেম্বর। উনিশটি অধিবেশনে নবম জাতীয় সংসদের মোট ৪১৮টি কার্যদিবস ছিল। অন্য সকল সংসদের তুলনায় এই সংসদের কার্যদিবস বেশি। এর আগে পঞ্চম জাতীয় সংসদের ৩৯৫ দিন ছিল সর্বোচ্চ কার্যদিবস।

সারণি-২: নবম জাতীয় সংসদের অধিবেশন ও কার্যদিবস

অধিবেশন	শুরু	শেষ	মোট দিন	কার্যদিবস
প্রথম	২৫-০১-০৯	০৭-০৪-০৯	৯২	৩৯
দ্বিতীয়	০৪-০৬-০৯	০৯-০৭-০৯	৩৬	২৫
তৃতীয়	০৭-০৯-০৯	০৫-১১-০৯	৬০	২২
চতুর্থ	০৪-০১-১০	০৫-০৪-১০	৯২	৩৯
পঞ্চম	০২-০৬-১০	২২-০৭-১০	৫১	৩৩
ষষ্ঠ	০২-০৯-১০	০৬-১০-১০	৩৫	১১
সপ্তম	০৫-১২-১০	০৯-১২-১০	৫	৫
অষ্টম	২৫-০১-১১	২৪-০৩-১১	৫৮	৩৩
নবম	২২-০৫-১১	০৭-০৭-১১	৪৬	৩০
দশম	১৮-০৮-১১	২৫-০৮-১১	৮	৪
একাদশ	২০-১০-১১	৩০-১১-১১	৪১	১৩
দ্বাদশ	২৫-০১-১২	২৯-০৩-১২	৬৩	৩৪
ত্রয়োদশ	২৭-০৫-১২	০৮-০৭-১২	৪৩	২৯
চতুর্দশ	০৪-০৯-১২	১৯-০৯-১২	১৬	১০
পঞ্চদশ	১৪-১১-১২	২৯-১১-১২	১৬	১০
ষষ্ঠদশ	২৭-০১-১৩	০৬-০৩-১৩	৩৯	২৫
সপ্তদশ	২১-০৪-১৩	৩০-০৪-১৩	৮	৮
অষ্টাদশ	০৩-০৬-১৩	১৬-০৭-১৩	৪৪	২৪
উনবিংশ	১২-০৯-১৩	২০-১১-১৩	৬৯	২৪
মোট				৪১৮

উৎস: গবেষক কর্তৃক জাতীয় সংসদ থেকে সংগৃহীত তথ্য সারণিকৃত।

৫. স্পীকার

নবম জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশনের প্রথম দিনেই অ্যাডভোকেট আবদুল হামিদ স্পীকার এবং কর্নেল (অব.) শওকত আলী ডেপুটি স্পীকার নির্বাচিত হন। কিন্তু রাষ্ট্রপতি মো. জিল্লুর রহমানের মৃত্যুর পর আবদুল হামিদ দেশের রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হলে ড. শিরিন শারমিন চৌধুরী নবম জাতীয় সংসদের স্পীকার হন। ২০১৩ সালের ৩০ এপ্রিলের বৈঠকে তিনি বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় স্পীকার নির্বাচিত হন। সংরক্ষিত আসন থেকে নির্বাচিত এবং অপেক্ষাকৃত অনভিজ্ঞ একজন সাংসদের স্পীকার হওয়ায় অনেকে বিস্মিত হন। বিরোধী দল ড. শিরিনের স্পীকার নির্বাচন নিয়ে কোনো প্রতিক্রিয়া জানায়নি। তবে সরকারী দলের 'কেউ খুশি নন'[৫] বলে সংবাদপত্রে খবর প্রকাশিত হয়। ড. শিরিনের স্পীকার নির্বাচিত

হওয়ায় কয়েকটি রেকর্ড হয়। প্রথমত, একজন নারী প্রথম বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের স্পীকার হন; দ্বিতীয়ত, সংরক্ষিত আসন থেকে নির্বাচিত একজন সদস্য স্পীকার হন; তৃতীয়ত, প্রথম বার জাতীয় সংসদে এসেই একজন সদস্য স্পীকার হন; এবং চতুর্থত, এখন পর্যন্ত তিনিই সর্বকনিষ্ঠ স্পীকার।[৬] সংরক্ষিত আসন থেকে নির্বাচিত একজন সদস্যকে স্পীকার করার সিদ্ধান্তকে কেউ কেউ 'সংসদীয় ঐতিহ্য শুধু নয়, বাংলাদেশ সংবিধানেরও চেতনাবিরুদ্ধ'[৭] বলে মন্তব্য করেন। তবে সরকার ও প্রধানমন্ত্রীর পক্ষ থেকে ড. শিরিন শারমিন চৌধুরীর স্পীকার নির্বাচিত হওয়াকে নারীর ক্ষমতায়নের জন্য 'ইতিহাস সৃষ্টি'[৮] বলে উল্লেখ করা হয়। স্পীকার নিজে তাঁর এই নির্বাচন বাংলাদেশে নারীর ক্ষমতায়নে এক 'outstanding milestone' হিসেবে গণ্য হবে বলে মনে করেন।[৯]

বাংলাদেশে স্পীকার পদের প্রাতিষ্ঠানিক বিকাশ হয়নি। সকল সংসদেই স্পীকারের মর্যাদা, গাম্ভীর্য ও নিরপেক্ষতা নিয়ে প্রশ্ন ছিল। নবম জাতীয় সংসদেও এই ধারা অব্যাহত থেকেছে। বিরোধী দলের পক্ষ থেকে স্পীকারকে সরকারী দলের প্রতি 'অনুগত' এবং তাদের প্রতি 'অনুদার' বলে অভিযোগ করা হয়েছে। স্পীকার দলনিরপেক্ষ আচরণ করেননি বলেও অভিযুক্ত হয়েছেন। ২০১৩ সালের বাজেট অধিবেশনে সরকারী ও বিরোধী দলের সদস্যরা পদ্মা সেতু ও বিদ্যুৎ নিয়ে আলোচনার জন্য ঐকমত্যে পৌঁছেছিলেন। কিন্তু স্পীকার 'সময়ের অভাব' বলে আলোচনার সুযোগ দেননি। স্পীকারের এই সিদ্ধান্ত গ্রহণে প্রধানমন্ত্রীর ইঙ্গিত রয়েছে বলে বিরোধী দল অভিযোগ উত্থাপন করে।[১০] এভাবে স্পীকারের নিরপেক্ষতা এবং নির্বাহী বিভাগের ওপর নির্ভরতা নিয়ে প্রশ্ন উঠে। অন্যদিকে বিরোধী দলের কিছু সদস্য স্পীকার পদের গাম্ভীর্য ও মর্যাদা লঙ্ঘিত হয় এমন আচরণ ও উক্তিও করেছেন। পঞ্চম ও সপ্তম জাতীয় সংসদের স্পীকাররা কিছু রুলিং দেন যা সকল পক্ষের প্রশংসা পায় এবং সংসদীয় সংস্কৃতি বিনির্মাণে যুগান্তকারী বলে বিবেচিত হয়। পঞ্চম জাতীয় সংসদে বিরোধী দল উত্থাপিত অনাস্থা প্রস্তাব আলোচনার সুযোগ দিয়ে শেখ রাজ্জাক আলী এবং সপ্তম জাতীয় সংসদে বঙ্গবন্ধুর সাংবিধানিক স্বীকৃতি বিষয়ে হুমায়ুন রশীদ চৌধুরীর দেওয়া রুলিং-এর কথা এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে।[১১] নবম জাতীয় সংসদের স্পীকার সম্পর্কে হাইকোর্টের একজন বিচারপতির করা মন্তব্যের পটভূমিতে সংসদ ও বিচার বিভাগের মধ্যে তিক্ততা সৃষ্টির[১২] আশঙ্কা দেখা দেয়। এই পটভূমিতে স্পীকার আবদুল হামিদ যে রুলিং দেন তাও গৃহীত ও প্রশংসিত হয়। নবম সংসদের স্পীকার আবদুল হামিদ নিজেকে দেশের একমাত্র নিরপেক্ষ স্পীকার বলে দাবি করেন। তাঁর ভাষায়: 'Since independence, I'm the only Speaker to have maintained neutrality. Even many developed-democratic countries do not have the example I set by showing patience.'[১৩] নবম জাতীয় সংসদে আবদুল হামিদ স্পীকার হিসেবে তাঁর অপেক্ষাকৃত নিরপেক্ষতা, রসালো মন্তব্যাদি (witty remarks) এবং সৎ রাজনীতিকের ইমেজ দিয়ে সরকারী ও বিরোধী উভয় পক্ষের সমর্থন ও সম্মান অর্জন করেন। তবে সামগ্রিকভাবে স্পীকার পদের প্রাতিষ্ঠানিকীকরণে নবম সংসদ আমলে তাৎপর্যপূর্ণ অগ্রগতি হয়েছে এটা বলা যায় না।

৬. বয়কট/বর্জন ও ওয়াকআউট

ওয়াকআউট ও বয়কট হলো এমন সংসদীয় উপায় (tool) যার মাধ্যমে সংসদ সদস্যরা তাঁদের প্রতিবাদ ও ভিন্নমত প্রকাশ করে থাকেন। সাধারণ অর্থে ওয়াকআউট হল 'coming out'. পার্লামেন্টারি পরিভাষায় ওয়াকআউট অর্থ 'সংসদ কক্ষ থেকে বের হয়ে আসা'। ওয়াকআউট প্রতিবাদের উপায় হলেও এটি খুব কাঙ্ক্ষিত নয়। এজন্যই বলা হয়, ওয়াকআউট প্রতিবাদের উপায় কিন্তু 'unbecoming way of making protest'.[১৪] বয়কট শব্দের উদ্ভব ঘটে ব্রিটিশ ভূমি-এজেন্ট চার্লস কানিংহাম বয়কট-এর নাম থেকে।[১৫] সংসদীয় ভাষায় বয়কট অর্থ সংসদের কার্যক্রমে অংশগ্রহণ থেকে বিরত থাকা। বয়কটও প্রতিবাদের কৌশল। তবে ওয়াকআউট ও বয়কট-এর মতো প্রতিবাদী কৌশলের ঘন ঘন প্রয়োগ পার্লামেন্টের স্বাভাবিক কর্মপ্রক্রিয়ার জন্য ক্ষতিকর।

বাংলাদেশে বিরোধী দলের মাত্রাতিরিক্ত ওয়াকআউট ও সংসদ বর্জন সংসদীয় রাজনীতির এক বিতর্কিত বৈশিষ্ট্যে পরিণত হয়েছে। পঞ্চম, সপ্তম এবং অষ্টম জাতীয় সংসদে বিরোধীদলগুলো অসংখ্যবার সংসদ কক্ষ থেকে ওয়াকআউট করেছে। এই ধারাবাহিকতা নবমসংসদেও অব্যাহত থেকেছে। এই জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশনের প্রথম দিনই বিরোধী দল ওয়াকআউট করে। নবম জাতীয় সংসদে বিরোধী দল কেবল ৬টি অধিবেশনে অংশ নিয়েছে (সারণি-৫ দ্র.)। এই ৬টি অধিবেশনে বিরোধী দল মাত্র ৭৬ দিন সংসদে উপস্থিত ছিল। বিরোধী দলের নেতা ১০টি কার্যদিবসে অংশ নেন। এই ৭৬ দিনে বিরোধী দলের সদস্যরা ৩০ বার (সারণি-৪ দ্র.) অধিবেশন কক্ষ থেকে ওয়াকআউট করেছেন। ওয়াকআউটের কারণ বিশ্লেষণ করলে কিছু প্রবণতা চিহ্নিত করা যায়। বিভিন্ন সময়ে স্পীকারের দেওয়া সিদ্ধান্ত/ রুলিং-এর প্রতিবাদে ওয়াকআউট করা হয়েছে। সমসাময়িক রাজনৈতিক বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনার সুযোগ না-পেয়ে বা পর্যাপ্ত সময় না-পেয়ে বা 'চাহিবা মাত্র' সুযোগ/সময় না-পেয়ে ওয়াকআউট হয়েছে। সবচেয়ে বেশি ওয়াকআউট করা হয়েছে প্রয়াত ও বর্তমান রাজনৈতিক নেতাদের নিয়ে অসংসদীয় ও অশালীন ভাষা প্রয়োগের পটভূমিতে। সংসদীয় রীতিনীতি এবং সংসদীয় সুবিধা বা অধিকার প্রতিষ্ঠার চেয়ে তিক্ত দলীয় রাজনীতি সদস্যদের ওয়াকআউটে বেশি প্ররোচিত করেছে।

সারণি-৩: বিরোধী দলের অধিবেশন বর্জন : পঞ্চম, সপ্তম, অষ্টম ও নবম সংসদ

সংসদ	মোট কার্যদিবস	বিরোধী দলের বর্জন	শতকরা হার
পঞ্চম	৩৯৫	১৩৫	৩৪.১৮
সপ্তম	৩৮৩	১৬৩	৪২.৫৬
অষ্টম	৩৭৩	২২৩	৫৯.৭৮
নবম	৪১৮	৩৪২	৮১.৮১

উৎস : গবেষক কর্তৃক সারণিকৃত।

১৯৯১ সালের পর গঠিত প্রতিটি সংসদে বিরোধী দলের সদস্যদের সংসদীয় বৈঠক বর্জনের প্রবণতা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পেয়েছে। পঞ্চম জাতীয় সংসদে বিরোধী দল আওয়ামী লীগ ও অন্য

শরিক দলগুলো মোট কার্যদিবসের ৩৪.১৮ শতাংশ বর্জন করে। সপ্তম জাতীয় সংসদে বিএনপি-র নেতৃত্বাধীন বিরোধী দলগুলো সংসদের মোট বৈঠকের ৪২.৫৬ শতাংশ বর্জন করে। অষ্টম জাতীয় সংসদের বিরোধী দল আওয়ামী লীগ মোট কার্যদিবসের ৫৯.৭৮ শতাংশে অংশগ্রহণ থেকে বিরত থাকে। জাতীয় সংসদ বর্জনের অতীতের সকল রেকর্ড অতিক্রম করা হয় নবম সংসদে। এই সংসদের প্রধান বিরোধী দল বিএনপি-র নেতৃত্বে চার দলীয় জোট ৪১৮ কার্যদিবসের মাত্র ৭৬টিতে অংশ নেয়। বর্জন করে ৮১.৮১ শতাংশ কার্যদিবস। এই জাতীয় সংসদের মোট ১৯টি অধিবেশনের মাত্র ৬টিতে বিরোধী দলের সদস্যরা অংশ নেন। বাকি ১৩টি অধিবেশনে বিরোধী দলের কোনো সদস্য একদিনের জন্যও অংশগ্রহণ করেননি। প্রথম অধিবেশনের মোট ২৩টি কার্যদিবসে বিরোধী দল অংশ নেয়। দ্বিতীয় ও তৃতীয় অধিবেশন সম্পূর্ণ বর্জন করে চতুর্থ অধিবেশনে যোগ দেয়। এই অধিবেশনের ৯২ কার্যদিবসের ২১টিতে তারা উপস্থিত থেকে আবার সংসদ বর্জন শুরু করেন। পঞ্চম অধিবেশনে মাত্র ১ দিনের জন্য, ২রা জুন ২০১০, সংসদে অংশ নিয়ে বিরোধী দল আবার দীর্ঘদিনের জন্য বর্জন আরম্ভ করে। এক নাগাড়ে দুটি অধিবেশনে, ষষ্ঠ ও সপ্তম, অংশ নেওয়া থেকে বিরত থেকে ৭৪ কার্যদিবস পর ১৫ই মার্চ ২০১১ সালে বিরোধী দল অষ্টম অধিবেশনে অংশ নেয়। মাত্র ৪ কার্যদিবস উপস্থিত থেকে এই অধিবেশনের শেষদিন ওয়াকআউট করে। এরপর বিরোধী দলীয় সদস্যরা ধারাবাহিকভাবে ৩টি অধিবেশন, নবম থেকে একাদশ, সম্পূর্ণ বর্জন করে ৭৭ কার্যদিবস পর ১৮ই মার্চ ২০১২ সালে দ্বাদশ অধিবেশনে যোগ দেন। ২০শে মার্চ বিরোধী দলীয় নেত্রী খালেদা জিয়া সংসদে ১ ঘণ্টা ৫৭ মিনিটের দীর্ঘ ভাষণ দেন।[১৬] এই অধিবেশনে মাত্র ৩দিন উপস্থিত থেকে বিরোধী দল আবার সংসদীয় অধিবেশনে অংশগ্রহণ থেকে বিরত থাকা আরম্ভ করে। এই পর্যায়ে এক নাগাড়ে পাঁচটি অধিবেশন, ত্রয়োদশ থেকে সপ্তদশ, বর্জন করে। বিরোধী দল একাধারে ৮৩ দিন অনুপস্থিত থেকে ৩রা জুন ২০১৩ অষ্টাদশ অধিবেশনে যোগ দেয়। এই অধিবেশনের ২৪ কার্যদিবসেই বিরোধী দল উপস্থিত ছিল। তবে নবম জাতীয় সংসদের সর্বশেষ ও ঊনিশতম অধিবেশন বিরোধী দল সম্পূর্ণভাবে বর্জন করে।

সারণি-৪ : নবম জাতীয় সংসদে বিরোধী দলের ওয়াকআউট

ক্র.	অধিবেশন	তারিখ	কারণ
	প্রথম		
১		২৫-০১-২০০৯	রাষ্ট্রপতি ইয়াজুদ্দিন আহমেদ শপথ ভঙ্গ করে ৯০ দিনের মধ্যে নির্বাচন দেননি, এই অভিযোগ তুলে বিরোধী দল বিএনপি রাষ্ট্রপতির ভাষণ বর্জন এবং সংসদ কক্ষ থেকে ওয়াকআউট করে।
২		২৮-০১-২০০৯	বিরোধীদলীয় সিনিয়র সদস্যদের জন্য প্রথম সারিতে নতুন আসন বিন্যাসের প্রতিবাদে বিরোধীদল ওয়াকআউট করে।[১৭]
৩		২৪-০২-২০০৯ (১ম বার)	বিল উত্থাপনের পর সংশোধনীর নোটিশ প্রদানের সুযোগ না-দেওয়া সম্পর্কে স্পীকারের ব্যাখ্যার প্রতিবাদে।

৪		২৪-০২-২০০৯ (২য় বার)	স্পীকার কর্তৃক কার্যপ্রণালী বিধির কিছু বিধান স্থগিত করার প্রতিবাদে বিরোধী দলের সদস্যরা ওয়াকআউট করেন।
৫		০৩-০৩-২০০৯	বিডিআর সদর দপ্তরে সেনা কর্মকর্তাদের হত্যার বিষয়ে সংসদীয় তদন্ত কমিটি না-হওয়ার প্রতিবাদে।
৬		১৬-০৩-২০০৯	চট্টগ্রাম আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরে জিয়াউর রহমানের ম্যুরাল অপসারণ বিষয়ে স্পীকারের রুলিং না-পাওয়ার প্রতিবাদে বিরোধী দলীয় সদস্যরা ওয়াকআউট করেন।
৭		২৯-০৩-২০০৯	মুক্তিযুদ্ধে জিয়াউর রহমানের ভূমিকা নিয়ে সরকার দলীয় একজন সদস্যের সমালোচনামূলক বক্তব্যের প্রতিবাদে।
	চতুর্থ		
৮		১১-২-২০১০	রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে সংঘটিত সন্ত্রাসী ঘটনা নিয়ে সংসদে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর দেওয়া বক্তব্যের প্রতিবাদে।[১৮]
৯		১৪-০২-২০১০	সাবেক রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের মরদেহ নিয়ে সরকার দলীয় একজন সদস্যের দেওয়া বক্তব্যের প্রতিবাদে।
১০		১৫-০২-২০১০ (১ম বার)	অধিবেশনের শুরুতেই বিএনপি-র সাংসদ মওদুদ আহমেদকে কথা বলার সুযোগ না-দেওয়ায়।
১১		১৫-০২-২০১০ (২য় বার)	সরকার দলীয় একজন সদস্য বিরোধীদলীয় নেত্রীর পোশাক-পরিচ্ছদ ও দায়িত্ববোধ নিয়ে প্রশ্ন তুললে বিরোধীদলের সদস্যরা ওয়াকআউট করেন।
১২		১৬-০২-২০১০ (১ম বার)	জিয়া আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরের নাম পরিবর্তনের প্রতিবাদে।
১৩		১৬-২-২০১০ (২য় বার)	সরকার দলের একজন সাংসদ বিএনপি-র সিনিয়র ভাইস-চেয়ারম্যান তারেক রহমানকে 'মহাচোর' আখ্যা দেওয়ায়।
১৪		০১-০৩-২০১০	সরকার দলীয় একজন সিনিয়র সদস্য বিএনপি ও জামায়াত-ই-ইসলামীকে সন্ত্রাসবাদের মদদদাতা উল্লেখ করে বক্তব্য দিলে এর প্রতিবাদে বিরোধী দল ওয়াকআউট করে।
১৫		০২-০৩-২০১০	সাবেক রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানকে 'খুনি' এবং পাকিস্তানি গোয়েন্দা সংস্থা আইএসআই-এর 'এজেন্ট' বলার প্রতিবাদে।
১৬		০৩-০৩-২০১০	অধিবেশন কক্ষে সৃষ্ট মারাত্মক এক অচলাবস্থার[১৯] পর বিরোধী দলীয় চিফ হুইপকে ফ্লোর না-দেওয়ার প্রতিবাদে।
১৭		০৯-০৩-২০১০	বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয় থেকে জিয়াউর রহমানের নাম বাদ দেওয়ার প্রস্তাবের প্রতিবাদে।
১৮		১০-০৩-২০১০ (১ম বার)	জিয়াউর রহমানের লাশ সম্পর্কে নৌ-পরিবহণ মন্ত্রীর দেওয়া বক্তব্যের প্রতিবাদে।
১৯		১০-০৩-২০১০ (২য় বার)	'১৯৭৫ সালে বঙ্গবন্ধুকে হত্যার পর যিনি সেনাশাসক হয়েছিলেন তাঁর কথা তারা [বিএনপি-র সদস্যরা] কীভাবে বলবে',[২০] সরকার দলীয় একজন সিনিয়র সদস্য এ-কথা বলায় বিরোধী দল ওয়াকআউট করে।
২০		০৪-০৪-২০১০	সাংসদদের বেতন-ভাতা বাড়ানোর বিল প্রত্যাহার না-করার প্রতিবাদে।
	পঞ্চম		
২১		০২-০৬-২০১০ (১ম বার)	অধিবেশন শুরুর দুই মিনিটের মধ্যে ফ্লোর না-পেয়ে (দুই ঘণ্টা পরে বিরোধী দল ফিরে আসে)।

২২		০২-০৬-২০১০ (২য় বার)	দৈনিক *আমার দেশ*-এর ডিক্লারেশন বাতিল এবং পত্রিকার সম্পাদককে গ্রেফতারের প্রতিবাদে।
	অষ্টম		
২৩		১৫-০৩-২০১১	বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ডে জিয়াউর রহমান জড়িত, একজন মন্ত্রীর এই বক্তব্যের প্রতিবাদে।
২৪		২৪-০৩-২০১১	রাষ্ট্রপতির ভাষণের উপর আনীত ধন্যবাদ প্রস্তাবের সংশোধনীগুলোকে পৃথকভাবে ভোটে না-দেওয়ার প্রতিবাদে।
	অষ্টাদশ		
২৫		০৩-০৬-২০১৩	সভা-সমাবেশের উপর সরকারের নিষেধাজ্ঞার প্রতিবাদে।
২৬		১৭-০৬-২০১৩	সরকার দলীয় একজন সদস্য বিরোধী দলীয় নেতা সম্পর্কে কটূক্তি করায় বিরোধী দলের সদস্যরা ওয়াকআউট করেন।
২৭		২৩-০৬-২০১৩	সরকার দলীয় একজন সদস্য 'অশালীন' বক্তব্য দিলে এর প্রতিবাদে বিরোধী দলের সদস্যরা ওয়াকআউট করেন।
২৮		২৩-০৬-২০১৩	'অশালীন ও অসংসদীয় ভাষা ব্যবহার করে সংসদের মর্যাদা ক্ষুণ্ন করার' প্রতিবাদে সরকার দলের একজন সদস্য[২১] ওয়াকআউট করেন।
২৯		২৬-০৬-২০১৩	'লন্ডনের এক পানশালায় মাফিয়া ডন দাউদ ইব্রাহিমের এক সহযোগীর সঙ্গে তারেক রহমানকে দেখা গেছে' বলে সরকার দলীয় একজন সদস্য বক্তব্য দিলে বিরোধীদল ওয়াকআউট করে।
৩০		৩০-০৬-২০১৩	ছাটাই প্রস্তাবের উপর আলোচনার জন্য স্পীকার পর্যাপ্ত সময় না-দেওয়ায় বিরোধী দল ওয়াকআউট করে।

উৎস : প্রধানত সংবাদপত্র থেকে প্রাপ্ততথ্য গবেষক কর্তৃক সারণিকৃত

লক্ষণীয় বিষয় হলো, দীর্ঘদিন অনুপস্থিত থেকে বিরোধী দলীয় সদস্যরা অধিবেশনে ফিরেছেন কেবল তাদের সদস্যতা অক্ষুণ্ন রাখার জন্য। সংবিধানের ৬৭ (১) (খ) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী একজন সদস্য এক নাগাড়ে ৯০ কার্যদিবসের বেশি অনুপস্থিত থাকতে পারেন না।[২২] দীর্ঘদিন বর্জন করে বিরোধীদল তিনবার সংসদে ফিরেছে কেবল সদস্যপদ রক্ষার সাংবিধানিক এই শর্ত পূরণ করার জন্য। যে ১৩টি অধিবেশন বিরোধী দল সম্পূর্ণভাবে বর্জন করে সেগুলিতে মোট ১৫৯টি আইন পাস হয়েছে। পঞ্চম অধিবেশনে বিরোধী দল মাত্র একদিনের জন্য অংশ নিয়েছিল। এই অধিবেশনে ২৪টি আইন পাস হয়েছে। তার মানে নবম জাতীয় সংসদে পাসকৃত একটি সংবিধান সংশোধনীসহ মোট ২৭১টি আইনের ১৮৩টিতে বিরোধীদল কোনো অবদানই রাখেনি। নবম জাতীয় সংসদে পাঁচটি বাজেট পাস হয়। কেবল ২০১৩ সালের বাজেট অধিবেশনে বিরোধী দল সংসদে উপস্থিত ছিল। কার্যত সকল রাষ্ট্রীয় বাজেটই অনুমোদিত হয়েছে বিরোধীদলের কোনো অবদান ছাড়া। বিরোধী দলের সদস্যরা সংসদ বর্জন করলেও নিয়ম অনুযায়ী বেতন ভাতাসহ সকল সুবিধা ভোগ করেছেন। সংসদ অকার্যকর থেকেছে অথচ সংসদ সদস্যদের দেওয়া সুবিধাদির ব্যয় রাষ্ট্রীয় কোষাগার থেকে পরিশোধিত হয়েছে। সারণি-৩ থেকে দেখা যায় পঞ্চম, সপ্তম, অষ্টম ও নবম সংসদে ক্রমান্বয়ে বিরোধী দলের সংসদ বর্জন বেড়েছে। পঞ্চম সংসদে বিরোধী দল (আওয়ামী লীগ ও মিত্র দলগুলো) ৩৪.১৮ শতাংশ, সপ্তম সংসদে বিরোধী দল (বিএনপি ও

শরিক দলগুলো) ৪২.৫৬ শতাংশ, অষ্টম সংসদে বিরোধী দল (আওয়ামী লীগ ও মিত্র দলগুলো) ৫৯.৭৮ এবং নবম সংসদে বিরোধী দল (বিএনপি ও চার দলীয় জোট) ৮১.৮১ শতাংশ কার্যদিবস বর্জন করে। সংসদ বর্জনের মাধ্যমে বিভিন্ন সময়ে আওয়ামী লীগ ও বিএনপি জাতির সঙ্গে প্রতারণা করেছে (had cheated the nation)[২৩] বলেও কেউ কেউ মন্তব্য করেছেন। এক হিসাবে দেখা গেছে, নবম জাতীয় সংসদের বিরোধী দলের সদস্যরা ২০১২ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত বেতন বাবদ ১৬ কোটি টাকা গ্রহণ করেছেন।[২৪] অন্য একটি হিসাব অনুযায়ী নবম জাতীয় সংসদের সরকারী ও বিরোধী দলীয় ৩১৫ জন সদস্যের কেবল গাড়ি আমদানি বাবদ ১০০০ (এক হাজার) কোটি টাকার কর থেকে সরকার বঞ্চিত হয়েছে।[২৫] ফলে সংসদ বর্জনের নেতিবাচক প্রভাব রোধে বর্জন নিষিদ্ধ করে আইন প্রণয়নের দাবি করা হয়েছে নাগরিক সমাজের পক্ষ থেকে।[২৬]

সারণি-৫ : নবম জাতীয় সংসদের কার্যদিবস, বিরোধী দলের উপস্থিতি ও পাসকৃত আইন

অধিবেশন	শুরু	শেষ	মোট দিন	কার্যদিবস	বিরোধী দলের উপস্থিতি	পাসকৃত আইন
প্রথম	২৫-০১-০৯	০৭-০৪-০৯	৯২	৩৯	উপস্থিত ২৩ দিন	৩২
দ্বিতীয়	০৪-০৬-০৯	০৯-০৭-০৯	৩৬	২৫	অনুপস্থিত	২৩
তৃতীয়	০৭-০৯-০৯	০৫-১১-০৯	৬০	২২	অনুপস্থিত	১১
চতুর্থ	০৪-০১-১০	০৫-০৪-১০	৯২	৩৯	উপস্থিত ২১ দিন	২৩
পঞ্চম	০২-০৬-১০	২২-০৭-১০	৫১	৩৩	১ দিন (২-৬-১০)	২৪
ষষ্ঠ	০২-০৯-১০	০৬-১০-১০	৩৫	১১	অনুপস্থিত	১৩
সপ্তম	০৫-১২-১০	০৯-১২-১০	৫	৫	অনুপস্থিত	৪
অষ্টম	২৫-০১-১১	২৪-০৩-১১	৫৮	৩৩	উপস্থিত, ৪ দিন (১৫-৩-১১ থেকে)	৬
নবম	২২-০৫-১১	০৭-০৭-১১	৪৬	৩০	অনুপস্থিত	৮
দশম	১৮-০৮-১১	২৫-০৮-১১	৮	৪	অনুপস্থিত	২
একাদশ	২০-১০-১১	৩০-১১-১১	৪১	১৩	অনুপস্থিত	৭
দ্বাদশ	২৫-০১-১২	২৯-০৩-১২	৬৩	৩৪	উপস্থিত, ৩ দিন (১৮-০৩-১২ থেকে)	৫
ত্রয়োদশ	২৭-০৫-১২	০৮-০৭-১২	৪৩	২৯	অনুপস্থিত	১৫
চতুর্দশ	০৪-০৯-১২	১৯-০৯-১২	১৬	১০	অনুপস্থিত	১৩

পঞ্চদশ	১৪-১১-১২	২৯-১১-১২	১৬	১০	অনুপস্থিত	৬
ষষ্ঠদশ	২৭-০১-১৩	০৬-০৩-১৩	৩৯	২৫	অনুপস্থিত	১৩
সপ্তদশ	২১-০৪-১৩	৩০-০৪-১৩	৮	৮	অনুপস্থিত	৭
অষ্টাদশ	০৩-০৬-১৩	১৬-০৭-১৩	৪৪	২৪	উপস্থিত ২৪ দিন	১২
উনবিংশ	১২-০৯-১৩	২০-১১-১৩	৬৯	২৪	অনুপস্থিত	৩৭
মোট				৪১৮	৭৬	২৭১

উৎস : গবেষক কর্তৃক সারণিকৃত

৭. অসংসদীয় আচরণ

অসংসদীয় আচরণ (un-parliamentary behaviour) বলতে সংসদ সদস্যদের সেসব আচরণ, বক্তব্যকে বোঝায় যা সংসদীয় রীতিনীতি ও সৌজন্যের পরিপন্থি।[২৭] নবম জাতীয় সংসদের যে পাঁচটি অধিবেশনে বিরোধী দল অংশ নেয় সেগুলোর প্রতিটি আলোচিত হয়েছে যতটা ইতিবাচক কারণে তারচেয়ে বেশি উভয় পক্ষের সদস্যদের অসংসদীয় আচরণ এবং দুই পক্ষের মধ্যে অশালীন বাক্য বিনিময়ের জন্য। বাংলাদেশের প্রায় প্রতিটি জাতীয় সংসদেই সরকারী ও বিরোধী দলীয় সদস্যরা অসংসদীয় আচরণের দৃষ্টান্ত তৈরি করেছেন। তবে নবম জাতীয় সংসদে এক্ষেত্রের সকল অতীত রেকর্ড অতিক্রম করা হয়েছে। এক পক্ষের কিছু সদস্য অন্য পক্ষের কিছু সদস্যকে অসৌজন্যমূলক ও অশ্লীল ভাষায় আক্রমণ করেছেন। বর্তমান ও প্রয়াত নেতাদের নিয়ে কটূক্তি করা হয়েছে। জাতীয় সংসদ কক্ষের মধ্যে একে অন্যকে শারীরিকভাবে আক্রমণের চেষ্টা করেছেন। এমনকি স্পীকারকে লক্ষ্য করেও গালিবর্ষণ করা হয়েছে। নবম জাতীয় সংসদে অসৌজন্যমূলক আচরণে দৃষ্টিকটূভাবে বিশেষভাবে আগ্রহী ছিলেন সংরক্ষিত আসন থেকে নির্বাচিত উভয় পক্ষের নারী সদস্যরা। এর ফলে নারী সদস্যদের দায়িত্ব ও সম্ভ্রমবোধ এবং সামগ্রিকভাবে নারীর সামাজিক ও রাজনৈতিক নেতৃত্ব সম্পর্কে প্রশ্নের উদ্রেক হয়েছে। জাতীয় সংসদে নারী সদস্যদের অসৌজন্যমূলক ও অশালীন বাক্য বিনিময় সমাজের সংবেদনশীল মানুষকে ভয়ানকভাবে আহত করেছে। নারীর সংরক্ষিত আসন, নারী-নেতৃত্ব এবং নারীর ভাবমূর্তি সম্পর্কে নেতিবাচক ধারণার জন্ম দিয়েছে। একজন লেখক মন্তব্য:

> আমাদের নাগরিকদের উচিত, অবিলম্বে সংরক্ষিত নারী আসন বাতিলের দাবিতে আন্দোলন গড়ে তোলা। ক্রমবর্ধমান সংরক্ষিত নারী আসনের সদস্যদের যে ভূমিকা আমরা দেখছি, তাতে এই ব্যবস্থা অব্যাহত থাকলে গণতন্ত্র থাকবে না। ব্যক্তিগতভাবে নারী সাংসদদের সৌভাগ্যে আমরা ঈর্ষান্বিত নই। তাঁদের বাড়ি, গাড়ি, ধনসম্পদ, ব্যাংক-ব্যালেন্স বাড়ুক তা আমরা চাই। কিন্তু তাঁদের মুখের কারণে সংসদ কলুষিত হোক, জাতির মুখে চুনকালি পড়ুক, তা চাই না।...দুই পক্ষের মাননীয়দের [নারী সদস্যদের] গবেষণায় মুজিব-জিয়া, হাসিনা-খালেদার কী ক্ষতি হলো তা বড় ব্যাপার নয়; নারীর ক্ষমতায়ন ও নারী নেতৃত্ব সম্পর্কে মানুষের মনে ঘৃণার সৃষ্টি হলো, সংসদীয় গণতন্ত্র সম্পর্কে মানুষের মনে বিরূপতা দেখা দিল এবং সংরক্ষিত নারী আসনের ক্ষতিকর দিক সম্পর্কে মানুষ অবগত হলো। আর হলো বাঙালি নারীর মুখ সম্পর্কে জনগণের স্পষ্ট ধারণা।[২৮]

কিছু সদস্যের অসংসদীয় আচরণের জন্য পঞ্চম সংসদকে কেউ কেউ 'monkey-house' বলে উল্লেখ করেন। তখন এ-প্রশ্নও উঠে যে, 'Comparing our parliament to a monkey-house is very insulting to the monkeys.'[২৯] অসংসদীয় আচরণের ধারাবাহিকতা সপ্তম ও অষ্টম জাতীয় সংসদেও অব্যাহত থাকে। নবম জাতীয় সংসদে পরিস্থিতির আরও অবনতি ঘটে। সাংসদদের আশালীন ভাষা প্রয়োগকে বলা হচ্ছে 'ভাষা-সন্ত্রাস' এবং দুই পক্ষের মধ্যে ভাষা-সন্ত্রাসের বিনিময় পরিচিতি পাচ্ছে 'ক্রসফায়ার' হিসেবে। আর এই ক্রসফায়ারে দেশের গণতন্ত্র, সংসদ, ভাষা, সংস্কৃতি, রুচি বিনষ্ট হচ্ছে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করা হয়েছে। একজন বুদ্ধিজীবীর ভাষায়:

> ...এই ক্রসফায়ারে মারা পড়ছে আমাদের সংসদীয় গণতন্ত্র, সংসদের কার্যপ্রণালী বিধির ২৭০ ধারা, সংসদের কার্যপ্রণালি, সংসদীয় আচরণ; মারা পড়ছে আমাদের সংস্কৃতি, আমাদের ভাষা, রুচি, শিক্ষা এবং জাতি হিসেবে আমাদের গর্ব...আমাদের সংসদে কথার যে ক্রসফায়ার চলছে তা বন্ধ করতে হবে এবং বিশ্বাস করতে হবে অত্যন্ত শালীন ও মনোগ্রাহী ভাষায়, কৌতুক, আয়রনি ও বুদ্ধিদীপ্ত প্রকাশের মধ্য দিয়েও এই উদ্দেশ্য পূরণ করা যায়।[৩০]

অসংসদীয় আচরণের মাধ্যমে কিছু সাংসদ যেমন ব্যক্তিগত দায়িত্ব ও রুচিহীনতার পরিচয় দিয়েছেন তেমনি সামগ্রিকভাবে সংসদের মর্যাদা ও সম্মানের হানিও ঘটিয়েছেন। সবচেয়ে আশঙ্কাজনক অবস্থা হলো অনভিজ্ঞ ও তরুণ সদস্যরা অশালীন বাক্য বিনিময় করলেও অভিজ্ঞ ও সংসদের উভয় পক্ষের নেতৃত্বের পক্ষ থেকে তাদের নিবৃত করার চেষ্টা করা হয়নি। এমন কি কোনো কোনো ক্ষেত্রে টেবিল চাপড়িয়ে উৎসাহিত করা হয়েছে। ফলে, বাংলাদেশের সংসদীয় সংস্কৃতি বিকাশে রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের আন্তরিকতা ও যোগ্যতা নিয়ে প্রশ্নের জন্ম হয়েছে। তবে নবম জাতীয় সংসদে অসংসদীয় ও অশালীন শব্দের ব্যবহার রোধে বক্তব্য প্রদান এবং নতুন ধারণা প্রকাশ করতেও দেখা গেছে। সরকার দলীয় একজন সদস্য অষ্টাদশ অধিবেশনে অশালীন শব্দ বন্ধে সংশ্লিষ্ট সদস্যকে আর্থিক জরিমানা করার প্রস্তাব করেন। সরকারী ও বিরোধী দলীয় সদস্যরা টেবিল চাপড়িয়ে তার প্রস্তাবের প্রতি সমর্থন জানান। এই সদস্য একই অধিবেশনে অসংসদীয় আচরণ বন্ধে কার্যপ্রণালী বিধি সংশোধনের জন্য একটি নোটিশও দেন। সংশোধনীতে প্রতিটি অশালীন শব্দের জন্য ৩০ হাজার টাকা জরিমানা করার প্রস্তাব করা হয়। অবশ্য নোটিশটি শেষ পর্যন্ত প্রত্যাহার করা হয়।[৩১]

৮. পাসকৃত আইন

আইন প্রণয়ন জাতীয় সংসদের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ। উপর্যুক্ত সারণি ৪-এ নবম সংসদের উনিশটি অধিবেশনের কোনটিতে কতো আইন অনুমোদিত হয় তা দেখানো হয়েছে। পূর্ববর্তী সকল সংসদের তুলনায় নবম সংসদে সবচেয়ে বেশিসংখ্যক আইন পাস হয়েছে। পঞ্চম, সপ্তম ও অষ্টম জাতীয় সংসদে যথাক্রমে ১৭৩, ১৮৯ ও ১৮৫টি আইন পাস হয়। নবম জাতীয় সংসদ রেকর্ডসংখ্যক ২৭১টি আইন অনুমোদন করে। পাসকৃত বিলের ২৬৮টি সরকারী এবং মাত্র ৩টি বেসরকারী বিল।[৩২] এসব আইনের পর্যালোচনা থেকে

বিভিন্ন ধরনের বৈশিষ্ট্য ও প্রবণতা চিহ্নিত করা যায়। বিচিত্র বিষয়ে আইন প্রণয়ন করা হয়েছে। ২৭১টি আইনের ৩৮টি বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়, শিক্ষা ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে, ২০টি নির্দিষ্টকরণ ও অর্থ আইন সম্পর্কিত, ১৪টি প্রেসিডেন্ট, প্রধানমন্ত্রী, স্পীকার, ডেপুটি স্পীকার, মন্ত্রী, সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতি ও সাংসদদের বেতন ও সুবিধাদি সম্পর্কিত। এছাড়া, নির্বাচন, সন্ত্রাস বিরোধিতা, খাদ্য নিরাপত্তা, সার ব্যবস্থাপনা, স্থানীয় সরকার, মৎস ও পশু খাদ্য, তথ্য প্রযুক্তি, গ্যাস, পর্যটন, বালুমহাল, দেওয়াল লিখন, মানবপাচার প্রতিরোধ, পর্নোগ্রাফি নিয়ন্ত্রণ, ধূমপান নিয়ন্ত্রণ, চলচ্চিত্র, শিশুস্বার্থ, প্রতিবন্ধীদের অধিকার, ভোজ্যতেলে ভিটামিন ইত্যাদি এবং আরও অনেক বিষয়ে নতুন আইন প্রণয়ন ও পুরনো আইন সংশোধন করা হয়েছে।

নবম জাতীয় সংসদে পাসকৃত সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ, আলোচিত ও বিতর্কিত আইন হলো সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনী আইন। কেউ কেউ এই সংশোধনীকে 'বিদ্যমান সংশোধনীগুলোর মধ্যে সবচেয়ে খারাপ'[৩৩] বলে উল্লেখ করেছেন। এই সংশোধনী তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে জাতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠানের বিধান বিলুপ্ত করে। বিএনপি-র নেতৃত্বাধীন বিরোধী দলগুলো এই সংশোধনীর তীব্র বিরোধিতা করে। তত্ত্বাবধায়ক ব্যবস্থা ফিরিয়ে আনার জন্য বিরোধী দল আন্দোলন শুরু করে। এর ফলে সরকারী ও বিরোধী পক্ষের মধ্যে এক সাংঘর্ষিক ও রক্তাক্ত রাজনীতির সূত্রপাত হয়। তত্ত্বাবধায়ক ব্যবস্থার বিলোপন ছাড়া এই সংশোধনী সংবিধানের পঞ্চাশটিরও বেশি অনুচ্ছেদকে সংশোধনের অযোগ্য বলে ঘোষণা করে। অর্থাৎ, এসব অনুচ্ছেদ ভবিষ্যতের কোনো সংসদ কোনো দিন পরিবর্তন করতে পারবে না। এ-ধরনের সংশোধনী আগামী দিনের রাজনীতি ও সংসদের উপর নবম জাতীয় সংসদের এক ধরনের স্থায়ী হস্তক্ষেপ বলে চিহ্নিত করা যায়। এছাড়া গুরুত্বপূর্ণ ও আলোচিত অন্যান্য আইনের মধ্যে রয়েছে তথ্য অধিকার আইন ২০০৯, উপজেলা পরিষদ (রহিত আইন পুনঃপ্রচলন ও সংশোধন) আইন ২০০৯,[৩৪] পদ্মা বহুমুখী সেতু প্রকল্প (ভূমি অধিগ্রহণ) আইন ২০০৯, ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান আইন ২০১০, বর্ডার গার্ড আইন ২০১০, অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ (সংশোধন) আইন ২০১১, সন্ত্রাস বিরোধী (সংশোধন) আইন ২০১২, আন্তর্জাতিক অপরাধ (ট্রাইবুনাল) (সংশোধন) আইন ২০১৩, গ্রামীণ ব্যাংক আইন ২০১৩, নির্বাচন কমিশন সচিবালয় (সংশোধন) আইন ২০১৩, দুর্নীতি দমন কমিশন (সংশোধন) আইন ২০১৩ ইত্যাদি। তবে সংসদ সদস্যদের দলীয় শৃঙ্খল থেকে অধিকতর স্বাধীনতা দেওয়ার জন্য সংবিধানের ৭০ অনুচ্ছেদ সংশোধন, এক নাগাড়ে ৯০ কার্যদিবস সংসদের বৈঠক থেকে অনুপস্থিত থাকার বিধান পরিবর্তন এবং সদস্যদের আচরণ নিয়ন্ত্রণের জন্য সংবিধান সংশোধন, কার্যপ্রণালী বিধির পরিবর্তন ও আইন প্রণয়নের দাবি অনেক পুরনো হলেও এসব ক্ষেত্রে কোনো ব্যবস্থা নবম সংসদে নেওয়া হয়নি।

৯. সরকারের ওপর তদারকি

সংবিধান ও আইন অনুযায়ী সরকার পরিচালিত হচ্ছে কিনা তা দেখা পার্লামেন্টের একটি প্রধান কাজ। পার্লামেন্ট বিভিন্ন উপায়ে সরকারের কাজ তদারকি এবং সরকারকে নিয়ন্ত্রণ করে। সকল সংসদীয় ব্যবস্থায়ই সরকারী মৌলিক নীতিমালা চ্যালেঞ্জ করার, অর্থ ব্যয় সংক্রান্ত প্রস্তাব অনুমোদন এবং প্রয়োজনে সরকারের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব উত্থাপনের ক্ষমতা সংসদকে দেওয়া হয়েছে। বাংলাদেশের সংবিধান, আইন ও কার্যপ্রণালী বিধি জাতীয় সংসদকে যেসব উপায়ে সরকারী কাজ তদারকি করার সুযোগ দিয়েছে সেগুলো হলো: প্রশ্নোত্তর পর্ব, জনগুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আলোচনা, মুলতবি প্রস্তাব এবং দৃষ্টি আকর্ষণ, প্রধানমন্ত্রীর প্রতি প্রশ্ন, সংসদীয় কমিটিসমূহের তদারকি, সরকারের অর্থ ও অর্থসংক্রান্ত প্রস্তাব বিবেচনা এবং অনাস্থা প্রস্তাব।[৩৫] রকম্যান (Rockman) মনে করেন, তদারকির এসব উপায় প্রয়োগ করার লক্ষ্য হলো:

> ... to check against dishonesty and waste; to guard against harsh and callous (e.g., arbitrary and unresponsive) administration; to evaluate implementation in accordance with legislative objectives and to ensure administrative compliance with statutory intent.[৩৬]

বাংলাদেশের সকল সংসদের সামনেই নির্বাহী বিভাগের কার্যক্রম তদারকি করা ছিল একটি কঠিন চ্যালেঞ্জ এবং নবম জাতীয় সংসদও এক্ষেত্রে ব্যতিক্রম নয়। এই সংসদের প্রথম অধিবেশনেই ৪৮টি স্থায়ী কমিটি গঠন করা হয়। প্রথম অধিবেশনেই এতগুলো কমিটি করতে পারা সংসদের একটি সাফল্য হিসেবে প্রশংসা অর্জন করে। সংসদের স্থায়ী কমিটির ৬টির প্রধান করা হয় আওয়ামী লীগের বাইরের ৪টি দল থেকে। প্রধান বিরোধী দল বিএনপি ২টি, জাতীয় পার্টি ২টি, জাসদ ও ওয়ার্কার্স পার্টি ১টি করে সভাপতির পদ পায়।[৩৭] নবম সংসদে ১৮২টি উপকমিটিও গঠন করা হয়। কমিটিগুলো ২,০৪৩টি এবং উপকমিটিগুলো ৬৫০টি সভা করে। সকল কমিটি মোট ১০১টি রিপোর্ট সংসদে জমা দেয়।[৩৮]

প্রধানমন্ত্রী ও মন্ত্রীদের প্রতি প্রশ্ন উত্থাপন এবং এসব প্রশ্নের উত্তর পাওয়া জাতীয় সংসদের কাছে নির্বাহী বিভাগের জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠার এক গুরুত্বপূর্ণ ও আকর্ষণীয় উপায়। সারণি-৬ থেকে দেখা যায় যে, এই সংসদের ১৯টি অধিবেশনে সরকারী ও বিরোধী দলের সদস্যরা প্রধানমন্ত্রীর কাছে প্রশ্ন উত্থাপনের জন্য মোট ৩,৪৯৩টি নোটিশ দিয়েছেন। এগুলোর মধ্যে ৯৬৪টি গৃহীত হয়েছে এবং প্রধানমন্ত্রী ৭৯৩টির উত্তর দিয়েছেন। মন্ত্রীদের কাছে ৪৬,৫২৫টি তারকাচিহ্নিত প্রশ্নের[৩৯] নোটিশ জমা পড়ে, ২৮,২৪০টি গৃহীত হয় এবং ২৩,৩৬৬টির উত্তর দেওয়া হয়। একইভাবে মন্ত্রীদের প্রতি ১৩,৬২৬টি তারকাচিহ্নবিহীন প্রশ্নের নোটিশ দেওয়া হয়। ১০,৪০৩টি গৃহীত হয় এবং মন্ত্রীরা ৯,০০৩টির উত্তর দেন।

সারণি-৬: নবম জাতীয় সংসদের বিভিন্ন অধিবেশনে প্রধানমন্ত্রী ও অন্য মন্ত্রীদের প্রতি উত্থাপিত প্রশ্ন ও উত্তর

অধিবেশন	প্রধানমন্ত্রীর প্রতি প্রশ্ন			মন্ত্রীদের প্রতি প্রশ্ন ও উত্তর					
	নোটিশ	গৃহীত নোটিশ	উত্তর	তারকাচিহ্নিত প্রশ্ন			তারকাচিহ্নবিহীন প্রশ্ন		
				প্রাপ্ত নোটিশ	গৃহীত নোটিশ	উত্তর	প্রাপ্ত নোটিশ	গৃহীত নোটিশ	উত্তর
প্রথম	৩৩৬	৬৬	৬৬	৩১০৫	১৬৬৮	১৫৫৬	৯৭৮	৬৬১	৬৩৬
দ্বিতীয়	৩২৭	৩২	৩২	৩৭৫৪	২১২৮	১৭৯১	৬৫১	৫৩৫	৪৫৯
তৃতীয়	২৩৪	১৯৬	২৫	২৮০৫	১১৯৪	১১১৬	৬৭৪	৪৪৭	৪২০
চতুর্থ	২৯৪	৩৫	৩৫	৪২৫৩	২৭৮৪	২৩১৮	৭৬৭	৬৫৪	৫৬৭
পঞ্চম	২৩০	৪৪	৪৪	৩২৬৪	২১০৪	১৭১৩	৮৫০	৭৩৮	৬৫৯
ষষ্ঠ	১৬০	০৭	০৭	২০৪৭	৭৬৮	৫৯৯	৩৪২	১৮৬	১৪৫
সপ্তম	১০৭	১৮	১৮	১২০০	৩১১	২৭৮	৪০১	১৫৭	১৪৭
অষ্টম	২৪৬	৮৩	৮৩	৩৮৬৮	২৪৫৮	২৩৪৫	১২৭০	৯৫০	৯০১
নবম	২২৮	৫৪	৫৪	২৯৯১	২১১৫	১৫৯১	৯৩৫	৭০৯	৫৫৩
দশম	৫৪	০৬	০৬	৫২২	১৭৮	১৩০	১৪৮	৫০	৪০
একাদশ	১৪২	৪৭	৪৭	১৮০৪	৮৯৩	৭৩৯	৫৩৯	৪১০	৩৪৫
দ্বাদশ	২১৭	৭৭	৭৭	৩২৪৩	২৫৭০	২০২৮	৭১২	৬৭৩	৫৯৮
ত্রয়োদশ	১৮১	৬০	৬০	২৭৫৬	২০৬৭	১৬১২	৭৪৭	৬৪৩	৫৩৬
চতুর্দশ	৮৪	৩২	৩২	১৫১১	৬৭৯	২৩১	৩৯০	২৪৬	১৮২
পঞ্চদশ	৯০	২৯	২৯	১১৩৯	৬৪৪	৫৯৭	৪০৫	২৫৮	২৩১
ষষ্ঠদশ	২০৩	৬৯	৬৯	২৯৪৬	২০৪৫	১৬২৯	১১৯৮	১০০১	৮০৪
সপ্তদশ	৪১	১০	১০	৮০৯	৪৩৫	৩৫০	৪০২	২০৫	১৬৫
অষ্টাদশ	১৯০	৫৮	৫৮	২৭১৯	১৭০৫	১৫৩০	১৩৮৩	১১১৯	১০১৫
উনবিংশ	১২৯	৪১	৪১	১৭৮৯	১৪৯৪	১২১৩	৮৩৪	৭৬১	৬০০
মোট	৩৪৯৩	৯৬৪	৭৯৩	৪৬৫২৫	২৮২৪০	২৩৩৬৬	১৩৬২৬	১০৪০৩	৯০০৩

উৎস : গবেষক কর্তৃক জাতীয় সংসদ থেকে সংগৃহীত তথ্য সারণিকৃত।

সরকারের বার্ষিক বাজেট, অর্থাৎ, সকল আয় ও ব্যয় অনুমোদন সংসদের একটি গুরুত্বপূর্ণ সাংবিধানিক দায়িত্ব। সংসদীয় ব্যবস্থায় অনেক দেশে সংশ্লিষ্ট কমিটি বাজেট প্রণয়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে। বাংলাদেশে অর্থ মন্ত্রণালয় বাজেট প্রণয়ন করে এবং অর্থমন্ত্রী তা উপস্থাপন করেন। নবম জাতীয় সংসদে ৫টি বাজেট উপস্থাপিত হয়। ২০০৯ সালের বাজেট অধিবেশন বিরোধী দল বর্জন করে। ২০১০ সালের বাজেট অধিবেশনের মোট ৩৩টি কার্যদিবসের মাত্র ১টিতে বিরোধী দল অংশ নিয়েছিল। এরপর ২০১১ ও ২০১২ সালের অধিবেশন বিরোধী দল সম্পূর্ণভাবে বর্জন করে। কেবল ২০১৩ সালের বাজেট অধিবেশনে বিরোধী দল অংশ নেয়। এই বাজেটের উপর সরকারী ও বিরোধী দলের ১৫০ জন সদস্য ৫৬ ঘণ্টা ২২ মিনিট আলোচনা করেন। নবম জাতীয় সংসদ স্থায়ী কমিটিসমূহ গঠন, কমিটিসমূহের সভা অনুষ্ঠান এবং কমিটি-রিপোর্ট প্রণয়ন ও উপস্থাপন করলেও সরকারের ওপর প্রকৃত জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠায় উল্লেখযোগ্য অবদান রাখতে পারেনি। অধিকাংশ কমিটির সভাপতি ছিলেন প্রধান সরকারী দল আওয়ামী লীগের সদস্য। ফলে কমিটিসমূহ সরকারের জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠা, সরকারী কর্মকর্তাদের সংসদীয় পর্যবেক্ষণের (oversight) আওতায় আনার ক্ষেত্রে উদ্যোগী কার্যক্রম গ্রহণ করেনি। প্রধানমন্ত্রী ও অন্য মন্ত্রীদের প্রতি

বিভিন্ন ধরনের অসংখ্য প্রশ্ন উত্থাপিত হলেও এগুলো প্রধানত সংসদীয় রুটিন কার্যক্রমের অংশ হিসিবে গণ্য ছিল। বিরোধী দলীয় সদস্যদের অনুপস্থিতিতে সরকারী দলের সদস্যরা প্রধানমন্ত্রী ও মন্ত্রীদের প্রতি মূলত বিতর্কহীন ও প্রীতিকর (comfortable) প্রশ্নই উত্থাপন করেছেন। সরকারকে বা নির্বাহী বিভাগকে সংসদীয় তদারকির মধ্যে আনার ক্ষেত্রে এসব প্রশ্নোত্তর খুব কার্যকর অবদান রাখেনি। নবম সংসদে ৫টি বাজেট উত্থাপিত ও আলোচিত হলেও সনাতনী বাজেট-সংস্কৃতির পরিমণ্ডল অতিক্রম করা যায়নি। বিরোধী দলের ৩০ জন সদস্য বাজেট নিয়ে তাদের বক্তব্য তুলে ধরেন। প্রায় সকল বাজেট-আলোচনায় সরকারী দলের ব্যাকবেঞ্চার ও বিরোধী দলের সদস্যরা প্রধানত 'মেঠো বক্তৃতা' দিয়েছেন। সদস্যদের আলোচনার পর প্রস্তাবিত কোনো বাজেটে মৌলিক কোনো পরিবর্তন/সংযোজন ঘটেনি। বিরোধী দলের অনুপস্থিতি নির্দেশ করে যে, নবম জাতীয় সংসদে চারটি বাজেট অনুমোদিত হয়েছে বিরোধী দলের কোনো আলোচনা/অবদান ছাড়াই।

১০. সাফল্য

১০.১ মেয়াদপূর্তি

বাংলাদেশের জাতীয় সংসদগুলোর ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় দ্বাদশ সংশোধনী-পূর্ব সকল সংসদ বিভিন্ন কারণে মেয়াদপূর্তির আগেই বিলুপ্ত হয়েছে। দ্বাদশ সংশোধনীর মাধ্যমে সংসদীয় ব্যবস্থা পুনঃপ্রবর্তনের পর পঞ্চম জাতীয় সংসদ প্রথম প্রায় পুরো মেয়াদ (চার বছর সাত মাস) পূর্ণ করে। এরপর সপ্তম ও অষ্টম জাতীয় সংসদ পাঁচ বছরের মেয়াদপূর্তিতে বিলুপ্ত হয়। নবম জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশন থেকে বিরোধী দল সংসদ বর্জন শুরু করে। বিভিন্ন কারণে সরকারী ও বিরোধী দলের সম্পর্ক ক্রমে অবনতির দিকে যেতে থাকে। ফলে এ আশঙ্কা দেখা দেয় যে, নবম জাতীয় সংসদ আদৌ পুরোমেয়াদ টিকে থাকবে কিনা। কিন্তু এ সংসদ রেকর্ডসংখ্যক কার্যদিবসে সবচেয়ে বেশি আইন প্রণয়ন করেছে পূর্ণমেয়াদ টিকে থেকে। এক অস্থির ও সহিংস রাজনৈতিক সময়ে নবম জাতীয় সংসদের পুরোমেয়াদ টিকে থাকাও সাফল্যের এক নিদর্শন বলে বিবেচিত হতে পারে। সংসদীয় ব্যবস্থা পুনঃপ্রবর্তনের পর তিনটি জাতীয় সংসদের মেয়াদপূর্তি সংসদের প্রাতিষ্ঠানিক বিকাশের জন্যও সহায়ক বলে গণ্য হবে।

১০.২ গুরুত্বপূর্ণ আইন, প্রস্তাব

নবম জাতীয় সংসদ একটি সাংবিধানিক সংশোধনী এবং অনেক গুরুত্বপূর্ণ আইন ও প্রস্তাব পাস করেছে। পঞ্চদশ সংশোধনীর পক্ষে বিপক্ষে অনেক যুক্তি/বিতর্ক হয়েছে এবং ভবিষ্যতে হয়তো আরও হবে, তবে এটি যে একটি গুরুত্বপূর্ণ সাংবিধানিক সংশোধনী তা অস্বীকার করা যাবে না। যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের প্রশ্নে আন্তর্জাতিক অপরাধ (ট্রাইবুনাল) (সংশোধন) আইন ২০১৩, স্থানীয় সরকার ও সাংসদদের ভূমিকার ক্ষেত্রে উপজেলা পরিষদ (রহিত আইন পুনঃপ্রচলন ও সংশোধন) আইন ২০০৯, সরকারের সঙ্গে গ্রামীণ ব্যাংকের সম্পর্ক এবং এই পটভূমিতে প্রণীত গ্রামীণ ব্যাংক আইন ২০১৩, বিডিআর বিদ্রোহের পর ও নতুন

একটি বাহিনী গঠনের পর গৃহীত বর্ডার গার্ড আইন ২০১০, পদ্মা সেতু নির্মাণ ত্বরান্বিত করার জন্য পাসকৃত পদ্মা বহুমুখী সেতু প্রকল্প (ভূমি অধিগ্রহণ) আইন ২০০৯ ইত্যাদি অপরিসীম গুরুত্বপূর্ণ আইন বলে বিবেচিত হবে। এছাড়া নবম জাতীয় সংসদ কিছু অসাধারণ প্রস্তাব অনুমোদন করেছে। এগুলোর মধ্যে যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের জন্য এবং বাংলাকে জাতিসঙ্ঘের অন্যতম দাপ্তরিক ভাষা করার জন্য সর্বসম্মতিতে গৃহীত প্রস্তাব দুটোর কথা উল্লেখ করা যেতে পারে।

১০.৩ কমিটি গঠন ও কাজ

নবম জাতীয় সংসদের শুরুটা ছিল বেশ আশা জাগানিয়া। প্রথম অধিবেশনেই সংসদীয় স্থায়ী কমিটিগুলো গঠন করা হয়েছিল। সংরক্ষিত আসনে নারী সদস্যদের নির্বাচন সম্পন্ন হয়েছিল। কমিটিগুলোর কাজ গতিশীল করার জন্য বিভিন্ন সময়ে অনেক উপকমিটিও গঠন করা হয়েছিল। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, এসব কমিটি ও উপকমিটি কয়েক হাজার বৈঠক করেছে এবং অনেক রিপোর্টও পেশ করেছে। সংসদীয় কমিটিগুলোর মধ্যে সরকারী হিসাব সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি এবং সরকারী প্রতিষ্ঠান কমিটি সবচেয়ে বেশি কর্মতৎপর ছিল। এই দুই কমিটি যথাক্রমে ১৩১টি ও ৯০টি বৈঠক করেছে।[৪০] বিরোধী দলের ব্যাপক অনুপস্থিতির কারণে সংসদের কার্যক্রম সাধারণ মানুষের মনোযোগ খুব বেশি আকর্ষণ করতে পারেনি এটা ঠিক, তবে নবম জাতীয় সংসদের কমিটি ও উপকমিটিগুলো যেসব কাজ করেছে তা বাংলাদেশের জাতীয় সংসদীয় কার্যক্রমের ইতিহাসে তাৎপর্যপূর্ণ সংযোজন বলে স্বীকৃত হবে।

১১. ব্যর্থতা

১১.১ বিরোধী দলের অনুপস্থিতি

নবম জাতীয় সংসদের সকল অর্জন ও সাফল্যকে ম্লান করে সবচেয়ে বেশি আলোচনা ও বিতর্ক হয়েছে বিরোধী দলের সংসদ থেকে অনুপস্থিত থাকা নিয়ে। দ্বাদশ সংশোধনী-উত্তর সকল জাতীয় সংসদেই বিরোধী দল দীর্ঘ সময়ের জন্য সংসদ বর্জন করেছে। বিরোধী দলের জাতীয় সংসদ বর্জন বাংলাদেশের সংসদীয় সংস্কৃতির এক নেতিবাচক বৈশিষ্ট্যে পরিণত হচ্ছে। আগেই দেখানো হয়েছে, এই সংসদে বিরোধী দলের সংসদ বর্জনের নতুন রেকর্ড তৈরি করা হয়েছে। সরকারী ও বিরোধী দলের সংখ্যা-বৈষম্যের কারণে বিরোধী দল জাতীয় সংসদে 'কার্যকর' কিছু করতে পারবে না, এই ধারণা তাদের সংসদের স্বাভাবিক কার্যক্রমে অংশ নিতে উৎসাহিত করেনি। এছাড়া, বিরোধী দল সরকার-বিরোধিতার অংশ হিসেবে সংসদ-অসহযোগিতার নীতি গ্রহণ করে। এই অসহযোগ নীতির ফলে অব্যাহতভাবে সংসদ বর্জন করে। অন্যদিকে, সরকারী দলও বিরোধী দলবিহীন জাতীয় সংসদ পরিচালনায় অধিকতর স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে। এতে এটাই প্রতীয়মান হয় যে, সংখ্যার দিক থেকে অতি দুর্বল বিরোধী দলের ন্যূনতম বিরোধিতার মুখোমুখি হতেও তারা অনাগ্রাহী হয়। কিন্তু বিরোধী ও সরকারী দলের এসব নীতি ও দৃষ্টিভঙ্গি কার্যত কোনো পক্ষ এবং সংসদের

জন্যও সহায়ক হয়নি। বরং উভয় পক্ষের জন্যই আত্মঘাতী বলে বিবেচিত হয়েছে। জাতীয় সংসদে বিরোধী দলের সদস্য-সংখ্যা সরকারী দলের তুলনায় কম হবে এটাই স্বাভাবিক। উভয় পক্ষের মধ্যকার সংখ্যাগত বৈষম্য খুব বেশি হলে সরকারী দল হয়তো বাড়তি সুবিধা পায়, কিন্তু তাই বলে বিরোধী দলের নিরাশ হওয়ার কিছু ছিল না। কারণ বিরোধী দল সরকারের বিরোধিতা করবে কিংবা নিজের বক্তব্য তুলে ধরবে আদর্শ, বিকল্প চিন্তা, যুক্তি ও উপযুক্ত তথ্যের আলোকে। যেখানে উন্নত চিন্তা ও যুক্তিপূর্ণ বিকল্পের সন্ধান থাকবে সেখানে কতজন সে কথা বললেন সেটার চেয়ে কি বললেন তা-ই বেশি গুরুত্বপূর্ণ বিবেচিত হতো। 'কার্যকর' কিছু করতে পারবে না— এটা ভেবে বিরোধী দল জাতীয় সংসদে অংশগ্রহণ থেকে বিরত থেকে সরকার-বিরোধিতার এবং নিজের বিকল্প চিন্তা প্রকাশের সুযোগ নষ্ট করেছে। জাতীয় সংসদের বিতর্কে বিরোধী দল না জিততে পারে, কিন্তু তা-ই বলে বিরোধিতায় যুক্তিপূর্ণ বক্তব্য উত্থাপন করবে না, এটা হতে পারে না। সংসদ বর্জন থেকে বিরোধী দল একদিকে সরকার-বিরোধিতার প্রাতিষ্ঠানিক সুযোগ হারিয়েছে অন্যদিকে তাদের এই কৌশল সংসদীয় সংস্কৃতি এবং সংসদীয় কাঠামো নির্মাণে তারা আন্তরিক নন— জনমনে এই ধারণাও প্রতিষ্ঠা পেয়েছে। বাংলাদেশের রাজনৈতিক দলগুলো সংসদকে সরকার গঠনের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করতে যত আগ্রহী বিরোধী দলে থেকে সংসদীয় ব্যবস্থায় প্রাপ্য সুযোগ ও প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো প্রয়োগ করে দায়িত্বশীল ভূমিকা পালনে ততটা-ই নিরুৎসাহী। নবম জাতীয় সংসদেও বিরোধী দলের অব্যাহত সংসদ বর্জনে এই মনোভাবের প্রতিফলন ঘটেছে। পঞ্চম ও সপ্তম জাতীয় সংসদে সরকারী দলের পক্ষ থেকে বিরোধী দলকে সংসদে ফিরিয়ে আনার কিছু আন্তরিক প্রয়াস ছিল, কিন্তু নবম জাতীয় সংসদ আমলে তেমন কোনো জোরালো প্রচেষ্টা লক্ষ্য করা যায়নি। রাজনৈতিক বিশ্লেষকেরা নবম সংসদের সামনে, 'Bringing the opposition back into the parliament as well as keeping them engaged in parliamentary work remains the most challenging task.'[৪১] বলে মনে করলেও সরকার পক্ষ তাতে যথেষ্ট গুরুত্ব দেয়নি। এর ফলে সরকারী দল হয়তো 'নির্বিঘ্নে' সংসদ চালাতে সক্ষম হয়েছে তবে 'খোড়া' সংসদ চালানোর দায় সরকারের উপরও বর্তিয়েছে। এছাড়া, বিরোধী দলের অনুপস্থিতির কারণে নবম জাতীয় সংসদ যতটুকু সাফল্য লাভ করেছে তা-ও যথাযথ গুরুত্ব পায়নি।

১১.২ কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠানে পরিণত না-হওয়া

সংসদীয় ব্যবস্থায় সকল জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষর নিয়ে জাতীয় সংসদে আলোচনা ও বিতর্ক অনুষ্ঠিত হয়। সংসদ হয় জাতীয় কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠান। পূর্ববর্তী সংসদগুলোর মতো নবম সংসদ আমলেও বিরোধী দল সংসদের তুলনায় রাজপথকেন্দ্রিক আন্দোলনে বেশি আগ্রহী ছিল। অন্যদিকে সরকারী দলও সকল জাতীয় ও আন্তর্জাতিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে জাতীয় সংসদে আলোচনা, বিতর্কের চেয়ে বিরোধী দলকে রাজনৈতিকভাবে 'ঘায়েল' করা যায় এমন সব বিষয়ে বেশি মনযোগী ছিল। নবম জাতীয় সংসদে অধিকাংশ সময় বিরোধী দল না-

থাকায় এমনিতে প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ বিতর্কের সুযোগ ছিল না। তাছাড়া, সরকারী দল আলোচনার জন্য সেসব বিষয়ই নির্ধারণ করে যা তাদের রাজনৈতিক ফায়দা দেয়। ফলে সংসদকে কেন্দ্রীয় জাতীয় প্রতিষ্ঠান হিসেবে নয়, বরং খর্বিত ও দলীয় স্বার্থলাভের উপায় (tool) হিসেবেই প্রধানত ব্যবহার করা হয়।

১১.৩ রাজনৈতিক সংকটের শুরু

সাধারণভাবে এটাই প্রত্যাশিত যে, জাতীয় সংসদে বিস্তৃত আলোচনার মাধ্যমে সকল রাজনৈতিক মত-পার্থক্য ও রাজনৈতিক বিরোধের অবসান ঘটানো হবে। অথচ নবম সংসদে উল্টোটা ঘটেছে, বিরোধের নিরসন হয়নি, বরং নতুন সংকটের জন্ম দেওয়া হয়েছে। জাতীয় সংসদে সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনী অনুমোদন করে তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা বিলুপ্ত করা হয়। সরকার এই বিলুপ্তির পক্ষে যুক্তি দেখায় যে, সুপ্রীম কোর্টের রায়ে এই ব্যবস্থা বিলোপের কথা বলা হয়েছে এবং দলীয় সরকারের অধীনেই নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠানের পটভূমি দেশে তৈরি হয়েছে। অন্যদিকে বিরোধী দলও তত্ত্বাবধায়ক ব্যবস্থা অব্যাহত রাখার পক্ষে তাদের যুক্তি তুলে ধরে। কিন্তু, তাতে উভয় পক্ষের মত-পার্থক্য কমেনি। বরং দুই পক্ষের কঠোর অবস্থানের কারণে বিরোধ সংকটের রূপ নেয়। বিরোধী দল তত্ত্বাবধায়ক ব্যবস্থা পুনঃপ্রবর্তনের জন্য রাজপথের আন্দোলনের কৌশল গ্রহণ করে। ঢাকা ঘেরাও, অবরোধ, হরতাল ইত্যাদি কর্মসূচি পালন করে। তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা বিলোপ করে নবম জাতীয় সংসদের গৃহীত সিদ্ধান্ত এই সংসদ বিলুপ্ত হওয়ার পরও কেন্দ্রীয় সাংঘর্ষিক ইস্যু হিসেবে বাংলাদেশের রাজনীতিকে নিয়ন্ত্রণ করছে। তত্ত্বাবধায়ক ব্যবস্থা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত না-হওয়ায় বিরোধী দল ৫ জানুয়ারি ২০১৪ সালে অনুষ্ঠিত দশম সংসদ নির্বাচন বর্জন করে। ফলে রাজনৈতিক সংকট নতুন মাত্রা লাভ করে। বিরোধী দলের পক্ষ থেকে নতুন সরকারের গ্রহণযোগ্যতা ও বৈধতা নিয়ে প্রশ্ন উত্থাপন করা হচ্ছে। সুতরাং, এটা স্পষ্ট যে, নবম সংসদ সরকারী ও বিরোধী উভয় পক্ষের পারস্পরিক সহযোগিতায় একটা রাজনৈতিক বিরোধের সমাধান করতেই কেবল ব্যর্থ হয়নি বরং উভয় পক্ষের কঠোর অবস্থানের কারণে এক রাজনৈতিক সংকটের জন্মও দিয়েছে যা দীর্ঘমেয়াদে দেশের রাজনীতিকে প্রভাবিত করবে।

১২. ইমেজ সংকট

রাষ্ট্রপতি ব্যবস্থার অধীনে (১৯৭৫-১৯৯০) বাংলাদেশ জাতীয় সংসদকে সাংবিধানিকভাবে এবং কার্যতও নির্বাহী বিভাগের অধীনস্থ করে রাখা হয়। সামরিক শাসকদের অধীনে জাতীয় সংসদ 'রাবার স্ট্যাম্প' প্রতিষ্ঠান হিসেবে খ্যাত হয়। তখন সংসদের দায়িত্ব ছিল কেবল সামরিক শাসকদের স্বার্থে প্রণীত আইন ও নীতিতে প্রয়োজনীয় অনুমোদন দেওয়া। সামরিক শাসন আমলে ব্যাপক কারচুপির জাতীয় সংসদ নির্বাচন, নির্বাচিত সংসদের প্রধানত সামরিক শাসকদের স্বার্থ সংরক্ষণ এবং সংসদে সরকারী ও বিরোধী দলের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ সম্পর্কের অনুপস্থিতি সংসদকে অকার্যকর প্রতিষ্ঠানে পরিণত করে। এভাবে সংসদ চরম ইমেজ সংকটে পড়ে। নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে অনুষ্ঠিত

অপেক্ষাকৃত অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন, সংসদীয় ব্যবস্থার পুনঃপ্রবর্তন, সক্রিয় ও শক্তিশালী সরকারী ও বিরোধী দলের উপস্থিতি, সংসদীয় কমিটি ও অন্যান্য পার্লামেন্টারি কৌশল প্রয়োগ করে সরকারের জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠার প্রয়াস ইত্যাদি প্রতিষ্ঠান হিসেবে সংসদের ভাবমূর্তি ও গ্রহণযোগ্যতা অনেকটা বৃদ্ধি করে। কিন্তু ১৯৯২ সালের পর থেকে প্রতিটি জাতীয় সংসদে বিরোধী দলের লাগাতার সংসদ বর্জন, ঘন ঘন ওয়াকআউট, সরকারী দলের বিরোধিতাহীন একলা চলো নীতি, বিরোধী দলের নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি, উভয় পক্ষের সদস্যদের অশোভন আচরণ, স্পীকারদের বিতর্কিত নিরপেক্ষতা, সরকারের জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠায় সংসদের ব্যর্থতা ইত্যাদি সংসদের কার্যকারিতাকে প্রশ্নবিদ্ধ করে। বিশেষ করে বিরোধী দলের অব্যাহত সংসদ-বর্জন এবং সংসদের ভেতরে ও বাইরে সদস্যদের অশোভন আচরণ জনমনে সংসদের ভাবমূর্তিকে বিপন্ন করে তুলে। নবম জাতীয় সংসদ এই ইমেজ সংকট দূরীকরণে কোনো অগ্রগতি তো অর্জন করেইনি, বরং জাতীয় সংসদ বর্জন এবং অশোভন আচরণে নতুন মাত্রা যুক্ত করেছে। বিরোধী দলের সংসদ-বর্জন বাংলাদেশ সংসদের জন্য এক অবাঞ্ছিত অভিশাপ। দীর্ঘদিন থেকেই এই দাবি উঠছে যে, লাগাতার সংসদ-বর্জন নিষিদ্ধ করতে হবে অথবা সদস্যদের অনুপস্থিত থাকার বিদ্যমান সময় রেখা কমাতে হবে। সদস্যদের অশোভন আচরণ নিয়ন্ত্রণে 'আচরণ বিধি' প্রণয়নের দাবি ও চেষ্টাও বহুদিনের। কিন্তু এক্ষেত্রেও নবম জাতীয় সংসদ কোনো অগ্রগতি লাভ করেনি। শুধু তাই নয়, সদস্যদের অশোভন আচরণ নিয়ন্ত্রণে সংসদ/স্পীকারের হাতে যেসব উপায় রয়েছে সেগুলোরও যথাযথ ও সার্থক প্রয়োগ হয়নি।

১৩. বিতর্কিত ইস্যুসমূহ, রুলিং এবং নাগরিক সমাজ

নবম জাতীয় সংসদে সরকারী ও বিরোধী দলের সদস্যরা এবং স্পীকাররা সংসদের ভেতরে ও বাইরে তাঁদের আচরণ/বক্তব্য/সিদ্ধান্ত/রুলিং দিয়ে এমন কিছু বিষয়/ইস্যুর জন্ম দিয়েছেন যা সংসদের কার্যক্রম/ইমেজ সম্পর্কে নাগরিক সমাজের ধারণাকে ইতিবাচক ও নেতিবাচক উভয় দিক থেকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছে। সংসদের শুরুতেই সংসদের আসন বিন্যাস নিয়ে সরকারী ও বিরোধী দল একটি অপ্রয়োজনীয় বিরোধে জড়িয়ে পড়ে। স্পীকারের বামদিকের প্রথম সারিতে বিরোধী দলের সদস্যদের পর্যাপ্তসংখ্যক আসন দেওয়া হয়নি বলে বিরোধী দল এর প্রতিবাদ করে। বিরোধী দলকে চারটি আসন দেওয়া হয় কিন্তু তারা দশটি আসন দাবি করেন। চাহিদা মতো আসন না-পেয়ে বিরোধী দল জাতীয় সংসদ-বর্জন শুরু করে। আসন সংখ্যা নিয়ে মতের পার্থক্য থাকতে পারে কিন্তু সেটা নিয়ে সরকারী ও বিরোধী দলের অনমনীয় অবস্থান, স্পীকারের স্পষ্ট সিদ্ধান্ত না-দেওয়া এবং বিরোধী দলের সংসদ বর্জন এক নজিরবিহীন ঘটনা। এর মাধ্যমে সামান্য বিষয়ে জাতীয় সংসদ সদস্যদের অতিরিক্ত গুরুত্ব আরোপ এবং ঠুনকো অজুহাতে সংসদের স্বাভাবিক কার্যক্রম ক্ষতিগ্রস্ত করার উদাহরণ তৈরি হয়।

নবম জাতীয় সংসদের সদস্য সোহেল তাজ ২৩ এপ্রিল ২০১২ সালে সংসদ থেকে পদত্যাগ করেন। এর আগে ৩১ মে ২০০৯ সালে তিনি সরকারের প্রতিমন্ত্রীর পদ ত্যাগ করেন।

কিন্তু সরকারের পক্ষ থেকে জানানো হয় যে তার পদত্যাগ পত্র গৃহীত হয়নি। কোনো মন্ত্রী পদত্যাগ পত্র জমা দিলে তা গ্রহণ করা বা না-করার সুযোগ সংবিধান অনুযায়ী আছে কিনা এ-বিতর্কের পটভূমিতে সোহেল তাজ যুক্তরাষ্ট্র থেকে এক সহকারীর মাধ্যমে স্পীকারের দপ্তরে তার সংসদ সদস্যপদ ত্যাগ করে পত্র পাঠান। পদত্যাগ পত্র জমা দেওয়ার দুই সপ্তাহ পর স্পীকার জানান যে, সোহেল তাজের পদত্যাগ পত্র গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ এটি সংবিধান এবং সংসদের কার্যপ্রণালী বিধি অনুযায়ী প্রদান করা হয়নি। স্পীকারের ব্যাখ্যায় বলা হয়, সোহেল তাজ স্বহস্তে পদত্যাগ পত্র লিখেননি, নিজে উপস্থিত থেকে জমা দেননি এবং জমাকৃত পত্রে 'পদত্যাগ করতে ইচ্ছুক' ('willing to resign'), এটা লিখেননি; যা লেখা সংবিধানের ৬৭ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী বাধ্যতামূলক। উল্লেখ্য, ১৯৯৪ সালে বিরোধী দলের ১৪৭ জন সাংসদ পদত্যাগ করলে স্পীকার সদস্যরা নিজেরা উপস্থিত থেকে পদত্যাগ পত্র জমা না-দেওয়ায় তা অগ্রহণযোগ্য বলে সিদ্ধান্ত দেন। সোহেল তাজের ক্ষেত্রে স্পীকারের সিদ্ধান্ত এক বিতর্কের জন্ম দেয়। অনেকে বলেন, এর মাধ্যমে স্পীকার 'has over stepped his jurisdiction'.[৪২] ১৯৯৫ সালে দেওয়া হাইকোর্টের এক রায়ের উদ্ধৃতি দিয়ে বলা হয়, সাংসদদের পদত্যাগ পত্র গ্রহণ বা প্রত্যাখ্যান করার এখতিয়ার স্পীকারের নেই এবং পদত্যাগ পত্র স্বহস্তে লেখারও দরকার নেই; তাতে সাক্ষর থাকাই যথেষ্ট।[৪৩] যাহোক, সোহেল তাজ যুক্তরাষ্ট্র থেকে ফিরে স্পীকারের সঙ্গে দেখা করে পদত্যাগ পত্র জমা দেন এবং শেষ পর্যন্ত তা গৃহীত হয়। সোহেল তাজের পদত্যাগ এবং এর পরবর্তী ঘটনা প্রবাহের সমাপ্তি এভাবে হলেও একজন সংসদ সদস্যের পদত্যাগ পত্র নিজে হাতে লেখা, নিজে উপস্থিত থেকে জমা দেওয়া, পদত্যাগের 'ইচ্ছা ব্যক্ত করা' ইত্যাদি বিষয়ে সংবিধান এবং কার্যপ্রণালী বিধির শর্তাবলী, উচ্চ আদালতের নির্দেশ, বিভিন্ন সময়ে দেওয়া স্পীকারদের সিদ্ধান্ত এবং প্রাসঙ্গিক বিতর্ক ইত্যাদি সংসদ সদস্যদের পদত্যাগ গ্রহণ করা না-করা বিষয়ে ভবিষ্যতে নতুন দৃষ্টিভঙ্গি প্রয়োগের সুযোগ দিবে বলে প্রত্যাশা করা যায়।

সাহিত্যিক ও বুদ্ধিজীবী এবং টিআইবি (ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ)-র ট্রাস্টি বোর্ডের সদস্য অধ্যাপক আব্দুল্লাহ আবু সায়ীদকে ৩ জুন ২০১২ সালে জাতীয় সংসদের বৈঠকে তীব্রভাবে সমালোচনা করা হয়। আগের দিন একটি অনুষ্ঠানে অধ্যাপক সায়ীদ সংসদ সদস্য ও মন্ত্রিরা 'চোর ও ডাকাতের মতো কাজ করছেন, তাদের আচরণ যথাযথ নয় এবং তারা শপথ ভঙ্গ করছেন', এসব কথা বলেছেন এই অভিযোগ তুলে (পত্রিকায় প্রকাশিত রিপোর্টের ভিত্তিতে) জাতীয় সংসদে তাঁকে কঠোর ভাষায় নিন্দা করা হয়। জাতীয় সংসদের বৈঠকে তখন সভাপতিত্ব করছিলেন অধ্যাপক মো. আলী আশরাফ। তিনি বলেন, সংসদ সদস্য ও মন্ত্রিদের প্রতি এই অবমাননাকর বক্তব্যের জন্য অধ্যাপক সায়ীদকে নিঃশর্ত ক্ষমা চাইতে হবে। তাঁর বক্তব্য খারাপ কিছুর ইঙ্গিত, তাঁর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা না-নিলে তা গণতন্ত্রের জন্য ক্ষতিকর হবে। তিনি আরও বলেন যে, সংসদ সদস্যরা অধ্যাপক সায়ীদের বিরুদ্ধে 'সেন্সর প্রস্তাব' উত্থাপন করতে পারেন।[৪৪] এরপর স্বতন্ত্র সদস্য ফজলুল আজিম বলেন, এ-ধরনের মন্তব্য করে অধ্যাপক সায়ীদ সদস্যদের মর্যাদা এবং সংসদের

সার্বভৌমত্বের হানি ঘটিয়েছেন। এ-রকম অবমাননাকর উক্তির বিরুদ্ধে জাতীয় সংসদের ব্যবস্থা নেওয়া উচিত।[৪৫] জাতীয় পার্টির সদস্য মুজিবুল হক চুন্নু সংসদ সদস্য ও মন্ত্রিদের সমালোচনা করার জন্য অধ্যাপক সায়ীদ ও অন্য বুদ্ধিজীবীদের তীব্র সমালোচনা করেন। তিনি বলেন, তারা (বুদ্ধিজীবীরা) কেবল পরামর্শ দিতে পারেন, কিন্তু দেশ স্বাধীন করেছেন রাজনীতিবিদেরাই।[৪৬] এরপর আওয়ামী লীগ সদস্য শেখ ফজলুল করিম বলেন, তাঁর (অধ্যাপক আবু সায়ীদ) মতো বুদ্ধিজীবীরা সংসদ সদস্য, মন্ত্রী ও সরকারকে সার্টিফিকেট প্রদান করেন। কিন্তু তাদের সার্টিফিকেট দেবে কে? এক/এগারর সময় তাদের কি ভূমিকা ছিল আমরা জানি। তখন তত্ত্বাবধায়ক সরকার ছাত্রদের গ্রেফতার করলে তারা কিছু বলেননি। তিনি টিআইবি-র অর্থের উৎস কি এবং তারা কিভাবে প্রতি সপ্তাহে একটি বা দুটি বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠান করে সে-বিষয়ে অনুসন্ধান করার জন্য অর্থমন্ত্রীর প্রতি আহ্বান জানান।[৪৭] তাঁরা (টিআইবি-র কর্মকর্তারা) কিভাবে গাড়ির মালিক হন ও বিলাসী জীবনযাপন করেন তা দেখার জন্যও তিনি অর্থমন্ত্রীকে অনুরোধ করেন। অধ্যাপক সায়ীদকে নিয়ে সংসদ সদস্যদের করা এসব বক্তব্যের সমালোচনা করেন অনেকে। আক্রমণাত্বক বক্তব্যের বিরুদ্ধে বিভিন্ন সংবাদপত্র ও সংবাদ মাধ্যমে প্রতিবেদন ও প্রতিক্রিয়া ছাপা ও প্রচারিত হয়। অধ্যাপক আব্দুল্লাহ আবু সায়ীদ তার প্রতিক্রিয়ায় বলেন, তিনি যা বলেছেন সংবাদপত্রে তা ভিন্নভাবে ছাপা হয়েছে। দুর্নীতির সংজ্ঞা দিতে গিয়ে তিনি বলেছিলেন, একজন চোর যখন চুরি করে সেটা দুর্নীতি নয়। কিন্তু কেউ নীতি, বিধি ও আইন অনুযায়ী চলার অঙ্গীকার করে যখন চুরি করেন তখন এটা দুর্নীতি হয়। যেমন, একজন মন্ত্রী বা এমপি, যিনি সৎ ও নৈতিকভাবে চলার শপথ নিয়েছেন তিনি যদি সেভাবে চলতে ব্যর্থ হন তাহলে সেটা দুর্নীতি।[৪৮] সংসদ সদস্যদের সমালোচনা সম্পর্কে অধ্যাপক সায়ীদ বলেন, সংবাদপত্রে যেভাবে রিপোর্ট ছাপা হয়েছে তাতে যেকোনো লোক ক্ষুব্ধ হতে পারেন। আমি সংসদ সদস্যদের সম্পূর্ণভাবে দায়ী করি না। কিন্তু এটা বলতে চাই: 'democracy is the rule of the greatest sons of a country and the parliamentarinas are the greatest sons of a nation. So they (lawmakers) have a greater responsibility. They should talk and behave with dignity.[৪৯] তিনি বলেন, যা আমাকে কষ্ট দিয়েছে তাহলো সংসদ সদস্যরা আমার সমালোচনা করলেন কিন্তু প্রকৃত ঘটনা কি তা জানতে চাইলেন না।[৫০] অধ্যাপক আব্দুল্লাহ আবু সায়ীদের প্রতি এ-রকম ব্যক্তিগত আক্রমণকে একজন লেখক 'high-tech lynching'[৫১] (বিনা বিচারে নির্মমভাবে ফাঁসিতে ঝুলানো) বলে চিহ্নিত করেন। তবে সংসদের পক্ষ থেকে এই বিষয়ে প্রথম ইতিবাচক মনোভাব প্রকাশ করেন ডেপুটি স্পীকার শওকত আলী। তিনি বলেন: 'একটি পত্রিকা দেখে, বিষয়টি সম্পর্কে ভালভাবে না জেনে তাঁর [অধ্যাপক আব্দুল্লাহ আবু সায়ীদ] মতো সম্মানিত ব্যক্তিকে নিয়ে বিরূপ সমালোচনা করা ঠিক হয়নি। একজন সংসদ সদস্য ভুল করতে পারেন। তাই বলে তিনজন ভুল করবেন, এটা তো ঠিক নয়।' তিনি বলেন: 'আমি সংসদে থাকলে এ আলোচনা হতে দিতাম না। কারণ আবু সায়ীদ সম্মানিত ব্যক্তি। অন্তত আমি তাঁকে শ্রদ্ধা

করি। তাঁর বিরুদ্ধে কথা বলার সময় জেনে কথা বলা উচিত।'[৫২] এরপর ৩ জুন সমালোচনাকারী সংসদ সদস্য মুজিবুল হক চুন্নু অধ্যাপক সায়ীদের কাছে ফোন করে নিজের বক্তব্যের জন্য দুঃখ প্রকাশ করেন। তিনি বলেন: আমি স্যারকে 'সরি' বলেছি। ভুল বুঝাবুঝি থেকে এটা ঘটেছে।[৫৩] অধ্যাপক আবু সায়ীদকে কেন্দ্র করে সৃষ্ট এই বিতর্কের সমাপ্তি টানেন সংসদের স্পীকার আব্দুল হামিদ এক রুলিং-এর মাধ্যমে। তিনি এই 'অনাকাঙ্ক্ষিত আলোচনা'র জন্য সংসদের পক্ষ থেকে দুঃখ প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, 'কিছু সংবাদপত্রে ভুল সংবাদ প্রকাশের ফলে এই অনাকাঙ্ক্ষিত আলোচনা হয়েছে। আলোচনায় কিছু সদস্য অসংসদীয় শব্দ ব্যবহার করেছেন। আমি এজন্য জাতীয় সংসদের পক্ষ থেকে আন্তরিক দুঃখ প্রকাশ করছি।' তিনি সংসদ সদস্যদেরও মুখরক্ষা করেন। স্পীকার বলেন, সংসদ সদস্যরা সংবাদপত্রে প্রকাশিত রিপোর্টের কারণে অধ্যাপক সায়ীদের সমালোচনা করেছেন।[৫৪] যাহোক, তার এই দৃষ্টিভঙ্গি ও দুঃখ প্রকাশে বিতর্কের ইতি ঘটে এবং স্পীকার নিজেও প্রশংসিত হন। বাংলাদেশের সংসদে যেখানে সরকারী ও বিরোধী দলের সদস্যরা প্রায় নিয়মিত নিজেদের মধ্যে অসংসদীয় বাক্য বিনিময় করে চলেছেন, যার কোনো আইনি বা সৌজন্যপূর্ণ সমাধান নেই, সেখানে একজন নাগরিকের প্রতি নিক্ষিপ্ত অসংসদীয় বাক্যের জন্য জাতীয় সংসদের পক্ষ থেকে দুঃখ প্রকাশ করা হবে এটা প্রায় অকল্পনীয়। এজন্যই একজন অভিজ্ঞ সম্পাদক লিখেছেন: 'For our parliament to extent a collective apology to a citizen was unthinkable till Speaker Abdul Hamid showed the way.'[৫৫] আবার স্পীকার তাঁর রুলিং-এ সংবাদপত্রে ভুল খবর প্রকাশিত হওয়ায় অধ্যাপক সায়ীদকে কেন্দ্র করে 'অনাকাঙ্ক্ষিত আলোচনা' হয়েছে বলে উল্লেখ করেছেন কিন্তু সদস্যরা, পত্রিকার রিপোর্ট সত্য হলেও, এভাবে আলোচনা করতে পারেন কিনা এ-ব্যাপারে কিছু বলেননি। এজন্য স্পীকারের রুলিং 'গলদপূর্ণ' ও 'আধা নৈতিক' বলে সমালোচিতও হয়েছে। [৫৬]

সুপ্রীম কোর্টের কাছে সড়ক ভবন হস্তান্তর করা নিয়ে ২৯ মে ২০১২ সালে সংসদে এক বিতর্ক অনুষ্ঠিত হয়। এই বিতর্কে অংশ নিয়ে এক পর্যায়ে স্পীকার আবদুল হামিদ বলেন যে, 'দেশের মানুষের বিচার পেতে বছরের পর বছর লেগে যাবে, আর নিজেদের বিষয় হলে বিচার বিভাগ ঝটপট সিদ্ধান্ত নিয়ে নেবেন, এটা ভালো দেখায় না। আদালতের রায়ে ক্ষুব্ধ হলে জনগণ বিচার বিভাগের বিরুদ্ধেও রুখে দাঁড়াতে পারে।'[৫৭] ৫ জুন হাইকোর্টের বিচারপতি এইচ. এম. শামসুদ্দীন চৌধুরী ও বিচারপতি জাহাঙ্গীর হোসেনের বেঞ্চ স্পীকারের এই বক্তব্যকে 'রাষ্ট্রদ্রোহের শামিল' এবং 'স্পীকার সুপ্রীম কোর্ট ও সরকারের বিরুদ্ধে জনগণকে উসকে দিয়েছেন' বলে এক আদেশ প্রদান করেন।[৫৮] হাইকোর্টের এই আদেশের তীব্র প্রতিক্রিয়া হয় এই দিনের সংসদে। জাতীয় সংসদে বেঞ্চের সিদ্ধান্তের সমালোচনা করা হয়। সাংসদরা বিচারপতিদের অপসারণের জন্য 'সুপ্রীম জুডিশিয়াল কাউন্সিল গঠন'-এর প্রস্তাব করেন। প্রয়োজনে 'সংবিধান সংশোধন করে বিচারপতিদের অভিসংশনের ক্ষমতা সংসদের কাছে ফিরিয়ে'[৫৯] আনার দাবিও করেন তাঁরা। বিচারপতিরা 'সংবিধান লঙ্ঘন' এবং 'সংসদের ওপর নগ্ন হামলা' করেছেন বলে সংসদে উল্লেখ করা

হয়।[৬০] ১৮ জুন স্পীকার সংসদে এ-বিষয়ে এক রুলিং দেন। এতে তিনি সুপ্রীম জুডিশিয়াল কাউন্সিল গঠনের জন্য সাংসদদের দেওয়া প্রস্তাব প্রত্যাহারের অনুরোধ করেন। তবে উল্লেখ করেন যে, হাইকোর্টের বিচারপতি এইচ. এম. শামসুদ্দীন চৌধুরী স্পীকার ও সংসদ সম্পর্কে অপমানসূচক মন্তব্য করে সংবিধানের ৭৮ (১) অনুচ্ছেদ লঙ্ঘন করেছেন। এ-বিষয়ে পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য তিনি প্রধান বিচারপতির প্রতি আহবান জানান। প্রধান বিচারপতির সিদ্ধান্তের ফলে এ-ধরনের ঘটনা আর ভবিষ্যতে ঘটবে না বলে স্পীকার আশা প্রকাশ করেন। স্পীকারের এই রুলিং অনেকের প্রশংসা অর্জন করে। একজন আইনবিদ মন্তব্য করেন: 'Speaker has shown his political wisdom and sagacity by letting the matter rest with the Chief Justice.'[৬১] কিন্তু জাতীয় সংসদ ও বিচার বিভাগকে কেন্দ্র করে সৃষ্ট এই জটিলতার সমাপ্তি এখানেই ঘটেনি। একজন বিচারপতি সংবিধান লঙ্ঘন করেছেন এবং এই বিষয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে প্রধান বিচারপতির প্রতি আহ্বান জানিয়ে স্পীকার যে রুলিং দিয়েছেন সে বিষয়ে হাইকোর্টে এক রিট আবেদন করা হয়। এই আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে বিচারপতি হাসান ফয়েজ সিদ্দিকী ও বিচারপতি এ. বি. এম. আলতাফ হোসেন স্পীকারের রুলিং-কে 'ভিত্তিহীন ও অকার্যকর'[৬২] বলে রায় দেন। এই রায়ের কঠোর সমালোচনা করা হয় ৪ সেপ্টেম্বর জাতীয় সংসদের অধিবেশনে। সাংসদরা এই রায়কে 'উসকানিমূলক, কাণ্ডজ্ঞানহীন'[৬৩] বলে উল্লেখ করেন। বিচারপতিরা সংবিধান লঙ্ঘন করেছেন এবং তাঁদের অপসারণে সুপ্রীম জুডিশিয়াল কাউন্সিল গঠনের আহ্বানও জানান তাঁরা। দীর্ঘ সময় ধরে অনুষ্ঠিত সাংসদদের আলোচনার পর স্পীকার বলেন: 'দিন-তারিখ বলতে পারছি না। তবে ভেবেচিন্তে সময় নিয়ে এ ব্যাপারে আমি সংসদকে জানাব।'[৬৪] জাতীয় সংসদ ও বিচার বিভাগ রাষ্ট্রের দুটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ। সংবিধান ও আইনে সংসদ ও বিচার বিভাগের দায়িত্ব ও ক্ষমতার পরিসর সুস্পষ্টভাবে বর্ণিত রয়েছে। তবু সময় ও পরিস্থিতির কারণে এই দুই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের মধ্যে পরস্পরের ভূমিকা, আচরণ, প্রাসঙ্গিক বিষয়াদির ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ইত্যাদি নিয়ে মত পার্থক্য দেখা দিতে পারে এমনকি ভুল বোঝাবুঝিও হতে পারে। এসব নিয়ে সুগভীর সাংবিধানিক, আইনি ও একাডেমিক আলোচনা চিন্তার পরিসরকে আরও বিস্তৃত ও সমৃদ্ধ করতে পারে। ২০১২ সালে জাতীয় সংসদ ও বিচার বিভাগের মধ্যে যেসব বিষয় নিয়ে পর্যায়ক্রমে সমস্যা হয়েছে সেগুলো নিয়ে সংসদ ও বিচার বিভাগের দেওয়া বক্তব্য/রুলিং/রায় বাংলাদেশের সংসদীয় রাজনীতির ইতিহাস চর্চা, আইন ও বিচার বিভাগের সম্পর্ক অনুধাবন এবং ক্ষমতার স্বতন্ত্রীকরণ নীতি বোঝার দিক থেকে ভবিষ্যতে বিশ্লেষিত, পরীক্ষিত এবং গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচিত হবে।

সরকারী ও বিরোধী দলের পারস্পরিক সম্পর্কের দিক থেকে নবম জাতীয় সংসদে সংঘটিত সবচেয়ে 'সুখকর' অভিজ্ঞতা হলো বিরোধী দলীয় নেত্রী খালেদা জিয়া কর্তৃক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন। মায়ানমারের বিরুদ্ধে সমুদ্র বিজয়ে অবদান রাখার জন্য তিনি পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাদের এবং পররাষ্ট্রমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানান।[৬৫] সরকার প্রধান

হিসেবে অবদান রাখার জন্য তিনি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকেও ধন্যবাদ জানান। ধন্যবাদ প্রদান ছিল খালেদা জিয়া এবং বিরোধী দলের একটি প্রশংসনীয় পদক্ষেপ। কিন্তু কয়েক দিন পর বিএনপি-র ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক মির্জা ফখরুল ইসলাম 'সমুদ্রজয়ে কিছুটা বিভ্রান্ত হয়েছিলাম' এবং 'না-জেনে ধন্যবাদ দিয়েছিলাম', এসব বলে ধন্যবাদ প্রত্যাহার করে নেন।[৬৬] বিএনপি-র পক্ষ থেকে ধন্যবাদ প্রত্যাহার ছিল একটি অসৌজন্যমূলক সিদ্ধান্ত।

নবম জাতীয় সংসদে বিরোধী দলের সক্রিয় অংশগ্রহণ না-থাকায় সরকার দলীয় সদস্যদের দ্বারা মন্ত্রীরা বেশ কয়েকবার তীব্রভাবে সমালোচিত হয়েছেন। ২০১২ সালের ৩০ মে প্রশ্ন-উত্তর পর্বে নদীর ভাঙ্গন রোধে পানিসম্পদ মন্ত্রী রমেশচন্দ্র সেনের ব্যর্থতা[৬৭] নিয়ে আলোচনা, সোনালী ব্যাংকের হলমার্ক কেলেংকারি প্রসঙ্গে অর্থমন্ত্রী এ. এম. এ. মুহিতের করা মন্তব্যের[৬৮] প্রতিবাদে ৫ সেপ্টেম্বর ২০১২ সালে সাংসদদের প্রতিক্রিয়া, 'স্বাস্থ্য ব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়ায়' ৭ ফেব্রুয়ারি ২০১২ সালে স্বাস্থ্যমন্ত্রীর কঠোর সমালোচনা,[৬৯] শেয়ারবাজার বিপর্যয় রোধে ব্যর্থতার জন্য ৬ ফেব্রুয়ারি ২০১২ সালে সরকারের বিরোধিতা,[৭০] সারাদেশের বেহাল যোগাযোগ ব্যবস্থা নিয়ে ১৮ আগস্ট ২০১১ সালে যোগাযোগ মন্ত্রী আবুল হোসেনকে সরকার দলীয় সাংসদদের তীব্র সমালোচনা[৭১] ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। নির্বাহী বিভাগের জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠায় সংসদের তদারকি (oversight) ভূমিকার দিক থেকে বিবেচনা করলে সাংসদদের এসব প্রতিক্রিয়া/সমালোচনার গুরুত্ব রয়েছে।

১৪. নারী ও নবম জাতীয় সংসদ

নবম জাতীয় সংসদে নারী সদস্যদের সংখ্যা উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বৃদ্ধি পায়। সাধারণ ও সংরক্ষিত আসন মিলে মোট ৬৯ (১৯.৭১%) জন নারী নবম জাতীয় সংসদের সদস্য হন। ১৯ জন সদস্য সাধারণ আসন থেকে প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত হন। এদের ১৪ জন আওয়ামী লীগের, ৩ জন বিএনপি-র এবং ২ জন জাতীয় পার্টির। সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনী নারীদের জন্য সংরক্ষিত আসনের সংখ্যা ৪৫ থেকে ৫০-এ উন্নীত করে এবং সাধারণ আসন থেকে নির্বাচিত সদস্যদের দ্বারা আনুপাতিক প্রতিনিধিত্ব পদ্ধতির ভিত্তিতে একক হস্তান্তরযোগ্য ভোটের মাধ্যমে নির্বাচনের বিধান যুক্ত করে। এর ফলে নবম জাতীয় সংসদে সংরক্ষিত আসনের ৫০ সদস্যের ৪১ জন আওয়ামী লীগ, ৫ জন বিএনপি এবং ৪ জন জাতীয় পার্টি থেকে নির্বাচিত হন।

পঞ্চম, সপ্তম ও অষ্টম জাতীয় সংসদে দু'জন নারী সংসদ নেতা ও বিরোধী দলের নেতা হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। নবম সংসদেও এই ধারাবাহিকতা অব্যাহত থেকেছে। শুধু তা-ই নয়, এই সংসদে একজন নারী স্পীকার নির্বাচিত হয়েছেন। অন্য একজন নারী সংসদের উপনেতা হিসেবে কাজ করেছেন। এভাবে সংসদের কাঠামোগত নেতৃত্ব নারীদের দ্বারা পরিচালিত হয়েছে। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের আইনসভায় ১৯.৭১ শতাংশ বা তার চেয়ে বেশি সংখ্যক নারী সদস্য থাকতে প্রায়ই দেখা যায়। কিন্তু বাংলাদেশের নবম জাতীয় সংসদের মতো আইনসভার সামগ্রিক নেতৃত্বের ভূমিকায় নারীদের এমন প্রাধান্য দেখা যায়

না। কিন্তু বাংলাদেশের সংসদে নারীদের এই নেতৃত্বে অবস্থান দেশের নারীর ক্ষমতায়ন ও উন্নয়নে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছে এটা বলা যাবে না। নারীরা তাদের সংসদীয় ভূমিকার মাধ্যমে বৃহত্তর নারী সমাজের অগ্রগতি, দেশের সামগ্রিক উন্নয়ন এবং রাজনীতির প্রগতিশীল রূপান্তর ও উন্নয়নে বিশেষ কোনো দৃষ্টিভঙ্গি চর্চা এবং প্রয়াস নিয়েছেন এটাও দাবি করা যাবে না; যদিও সাধারণ নারী সদস্যদের বিভিন্ন সময় নারীস্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয় সংসদে উত্থাপন করতে দেখা গেছে। সাধারণভাবে নারী সদস্যদের সংসদে কার্যকর ভূমিকা রাখতে না-পারার জন্য 'নির্বাচনী ব্যবস্থা ও মনোনয়ন পদ্ধতি, প্রতিনিধিত্বশীলতার অভাব, সংসদে অধস্তনতা, প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে নির্বাচিত নারী সাংসদগণের মধ্যে সময়ন্বয়হীনতা, সংরক্ষিত আসনের সাংসদগণকে সহযোগিতা ও শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে অভিজ্ঞ নারী সদস্যদের আগ্রহের অভাব, নারী সাংসদগণের মধ্যে দলগত বিভাজন'[৭২] ইত্যাদি কারণ হিসেবে বিবেচিত হয়। নবম জাতীয় সংসদের ব্যাকবেঞ্চার নারী সদস্যরা উপর্যুক্ত কারণগুলো ছাড়াও নিজেদের মধ্যে অসংসদীয় ও অশালীন বাক্য বিনিময়ের জন্য তাদের সাফল্য ও ভূমিকার কার্যকারিতার প্রশ্নটিকে অনুজ্জ্বল ও ম্লান করেছেন।

১৫. উপসংহার

নবম জাতীয় সংসদে বিরোধী দল ও জোটের তুলনায় সরকারী দল ও জোটের বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ আসন লাভ দুই পক্ষের মধ্যে চরম সংখ্যা-বৈষম্য তৈরি করে। বিরোধী দলের সংখ্যাগত দুর্বল অবস্থান সংসদ কক্ষে প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ সম্পর্কের জন্য একটি অন্তরায় বলে বিবেচিত হয়। বিরোধী দল উদ্যম হারিয়ে শুরু থেকেই সংসদের প্রতি নেতিবাচক মনোভাব পোষণ করতে থাকে। নবম সংসদের নির্বাচিত সদস্যদের প্রায় সবাই সমাজের উচ্চবিত্ত ও ধনিক শ্রেণীর লোক। এজন্য এই সংসদ 'ধনীদের ক্লাব' বা 'ব্যবসায়ী শিল্পপতিদের বিচরণভূমি' বলে পরিচিতি পায়।[৭৩] সমাজের সকল স্তর ও পেশার মানুষের প্রতিনিধি না-থাকায় এটা প্রতিভাত হয় যে জাতীয় সংসদের প্রতিনিধিত্বমূলক চারিত্র (representative character) বৈচিত্রহীন, অনাকর্ষণীয় ও একপেশে। ফলে সংসদের কাছে সমাজের সাধারণ বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর প্রত্যাশার পরিসরও সীমিত হয়ে পড়ে। পঞ্চম, সপ্তম ও অষ্টম সংসদে বিরোধী দল অনুসৃত সংসদ বর্জন ও উপর্যপুরি ওয়াকআউটের কৌশল নবম সংসদেও অব্যাহত থেকেছে। শুধু তাই নয়, এই সংসদে বর্জনের নতুন রেকর্ডও সৃষ্টি করা হয়েছে। পূর্ববর্তী সংসদগুলোতে সরকারী দলের পক্ষ থেকে বিরোধী দলকে সংসদে ফিরিয়ে আনার ব্যাপারে কিছু আন্তরিক উদ্যোগ ছিল। কিন্তু নবম সংসদে আমলে এমন প্রয়াস সরকারী দল নেয়নি যাতে প্রতীয়মান হয় যে তারা বিরোধী দলকে সত্যিই সংসদে ফিরে পেতে চায়। সদস্যদের অসংসদীয় আচরণ নিয়ন্ত্রণের দিক থেকেও নবম সংসদ কোনো অগ্রগতি নির্দেশ করে না। এই সংসদে কয়েকজন নারী সদস্য তাদের অসংসদীয় আচরণ ও অশালীন বাক্য বিনিময়ের জন্য তীব্রভাবে সমালোচিত হয়েছেন। এই সংসদ রেকর্ডসংখ্যক আইন পাস করেছে। প্রায় সকল আইনই সরকার পরিকল্পিত ও উপস্থাপিত।[৭৪] ফলে আইন প্রণয়নে

বেসরকারী ও ব্যাকবেঞ্চার সদস্যদের চিন্তা, উদযোগকে উৎসাহিত করে সংসদের সামগ্রিক আইন প্রণয়ন সক্ষমতা বাড়ানোর লক্ষণ দেখা যায়নি। নবম সংসদ শুরুতেই সংসদীয় কমিটিগুলো গঠন করে। কিন্তু অনেক গুরুত্বপূর্ণ কমিটি বৈঠক অনুষ্ঠান, সরকারী কার্যক্রম তদারকি, আইন প্রণয়ন, জনস্বার্থে উদ্যোগ গ্রহণ ইত্যাদি ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখতে পারেনি। বিতর্ক পার্লামেন্টের প্রাণ। অথচ এই সংসদে কোনো বিষয়ে প্রাণবন্ত ও অনুকরণীয় কোনো বিতর্ক অনুষ্ঠিত হয়নি।

বাংলাদেশ একটি পুরনো সমাজ কিন্তু নতুন রাষ্ট্র। সংসদীয় ব্যবস্থার সঙ্গে বাংলাদেশের পরিচিতি দেড় শতাধিক (১৮৬২-২০১৪) বছর থেকে। ব্রিটিশ আমলে সংসদীয় রীতি/কাঠামো প্রবর্তনের প্রধান লক্ষ্য ছিল ঔপনিবেশিক শাসনকে এক ধরনের উদারনৈতিক ও গণতান্ত্রিক প্রলেপ দেওয়া। স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম সাড়ে তিন বছর পর দেড় দশক জাতীয় সংসদ মূলত সামরিক শাসনকে বৈধতার সনদ দেওয়ার জন্য ব্যবহৃত হয়েছে। ১৯৯০ সালের গণতান্ত্রিক আন্দোলনের বিজয়ের পর সংসদীয় ব্যবস্থার প্রতি ব্যাপক জনমত গঠিত হয় এবং এই পটভূমিতে সংবিধানের দ্বাদশ সংশোধনীর মাধ্যমে সংসদীয় ব্যবস্থা পুনঃপ্রবর্তিত হয়। এই দিক থেকে বিচার করলে দেখা যায়, সংসদীয় রীতিনীতির সঙ্গে দীর্ঘদিনের পরিচিতি থাকলেও বাংলাদেশে পরিপূর্ণ সংসদীয় ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার প্রয়াস মাত্র আড়াই দশকের। এই সময়ে চারটি জাতীয় সংসদ পূর্ণ মেয়াদ টিকে থেকেছে, কিছু নতুন সংসদীয় উপায় (devices)[৭৫] উদ্ভাবন ও প্রয়োগ করেছে। মাত্র দুই/আড়াই দশকেই একটি সংসদীয় ব্যবস্থা কার্যকর ও সাবলীলভাবে গড়ে উঠবে এটা যেমন অতি-প্রত্যাশা তেমনি একটি দেশের সংসদ বছরের পর বছর একই দুষ্টচক্রের আবর্তে (নির্বাচন-সংসদ গঠন-বিরোধী দলের বর্জন-কিছু সাংসদের অসংসদীয় আচরণ-সরকারী পক্ষের একাধিপত্য-অকার্যকর কমিটি ব্যবস্থা-বিরোধী দলের অবদানহীন আইন প্রণয়ন-আনুষ্ঠানিক মেয়াদপূর্তি) ঘুরপাক করতে থাকবে এটাও কাম্য নয়। সরকারী ও বিরোধী দলের সদস্যরা এমন উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেননি যাতে বলা যাবে যে, নবম সংসদ এই দুষ্টচক্র থেকে বের হয়েছে। বাংলাদেশে এখন ক্ষমতায় টিকে থাকা এবং ক্ষমতায় যাওয়ার বৃহত্তর কৌশলের অংশ হিসেবে সংসদকে বিবেচনা করা হয়। রাজনীতিবিদদের কাছে জাতীয় সংসদ একটি উপায় (mean), অথচ সংসদীয় ব্যবস্থায় সংসদই কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠান হওয়া উচিত। সংসদের প্রতি রাজনীতিবিদদের দৃষ্টিভঙ্গিতে পরিবর্তন না-ঘটলে জাতীয় সংসদকে এভাবে দুষ্টচক্রের আবর্তেই ঘুরপাক খেতে হবে।

তথ্যনির্দেশ

---

১ Gabrial A. Almond and G. Bingham Powell Jr-এর ধারণা, Quoted in Najma Chowdhury, *The Legislative Process in Bangladesh: Politics and Functioning of the East Bengal Legislature 1947-58*, University of Dacca 1980, Dhaka, p. 11

২ Shamsul Huda Harun, *Parliamentary Behaviour in a Multi-National State 1947-58: Bangladesh Experience,* Asiatic Society of Bangladesh, 1984, Dhaka, p. i

৩ দেখুন, Najma Chowdhury, *op. cit,*. p. 11

৪ এর আগে পঞ্চম সংসদ ৪ বছর ৮ মাস, সপ্তম জাতীয় সংসদ ৫ বছর এবং অষ্ঠম সংসদ ৫ বছর টিকে থেকে স্বাভাবিকভাবে বিলুপ্ত হয়। অন্য সংসদগুলোর মেয়াদপূর্তির আগেই বিলুপ্তি ঘটে।

৫ দেখুন, দৈনিক *বাংলাদেশ প্রতিদিন*, ঢাকা, ১ মে ২০১৩

৬ দেখুন, *পূর্বোক্ত*

৭ দেখুন, মিজানুর রহমান খান, "সংসদীয় গণতন্ত্রের প্রতি উপহাস", দৈনিক *প্রথম আলো*, ঢাকা, ১ মে ২০১৩

৮ দৈনিক *প্রথম আলো*, ঢাকা, ১ মে ২০১৩

৯ দেখুন, *The Daily Star*, Dhaka, 1 May 2013

১০ দেখুন, দৈনিক *প্রথম আলো* (সম্পাদকীয়), ঢাকা, ২ জুলাই ২০১৩

১১ পঞ্চম ও সপ্তম জাতীয় সংসদের স্পীকারের রুলিং সম্পর্কিত বিশেণ্ডষণ জানতে দেখুন, Jalal Firoj, *Democracy in Bangladesh: Conflicting Issues and Conflict Resolution*, Bangla Academy, 2012, pp. 190-192

১২ বিচারপতির মন্ডব্য, সংসদ সদস্যদের প্রতিক্রিয়া এবং স্পীকারের রুলিং নিয়ে এই প্রবন্ধের পরবর্তী একটি অংশে (বিতর্কিত ইস্যুসমূহ, রুলিং এবং নাগরিক সমাজ) আলোচনা করা হয়েছে।

১৩ See, *The Daily Star*, Dhaka, 30 March 2012

১৪ Ranjit Basu, *Speaker's Rulings and Decisions*, Biswa Jnan, Calcutta 1983, p. 13

১৫ ওয়াকআউট ও বয়কট সম্পর্কিত বিস্ডৃত আলোচনার জন্য দেখুন, Jalal Firoj, "Walkouts and Boycotts from the Fifth and the Seventh Parliaments of Bangladesh: Trends, Causes and Impacts", *The Journal of Social Studies*, No. 135, July-September 2012, Centre for Social Studies, Dhaka

১৬ খালেদা জিয়ার এই ভাষণকে বাংলাদেশের ইতিহাসে কোনো বিরোধী দলীয় নেতার সংসদে দেওয়া দীর্ঘতম ভাষণ বলে উলেণ্ডখ করা হয় (দেখুন, দৈনিক *বাংলাদেশ প্রতিদিন*, ঢাকা, ২১ মার্চ ২০১২)।

১৭ বিদায়ী স্পীকার জমিরউদ্দিন সরকার বিরোধী দলের জন্য নির্ধারিত প্রথম সারির দশটি আসনের ৯টি বিরোধী দল বিএনপি এবং একটি এলডিপি-কে প্রদান করেন। দায়িত্ব নিয়ে নতুন স্পীকার আবদুল হামিদ সরকারী দলের সঙ্গে আলোচনা করে বিএনপি-কে ৪টি, জাতীয় পার্টিকে ২টি, ওয়ার্কার্স পার্টিকে ১টি, জাসদকে ১টি, এলডিপি-কে ১টি এবং সাম্যবাদী দলকে ১টি আসন প্রদান করেন। বিএনপি এই বিন্যাসের প্রতিবাদ করে (দেখুন, দৈনিক *প্রথম আলো*, ঢাকা, ২৯ জানুয়ারি ২০০৯)।

১৮ মন্ত্রী উলেণ্ডখ করেন যে, 'খুনি মোশতাক-জিয়া চক্র স্বাধীনতাবিরোধী জামায়াত-শিবিরকে লালনপালন এবং রাজনৈতিকভাবে পুনর্বাসন করছে।' বিরোধী দল মন্ত্রীর এই বক্তব্যের প্রতিবাদ করে (দেখুন, দৈনিক *প্রথম আলো*, ঢাকা, ১২ ফেব্রুয়ারি ২০১০)।

১৯ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এবং রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানকে নিয়ে উভয় পক্ষের সদস্যদের পাল্টাপাল্টি কটূক্তির ফলে জাতীয় সংসদে এই দিন এক চরম অচলাবস্থা দেখা দেয়। একটি সংবাদপত্র এই বিষয়ের সংবাদের শিরোনাম করে '10 minutes's shock at JS' (See, *The Daily Star*, Dhaka, 4 March 2010).

২০ দেখুন, দৈনিক *প্রথম আলো*, ঢাকা, ১১ মার্চ ২০১০

২১ এম. আবদুল লতিফের এই ওয়াকআউট এক বিরল ঘটনা বলে আলোচিত হয় (দেখুন, দৈনিক *প্রথম আলো*, ঢাকা, ২৪ জুন ২০১৩)।

২২ এই অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে: কোন সংসদ-সদস্যের আসন শূন্য হবে, যদি সংসদের অনুমতি না লইয়া তিনি একাদিক্রমে নব্বই বৈঠক-দিবস অনুপস্থিত থাকেন।

২৩ A. N. M. Nurul Haque, "Parliament boycott also repeats", *The Daily Star*, Dhaka, 26 October 2009

২৪ দেখুন, দৈনিক *প্রথম আলো*, ঢাকা, ২৭ জানুয়ারি ২০১৩

২৫ দেখুন, *The Daily Star*, Dhaka, 12 February 2013

২৬ দেখুন, Daily *New Age*, Dhaka, 3 June 2013

২৭ পার্লামেন্টে অশালীন ও অসংসদীয় উচ্চারণ ও আচরণ সম্পর্কিত তাত্ত্বিক আলোচনা এবং বাংলাদেশের পঞ্চম ও সপ্তম জাতীয় সংসদে সদস্যদের অসংসদীয় আচরণের উপর বিস্তৃত বিশেণ্ঢষণের জন্য দেখুন, Jalal Firoj, "Conflicting Democracy in Bangladesh: Un-parliamentary Expression in Parliaments 1991-2001: Causes, Trends and Consequences", paper presented at Second International Congress of Bengal Studies, 18 December 2011, University Of Dhaka, Dhaka.

২৮ সৈয়দ আবুল মকসুদ, "বাঙালি নারীর মুখ", দৈনিক *প্রথম আলো*, ঢাকা, ২৬ জুন ২০১৩

২৯ Amir Khasru and Tarik Hasan, "Parliament or monkey-house?", *Holiday*, Dhaka 2 July 1999

৩০ সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম, "সংসদে 'ক্রসফায়ার", দৈনিক *প্রথম আলো*, ঢাকা, ২৬ জুন ২০১৩

৩১ সরকার দলীয় সদস্য জুনায়েদ আহমেদ প্রস্তাব উত্থাপন ও নোটিশ প্রদান করেন (দেখুন, দৈনিক *প্রথম আলো*, ঢাকা, ২৬ জুন ও ১৬ জুলাই ২০১৩)।

৩২ পাসকৃত তিনটি বেসরকারী বিল হলো: লেপার্স (রিপিল) এক্ট ২০১১ (সাবের হোসেন চৌধুরী, আওয়ামী লীগ), নির্যাতন এবং হেফাজতে মৃত্যু (নিরারণ) ২০১৩ (সাবের হোসেন চৌধুরী, আওয়ামী লীগ) এবং পিতামাতার ভরণ পোষণ বিল ২০১৩ (মোঃ মুজিবুল হক, জাতীয় পার্টি)

৩৩ শাহদীন মালিক, "পঞ্চদশ সংশোধনী: উৎকটতার বর্ষপূর্তি", দৈনিক *প্রথম আলো*, ঢাকা, ৩ জুলাই ২০১২

৩৪ এই আইনে উপজেলা চেয়ারম্যানদের ক্ষমতা কমিয়ে সাংসদদের ক্ষমতা বাড়ানো হয়। এই আইন পাসের সময় উভয় পক্ষের সদস্যরা টেবিল চাপড়িয়ে তাদের সমর্থন ব্যক্ত করেন (দেখুন, দৈনিক *প্রথম আলো*, ঢাকা, ৭ এপ্রিল ২০০৯)

৩৫ আরও দেখুন, জালাল ফিরোজ, *পার্লামেন্ট কীভাবে কাজ করে: বাংলাদেশের অভিজ্ঞতা*, নিউ এজ পাবলিকেশন্স, ঢাকা ২০০৩, পৃ. ৪৬-৫১

৩৬ Quoted in Nizam Ahmed, *The Parliament of Bangladesh*, Ashgate, Burlington, England, 2002, p. 107

৩৭ বিএনপি-র এ. বি. এম. আশরাফ উদ্দিন (মিজান)-কে মৎস্য ও প্রাণী সম্পদ মন্ত্রণালয়, আবদুল মোমিন তালুকদারকে পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়, জাতীয় পার্টির আনিসুল ইসলাম মাহমুদকে প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, মোঃ মুজিবর রহমানকে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, জাসদের হাসানুল হক ইনুকে ডাক ও তার মন্ত্রণালয় এবং ওয়ার্কার্স পার্টির রাশেদ খান মেননকে শিক্ষা মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির সভাপতি করা হয়।

৩৮ তথ্য উৎস: বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ, ঢাকা

৩৯ কোনো সদস্য যদি তার উত্থাপিত প্রশ্নের মৌখিক উত্তর চান তাহলে তিনি প্রশ্নটির উপর তারকাচিহ্ন দেন। এ-ধরনের প্রশ্নকে তারকাচিহ্নিত প্রশ্ন বলে। যেসব প্রশ্নে তারকাচিহ্ন থাকে না সেগুলোকে তারকাচিহ্নবিহীন প্রশ্ন বলে। এসব প্রশ্নের লিখিত উত্তর দেওয়া হয় (আরও দেখুন, জালাল ফিরোজ, *পার্লামেন্টারি শব্দকোষ*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, দ্বিতীয় সংস্করণ ২০১০)।

৪০ Daily *New Age*, Dhaka, 9 January 2014

৪১ Rounaq Jahan, "The Parliament of Bangladesh: Challenges and Way Forward", *The Daily Star*, Dhaka, 3 June 2012

৪২ Shakhawat Liton, "Speaker crossed his jurisdiction", *The Daily Star*, Dhaka, 11 May 2012

৪৩ *Ibid.*

৪৪ দেখুন, দৈনিক *প্রথম আলো*, ঢাকা, ৪ জুন ২০১২

৪৫ দেখুন, *পূর্বোক্ত*

৪৬ দেখুন, *পূর্বোক্ত*

৪৭ দেখুন, *পূর্বোক্ত*

৪৮ *The Daily Star*, Dhaka, 11 June 2012

৪৯ *The Daily Star*, Dhaka, 6 June 2012

৫০ *Ibid.*

৫১ এই শব্দসমষ্টি প্রথম ব্যবহার করেন মার্কিন সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি ক্লারেন্স থমাস (Clarence Thomas) ১৯৯৭ সালে। বিচারপতি পদে নিয়োগ নিশ্চিত করার জন্য তাকে সিনেটের এক শোনানির মুখোমুখি হতে হয়। তখন তাঁর বিরুদ্ধে আনীত বিভিন্ন অভিযোগের জবাব দিতে গিয়ে তিনি 'high-tech lynching'-এর শিকার হচ্ছেন বলে উল্লেখ করেন। দেখুন, Abdullah A. Dewan, "Misuse of power, violation of free speech, and contempt of parliament", *The Daily Sun*, Dhaka, 11 June 2012

৫২ দৈনিক *প্রথম আলো*, ঢাকা, ৫ জুন ২০১২

৫৩ *The Daily Star*, Dhaka, 10 June 2012

৫৪ *The Daily Star*, Dhaka, 11 June 2012

৫৫ Mahfuj Anam, "An honourable act by the Speaker", *The Daily Star*, Dhaka, 13 June 2012

৫৬ দেখুন, মিজানুর রহমান খান, "অধ্যাপক সায়ীদের স্বস্তি, স্পীকারের অস্বস্তি", দৈনিক *প্রথম আলো*, ঢাকা, ১৩ জুন ২০১২

৫৭ দেখুন, দৈনিক *প্রথম আলো*, ঢাকা, ৬ জুন ২০১২

৫৮ দেখুন, *পূর্বোক্ত*

৫৯ দেখুন, *পূর্বোক্ত*

৬০ দেখুন, *পূর্বোক্ত*

৬১ ব্যারিস্টার আমির-উল-ইসলামের এই মন্তব্য করেন। দেখুন, *The Daily Star*, Dhaka, 20 June 2012

৬২ দেখুন, দৈনিক *প্রথম আলো*, ঢাকা,২৮ আগস্ট ২০১২

৬৩ দেখুন, দৈনিক *প্রথম আলো*, ঢাকা, ৫ সেপ্টেম্বর ২০১২

৬৪ দেখুন, *পূর্বোক্ত*

৬৫ দেখুন, দৈনিক *যুগান্তর*, ঢাকা, ২১ মার্চ ২০১২

৬৬ দেখুন, দৈনিক *প্রথম আলো*, ঢাকা, ৮ এপ্রিল ২০১২

৬৭ দেখুন, *The Daily Star,* Dhaka, 31 May 2012

৬৮ ৪ঠা সেপ্টেম্বর ঢাকার এক গোলটেবিল বৈঠকে অর্থমন্ত্রী বলেন: চার হাজার কোটি টাকার কেলেংকারি দেশের ব্যাংকিং খাতের জন্য কোনো বড়ো ব্যাপার না। It is a matter of Tk. 3000 or 4000 crore. Nonsense! সংসদে অর্থমন্ত্রীর এই মন্তব্যের সমালোচনা করা হয়। পরে তিনি সংসদে এই মন্তব্যের জন্য দুঃখ প্রকাশ করেন এবং নিজের মন্তব্য প্রত্যাহার করেন। দেখুন, *The Daily Star*, Dhaka, 5-7 September 2012

৬৯ দেখুন, *The Daily Star*, Dhaka, 8 February 2012

৭০ দেখুন, *The Daily Star*, Dhaka, 7 February 2012

৭১ দেখুন, দৈনিক *প্রথম আলো*, ঢাকা, ১৯ আগস্ট ২০১১

৭২ আল মাসুদ হাসানউজ্জামান, *বাংলাদেশে সংসদীয় গণতন্ত্র রাজনীতি ও গভর্ন্যান্স: ১৯৯০-২০০৭*, দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ঢাকা ২০০৯, পৃ. ৫৩

৭৩ জাতীয় সংসদের তৎকালীন স্পীকার আবদুল হামিদ তাঁর এক বক্তৃতায় উলেণ্ঢখ করেন যে, জাতীয় সংসদ সদস্যদের ৮০ শতাংশ শিল্পপতি ও ব্যবসায়ী। নির্বাচনে পয়সার জোরে শিল্পপতি ও ব্যবসায়ীরা জয়ী হন (দেখুন, দৈনিক *প্রথম আলো*, ঢাকা, ১৬ মে, ২০১২)। অধ্যাপক রেহমান সোবহান তাঁর এক বক্তৃতায় বাংলাদেশসহ দক্ষিণ এশিয়ার আইনসভাগুলোকে 'ধনীদের ক্লাব' এবং জনগণের ভোটের মাধ্যমে নির্বাচিত হলেও এসব স্থানে জনগণের স্বার্থ বিবেচিত হয় না বলে মত দেন (দেখুন, দৈনিক *প্রথম আলো*, ঢাকা, ৯ ডিসেম্বর, ২০১২)

৭৪ আইন প্রণয়নে সরকারী পক্ষ সকল আয়োজন করে, কেবল তা-ই নয়, কার্যত আইন প্রণয়ন একটি প্রশাসনিক কাজে পরিণত হয়েছে। নির্বাচিত আইনপ্রণেতাদের চেয়ে নির্বাহী বিভাগই এক্ষেত্রে প্রধান ভূমিকা পালন করে। এটা আইনসভার সদস্যরাও স্বীকার করেন। এই বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে ২৬ জুন ২০১২ একজন সাংসদ সংসদে উলেণ্ঢখ করেন, 'করণিকেরা আইন করেন, আমরা সাংসদেরা তা হ্যাঁ-না বলে পাস করে দেই' (দেখুন, দৈনিক *প্রথম আলো*, ঢাকা, ২৭ জুন ২০১২)।

৭৫ উদ্ভাবিত নতুন বিভিন্ন পার্লামেন্টারি উপায় (devices) সম্পর্কে জানতে দেখুন, Jalal Firoj, 2012, *op. cit.,* pp. 266-285

বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি পত্রিকা, দ্বাত্রিংশ খণ্ড, শীত সংখ্যা, পৌষ ১৪২১/ডিসেম্বর ২০১৪

হাসান আজিজুল হকের গল্পে গ্রামীণ জীবন ও প্রকৃতি

রওশন আরা*

সারসংক্ষেপ

হাসান আজিজুল হক (১৯৩৮) বর্তমান সময়ের বাংলা সাহিত্যের অন্যতম গল্পকার। তাঁর গল্পে উদ্বাস্তু সমস্যা, মধ্যবিত্তের নানামাত্রিক ধ্বস ও জীবনসংগ্রাম, মানুষের অবদমিত যৌন-আকাঙ্ক্ষা, দুর্ভিক্ষের কারণে সৃষ্ট মৃত্যুর বিভীষিকা, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার নৃশংসতা, যুদ্ধোত্তর আর্থনীতিক মন্দা, কালোবাজারীর রমরমা ব্যবসা ইত্যাদির ছবি যেমন পাওয়া যায়, তেমনি পাওয়া যায় গ্রামীণ মানুষের জীবন ও প্রকৃতির নানা বৈচিত্র্যময় ছবি। হাসান আজিজুল হক উনিশ'শ সাতচল্লিশ সালের দেশ-বিভাগের পর চুয়ান্ন সালে রাঢ়বঙ্গ পরিত্যাগ করে পূর্ববঙ্গে আশ্রয় গ্রহণ করেন। শৈশব ও কৈশোরে দেখা গ্রামীণ জীবন ও প্রকৃতিকে তিনি ভুলতে পারেননি এবং সেই সঙ্গে যোগ হয়েছে দ্বিতীয় আবাস খুলনার ফুলতলার গ্রাম-মানুষের জীবন ও সেখানকার প্রকৃতি। গ্রামীণ মানুষের জীবন ও প্রকৃতির সঙ্গে এই আত্মিক সম্পর্ক উত্তরকালে স্মৃতির আশ্রয়ে লেখকের জীবনে স্বর্ণখণ্ডের ন্যায় উজ্জ্বল হয়ে ক্রিয়াশীল থেকেছে। এ কারণেই তাঁর একাধিক গল্পে গ্রামীণ জীবন ও প্রকৃতির শিল্পসম্মত রূপ লক্ষ্য করা যায়। যা বর্তমান প্রবন্ধের আলোচনায় দেখানোর চেষ্টা করা হয়েছে।

হাসান আজিজুল হক উনিশ'শ সাতচল্লিশ সালের দেশ-বিভাগের পর চুয়ান্ন সালে রাঢ়বঙ্গ পরিত্যাগ করে পূর্ববঙ্গে আশ্রয় গ্রহণ করেন। এরই ফলে গ্রামবাংলার জীবন ও প্রকৃতির সঙ্গে তাঁর অন্তরঙ্গ পরিচয় গড়ে ওঠে।

হাসান আজিজুল হকের ছোটগল্পের জীবন, ভূ-প্রকৃতি ও প্রতিবেশ প্রভৃতি সম্পর্কে আলোকপাত করতে হলে তাঁর–'শকুন', 'তৃষ্ণা', 'একজন চরিত্রহীনের স্বপক্ষে', 'মন তার শঙ্খিনী', 'পরবাসী' এবং 'জীবন ঘষে আগুন' নামক বিখ্যাত কিছু গল্পের আলোচনা আবশ্যক। 'শকুন' গল্পটি যৌনতাকে আশ্রয় করে গড়ে উঠলেও সমাজের অবক্ষয়ের মূল কারণ যে আর্থ-রাজনীতিক জীবনের নানা অসঙ্গতি ও অসামঞ্জস্যের মধ্যেই নিহিত রয়েছে, লেখক তা স্পষ্টভাবে দেখিয়েছেন। এছাড়াও 'সুদখোর শোষকেরা আমাদের সমাজে অমঙ্গলের প্রতীক হিসেবে পরিচিত। শকুন যেমন মৃত প্রাণীর মাংসে জীবন-ধারণ করে থাকে, আমাদের সমাজেও তেমনি নিষ্ঠুর ধনিক শ্রেণী মৃতপ্রায় অসহায়, দুঃস্থ মানুষের উপর তাদের নগ্ন থাবা প্রসারিত করে থাকে'।[১] গ্রামের কয়েকটি ছেলে দিনের আলোয় ফিরতে-না-পারা একটি শকুনকে নিয়ে খেলায় মেতে উঠেছে। তাদের মত্ততার কবলে পড়ে শকুনটার শেষ পর্যন্ত মৃত্যু

* সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, ঢাকা ইমপিরিয়াল কলেজ, ঢাকা

হল। মৃত্যুর পূর্বে ছেলেরা খেলাচ্ছলে তার গা থেকে একটি একটি করে সমস্ত পালক খসিয়ে নিয়ে তাকে অসুন্দরের প্রতিমূর্তি বানিয়ে ফেলেছিল। তারপর ছেলেরা ক্লান্ত হয়ে ঢুলতে ঢুলতে গ্রামের মধ্যে ঢুকতেই তালগাছ ও ন্যাড়া বেল গাছের আবছা ছায়ায় সাদা মতো কী যেন দেখতে পেলো। সেটা অন্য কিছু নয়–কাদু শ্যাখের রাঁড় বোনের সঙ্গে জমিরুদ্দির অবৈধ যৌন মিলনের ফলে জাত একটি অপূর্ণাঙ্গ মানব শিশুর অস্পষ্ট দৃশ্য। কথাটি রাষ্ট্র হয়ে যেতেই মানুষ মৃত শিশুটির পাশে জড়ো হতে থাকে–আসে না শুধু কাদু শ্যাখের সেই রাঁড় বোনটি। গল্পকার গল্পের শেষে গিয়ে তার সম্পর্কে মন্তব্য করেন, 'দিনের চড়া আলোয় তাকে অদ্ভুত ফ্যাকাশে দেখাচ্ছে মরা শকুনটার মতই।'[২]

এখানে শকুনটিকে অত্যাচারী বা নিপীড়নকারীর প্রতীক হিসেবে দেখান হয়েছে। কয়েকজন ছেলের চেষ্টায় যখন শোষণকারীর মর্মান্তিক মৃত্যু হলো তখন তার চেহারাটাকে বীভৎস ও কদাকার মনে হলো। শকুনটিকে কিশোর বালকের দল প্রথম যখন দেখে সেই সময় শকুনটা 'মোল্লা' না 'মোড়ল' তা জানার ঔৎসুক্যের মধ্যে শোষকদের প্রতি তাদের ইঙ্গিত খুবই অর্থবহ হয়ে ওঠে। যদিও বালকদের কথায় শকুনের জাত নির্ণয়ের প্রচেষ্টাই আপাতদৃষ্টিতে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে, তবু তারা যখন শকুনটাকে নাড়াচাড়া করতে করতে এক পর্যায়ে তার সঙ্গে অত্যাচারী ও শোষণ-লিপ্সু হামবু-র বাবা ও সুদখোর অঘোর বোষ্টমের সাদৃশ্য দাঁড় করায়, তখন কিন্তু বুঝতে অসুবিধা হয় না যে ঐ মোল্লা-শকুন বা মোড়ল-শকুন আসলে আমাদের সমাজে বসবাসকারী শোষকশ্রেণীরই একজন ছাড়া আর কেউ নয়। অত্যাচারী হামবু-র জনক ও সুদখোর মহাজনের সঙ্গে সাদৃশ্য অনুভব করেই তারা চরম প্রতিশোধ নেওয়ার উদ্দেশ্যেই শকুনটার শরীর থেকে একটি একটি করে সমুদয় পালক খসিয়ে নিয়েছে। 'শোষক-বুদ্ধিজীবীদেরকে যে শকুনের মতো মনে করা হয় তা তারা তাদের ঘরে-বাইরের প্রতিবেশ থেকেই জেনেছে। তাই শোষণলিপ্সু বুদ্ধিজীবীদের প্রতীক ঐ শকুনটাকে হাতের মুঠোয় নিয়ে তাদের এতো উল্লাস'।[৩]

নিপীড়নকারী কিশোরেরা সমাজ পরিবর্তনের প্রক্রিয়া সম্পর্কে কিছুই জানে না, তবে তারা অনুভব করতে পারে যে, চারপাশে রয়েছে নির্দয় অমানবিকতা ও অসঙ্গতি। কিশোরেরা দেখতে পায় তাদের নিজেদের পিতার দুর্দশা, কিন্তু তার গূঢ়কারণ তখনও তাদের নিকট অনাবিষ্কৃত। তথাপি কদর্য শকুনটাকে দেখে রাগ হয়। কারণ শকুন ভাগাড়ে মরা গরু খায়, কুকুরের সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়। তাদের রাগের কারণ বোঝাবার জন্য তারা পরিচিত জগৎ থেকে উপমা সংগ্রহ করে, যা সমালোচকের দৃষ্টিতে:

> সুদখোর মহাজনের চেহারার কথা মনে হয় ওকে দেখলেই। নইলে মহাজনকে লোকে শকুন বলে কেন! কেন মনে হয় শকুনটার বদহজম হয়েছে। যে ধূসর রংটা দেখলেই মন দমে যায় তার সঙ্গেই এর রং-এর এত মিল থাকবে কেন। প্রায়-জীবন্ত ফেলে দেওয়া যে শিশুগুলোকে গর্তে, খানা-ডোবায়, তেঁতুলতলায় ছেলেরা দেখে, না বোঝার যন্ত্রণায় মন যখন হু হু করে ওঠে, তখন

> তাদের কচিমাংস খেতে এর এত মজা লাগে কিসের! গল্পের শেষে ছেলেদের অত্যাচারে মৃত শকুন ও অর্ধস্ফুট মানবশিশু যোগসূত্রে বাঁধা পড়ে যায়। এই অবৈধ মানবশিশুর মাধ্যমে লেখক সামাজিক শোষণের উপস্থিতি সম্পর্কে সচেতনতার স্বাক্ষর রাখেন, যে শোষণ বিভিন্ন সময়ে বিভিন্নভাবে আগ্রাসী হয়, অর্ধস্ফুট মানবশিশু তারই একটা পরিণতি। হাসান আজিজুল হক এ গ্রন্থে যে সময় ও সমাজের কথা বলেন তার সর্বত্রই গ্রহণগ্রস্ত। কিন্তু এই অবক্ষয়গর্ভা সমাজের মধ্যেও সুচেতনার জন্ম নেয় এবং প্রতিবাদের স্ফুরণ ঘটে। কিশোর ছেলেদের বিক্ষুব্ধ অভিমান লেখকেরই সচেতন মনের অঙ্গীকার–উৎপীড়কের বিরুদ্ধে এই দলবদ্ধ আক্রমণ প্রতিরোধে মুক্তির বোধ গল্পটিতে আভাসিত হয়—এই মুক্তির বোধই হাসান আজিজুল হকের অন্বিষ্ট।[৪]

হাসান আজিজুল হক আলোচ্য গল্পে বিবর্ণ-পাংশুল সমাজজীবনের বৃত্তান্ত নিয়ে উপস্থিত হয়েছেন। শোষণক্লিষ্ট সামাজিক চরিত্রকে লক্ষ্য করে তাঁর সত্যোচ্চারণ: 'শকুন শকুনের মাংস খায় না।' এই উক্তির মাধ্যমে তিনি সমাজের শ্রেণীবিভক্ত বাস্তবতাকে চিহ্নিত করেন। সমাজে অবস্থিত দুটি শ্রেণীর মধ্যে সংখ্যায় যেটি গুরু তিনি তাদের জীবনকে তাঁর গল্পের উপজীব্য করেন। এ প্রসঙ্গে তাঁর নিজের উক্তি:

> আমি যাদের কথা বলতে চাই তারা হচ্ছে আমাদের দেশের শতকরা ৯৫ ভাগ। আমার রাজনৈতিক বিশ্বাসটা তাহলে কি? এই ৯৫ ভাগ মানুষকে মুক্ত করতে হবে। আমার রাগের কারণ কি? আমার ক্রোধের কারণ কি? এই ৯৫ ভাগ মানুষের প্রতিভা ও কর্মশক্তির কোন বিকাশ নেই এই সমাজে। ৯৫ ভাগ মানুষ এদেশে চাপা পড়ে আছে। এত বড় অন্যায় ও অমানবিকতা একজন লেখক যদি অনুধাবন করতে না পারেন তবে তিনি কিসের লেখক?[৫]

সমাজের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের কথা বলতে গিয়ে তিনি তাদের বিরুদ্ধ শ্রেণীর কথাও বলেছেন এবং কার্য-কারণ পরম্পরার এই দুটি শ্রেণীর মধ্যকার দ্বন্দ্ব-সংঘাতকে উপস্থিত করেছেন। তাঁর গল্পে প্রতিফলিত হয়েছে গ্রামীণ ও নগর বাংলার নিম্ন মধ্যবিত্ত, মধ্যবিত্ত এবং সাধারণ নিরন্ন কৃষক-শ্রমিক জীবনের প্রাত্যহিক বাস্তবতা।

'তৃষ্ণা' গল্পের প্রধান চরিত্রের জীবনে কোনো স্বপ্ন নেই, লক্ষ্য নেই—শুধু যেন অবক্ষয়ের স্রোতে সে ভাসমান। লক্ষ্যহীন জীবনে কখনো উদগ্র হয়ে ওঠে কামুকতা, কখনো নির্লজ্জ পেটুকতা। ক্ষয়িষ্ণু সমাজের প্রতীক হিসেবে অবধারিতভাবেই বাশেদকে জারজ সন্তানরূপেই অবতীর্ণ হতে হয়। প্রবল কামুকতা ও মাত্রাহীন পেটুকতার অতৃপ্ত-জ্বালায় সর্বদাই তার হৃদয় বিদীর্ণ হয়েছে। অচরিতার্থ কামনা-বাসনা তাকে বারংবার দিকভ্রষ্ট করেছে। সে পেট পুরে কোনোদিন আহার করার সুযোগ লাভ করেনি—তাই সে স্বপ্ন দেখে তার চারপাশে সর্বদাই যেন ভুরি ভোজনের আয়োজন চলছে। বাশেদ শুধু পেটের ক্ষুধায় যন্ত্রণাকাতর হয় না, সে যৌনক্ষুধায়ও দারুণভাবে ছটফট করে। কিন্তু স্বাভাবিকভাবে সে-ক্ষুধা মিটাতে হলে সমাজে বিয়ে করার যে রীতি প্রচলিত আছে তা তার পক্ষে সম্ভব নয়—কারণ সামাজিক জীবনে তার কোনো আর্থিক সঙ্গতি ও মর্যাদা নেই। তাই অস্বাভাবিক পথ ধরেই বাশেদ তার যৌনক্ষুধা চরিতার্থ করার জন্য দুর্দমনীয় এক আবেগে ফেটে পড়ে। গ্রামের মাতব্বরের ছেলে সোহরাব যখন মাত্র তিন আনার বিনিময়ে গ্রামের সখি নামের মেয়েটির সঙ্গে সঙ্গমের ব্যবস্থা পাকা করে ফেলে, তখন বাশেদের সারা শরীরে কামাগ্নি প্রজ্বলিত হয়ে ওঠে। সে তখন মনে মনে চার

আনায় সখিকে পাবার কল্পনা করে, কিন্তু সঙ্গমের পূর্বেই বাশেদ এক পর্যায়ে শরীরের সমস্ত শক্তি হারিয়ে ফেলে মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই করতে থাকে। লেখকের ভাষায় :

> বাশেদ প্রাণপণ চেষ্টায় উঠে দাঁড়াল। আর কিছু সে চিন্তা করতে পারল না। অন্ধ একটা শক্তি তাকে টেনে নিয়ে চলল। উঁচু নিচু মাটিতে তার পা কাঁপতে লাগল আর সেই প্রবৃত্তিতাড়িত পদক্ষেপ বেসামাল হতে হতে কখন এসে পড়ল একটা গর্তের মধ্যে। বিশাল তালগাছের মত বাশেদ মাটিতে পড়ল আর গড়িয়ে চলল ঢালু পাড় বেয়ে কিংবা বলা যায়, একটা তীক্ষ্ণ তীব্র মৃত্যুর মত অমোঘ প্রবৃত্তি গড়াতে গড়াতে এগিয়ে চলল ঢালু পাড় বেয়ে, তার মৃত্যুর দিকে।[৬]

সঙ্গমের বাসনা চরিতার্থ হবার আগেই ঢ্যাঙ্গা বাশেদ, অবং বাশেদ মারা যায়। দারুণ অবক্ষয়ের সন্তান এই ঢ্যাঙ্গা বাশেদ—তার জীবনের সমুদয় আচরণ ও স্বভাব বিকৃত, ধিকৃত ও নিন্দিত। লেখক নিজেই সেই অবক্ষয়ের পরিচয় দিয়েছেন:

> ঠিক ঢালুটার নিচে জমির কিনারায় উলঙ্গ, বিবর্ণ, নোংরা মৃতদেহটি পড়ে রয়েছে। এইটুকু সময়ের মধ্যেই যেন ভিতরে ভিতরে দুর্গন্ধে মৃতদেহটি ভরপুর হয়ে উঠেছে।[৭]

বাশেদ এই সমাজের একজন প্রতিনিধি। জীবিকার চিন্তাই যার কাছে প্রধান সমস্যা। তার কাছে আহারের চিন্তাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু অস্তিত্বের সংগ্রামে শেষ পর্যন্ত সে টিকে থাকতে পারেনি। প্রতিকূল স্রোতে সে মৃত্যুবরণ করেছে। আবার এই সমাজের মধ্য থেকে জেগে ওঠে প্রতিবাদী মানুষ, যারা সেই প্রতিকূলতাকে জয় করতে সচেষ্ট। হাসান আজিজুল হকের গল্পের মধ্যবিত্ত মানুষেরা বিপর্যয়গ্রস্ত। জীবনযুদ্ধে টিকে থাকতে না পেরে তারা হিমশিম খাচ্ছে অথবা আত্মহত্যার মাধ্যমে জীবন থেকে পালিয়ে বাঁচতে চাইছে। তারা দেখতে পায়: 'জীবনটা জীর্ণ ন্যাকড়ার মত বাতাসে উড়ছে। সুকুমার হৃদয়বৃত্তি তাদের জীবনে প্রহসনের নামান্তর'।[৮]

'একজন চরিত্রহীনের স্বপক্ষে'র মধ্যেও 'তৃষ্ণা' গল্পের ন্যায় একই অসুস্থতা, একই বিকৃতি, একই বিবর্ণ ও বিস্বাদ জীবনের পরিচয় ফুটে উঠেছে। অর্থাৎ, 'মধ্যবিত্ত প্রৌঢ়প্রায় সতীনাথের অতৃপ্ত যৌনজীবন, পারিবারিক সম্পর্কের বাইরে পরস্ত্রী ভামিনীর সঙ্গে অবৈধ যৌন সম্পর্কের নানাদিক এবং তার মানসিক বিকৃতি ও অস্থিরতার কাহিনি গল্পে উপস্থাপিত। প্রতিপত্তি ও প্রভূত ভূ-সম্পত্তির অধিকারী ব্যক্তি গ্রামীণ সমাজে অর্থের বিনময়ে রক্ষিতা পুষতে পারে তার নিদর্শন সতীনাথ'।[৯] তাই লেখক বলেন:

> অজ পাড়াগাঁয়ে খারাপ পাড়া বলে নির্দিষ্ট কিছু নেই। মাঝে মাঝে দুটি একটি হাড়ি ডোম বাউরি কিংবা বাগ্দী মেয়ে মানুষ কুল ছিটকে রাণ্ডি হয়ে যায়। সেটা বেশি দৃষ্টিকটু হয়ে উঠলে ছোটলোক পাড়াতেও তার জায়গা নেই। বলে, শালী সতী লয়। রেখে ঢেকে করলে ভাবনা নেই অবশ্য।[১০]

ক্ষয়িষ্ণু সমাজের চারপাশের আবেষ্টনী এই গল্পের নায়ক সতীনাথকে সুস্থ চিন্তার অধিকারী করেনি–তার বাবা-মাও তাকে পরিশীলিত মানসিকতার অধিকারী করে গড়ে তোলার প্রয়াস নেয়নি। চরিত্র হননের মধ্য দিয়ে পরিতৃপ্তিলাভকেই সে তার জীবনের একমাত্র লক্ষ্য বলে ধরে নিয়েছে, যা গল্পে ফুটে উঠেছে এভাবে:

> সতীনাথ রাত নটার সময় ঝিমোয় আর তেঁতুলগাছের জটলার মধ্যে কুঁড়েটার কথা ভাবে। মেয়েমানুষটা তো থল থলে হয়ে এল। মেয়েমানুষ যে এবার নোংরা মাগী হয়ে গেল।...যা ভাবে

> তা তো আর প্রকাশ করা যায় না। হয়তো অনেকদিন টাকা দিয়ে আসছে, শাড়ি, শেমিজ দিয়ে আসছে, তেলটা নুনটা দিচ্ছে, তাই মেয়েমানুষটার কাছে যা ভাবে, যা করবে বলে ভাবে, যত নোংরাই হোক সে বলতে পারে ...তার পাশে শুয়ে মুখ থেকে আঁচলটা সরালেই সতীনাথের গা ঘিন ঘিন করবে।[১১]

'পরবাসী' গল্পে লেখক যেন নিজেই পাঠকদের সামনে হাজির হয়েছেন। ব্যক্তিগত জীবনে হাসান আজিজুল হক নিজে জন্মভূমি ছাড়তে বাধ্য হয়েছিলেন। দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে পাকিস্তান খণ্ডিত হবার সঙ্গে সঙ্গে দু'টি সম্প্রদায়ের মানুষের স্নেহ-ভালোবাসায় চিড় ধরেছিল। একজন আরেকজনকে আক্রমণ করার জন্য যেন ওঁৎ পেতে ছিল। হঠাৎ একদিন একে অপরের সাজানো ফুলের বাগানের মতো সংসারকে তারা লণ্ডভণ্ড করে দেয়। জীবনকে করে বিপন্ন। জীবনকে বিপন্ন করলেও রাঢ় মানুষেরা ছিল অন্যরকম। যে প্রকৃতিতে সবুজের চিহ্ন নেই, খালগুলোতে মিশমিশে কালো রঙের কাদা ছাড়া আর কিছু নেই—উভয়ের বাতাস দিন দিন সংকুচিত হতে শুরু হলে, গাছগুলো সম্পূর্ণ উলঙ্গ হয়ে যায়। এই রুক্ষ পরিবেশেও তারা খুশি থাকে। তারা ভুলতে পারে না এই দেশকে। তাই ওয়াজদ্দিকে বলতে দেখা যায়: 'তোর বাপ কটো? এ্যাঁ-কটো বাপ? মা কটো? একটা তো? দ্যাশও তেমনি একটো'।[১২] এই অসাম্প্রদায়িক ও সুকুমার জীবনদর্শন নিয়ে ওয়াজদ্দি নির্মমভাবে নিহত হলো হিন্দু সম্প্রদায়ের দু'জনের হাতে। বশিরের চোখের সামনেই নিহত হলো তার স্ত্রী, সন্তান। অতঃপর নিরাপত্তাসন্ধানী বশির দেশ ছেড়ে পালাতে থাকে। চলার পথে এক সময় সে একটি শুকনো খালে আশ্রয় নিল। সে দেখতে পেল তারই মতো এক উপদ্রুত আগন্তুক খালের পাড়ে উঠে এসেছে। তখন সেই ধুতিপরা লোকটাকে দেখতে পেয়েই বশিরকে তাড়া করে আদিম হিংস্রতা। আগন্তুকটির কাছ থেকে কুড়ুল নিয়ে সে প্রচণ্ড আঘাতে তাকে ধরাশায়ী করল। কিন্তু সীমান্ত-রক্ষীদের টর্চের আলোতে মৃত্যুযন্ত্রণাকাতর লোকটাকে দেখে বশিরের নিকট মনে হয় সে যাকে হত্যা করেছে—সেই মুখ ঠিক যেমন ওয়াজদ্দির মুখ—রক্তাক্ত, বীভৎস, তেমনিই অবাক। 'কৃষক বশিরের এই জাগরণের মধ্য দিয়ে লেখক দেখিয়েছেন যাবতীয় ধর্মীয় আচ্ছন্নতা এবং সাম্প্রদায়িক ভেদচেতনার চেয়ে মানবতা অনেক ঊর্ধ্বে। অশিক্ষিত ওয়াজদ্দি ও বশিরের আত্মোপলব্ধির নিকট বিবেকহীন ক্ষমতালিপ্সু মানুষের মূঢ়তা ধিকৃত হয়'।[১৩]

বশির ও ওয়াজদ্দি এ দুটি প্রধান চরিত্রের মধ্যদিয়ে লেখক নিজের পরিবারের ও পারিপার্শ্বিক ঘটনাকে এক ভিন্ন ছাঁচে তুলে ধরেছেন, যা—বাংলার প্রকৃতি ও কৃষিজীবী মানুষের মর্মগত চেতনার প্রতিচ্ছবি—যার দুটি সত্তার সামগ্রিক স্বীকৃতিতে দু'টিই পরম রমণীয় হয়ে উঠেছে।[১৪]

একজন যুবতী নারী তার অন্তরে প্রেমকে কতভাবে লালন করতে পারে, দুর্জ্ঞেয়, ছলনাময় ও রহস্যময় প্রেমের ফাঁদে ফেলে সেই নারী তার প্রেমিককে কতভাবে খেলাতে পারে, লেখক তা স্পষ্টভাবে দেখিয়েছেন হামিদা ও শাদু চরিত্রের মাধ্যমে 'মন তার শঙ্খিনী' গল্পে। হামিদা ও শাদু সমাজের নিম্নশ্রেণীর দুই যুবক-যুবতী। দুজনের মধ্যে ভালোবাসা হয়ে যায় হঠাৎ করে। হামিদা শাদুকে ভালোবাসে এ কথা নিজের মুখে বলার পর থেকে শাদু যেন বিশ্ব জয় করেছে

এমন আনন্দে অস্থির হয়ে পড়ে। সে হামিদাকে বিয়ে করার জন্য মনে মনে তৈরি হয়। কিন্তু এক্ষেত্রে শাদুর সংসারের অভাব বাধ সাধে। তাই স্বয়ং হামিদা চোখ ঘুরিয়ে বলে:

> আমাকে বিয়ে করবি তো খেতে দিবি কি? সি কথাটো সত্যি। সি কথাটো বাপু সত্যি, আমার জমি যা তাতে মায়ের আর আমার তিন মাসের খোরাকিটো কোনরকমে হয়, তা বাদ সারা বছরটো মুনিষ খেটে অ্যানেক ধান্দায় চালাতে হয়। আমার লিজের ভাত জোটে না।[১৫]

হামিদার দাদী সেই কারণেই হামিদার বিয়ে শাদুর সঙ্গে না দিয়ে ভিন গাঁয়ের ট্যারা নামের এক যুবকের সঙ্গে দেয়—লোকটা দেখতে কুৎসিত হলেও তার জমি-জিরাত মোটামুটি ভালই ছিল। হামিদার বিয়েটা ট্যারার সঙ্গে হয়ে যাবার পর থেকে শাদুর জীবনে নেমে আসে অশান্তি আর অস্বস্তির জমাট অন্ধকার। তার কোনো কিছুই ভালো লাগে না, সব সময় বিষণ্নতা আর বিষাদময়তা তাকে আচ্ছন্ন করে থাকে। শাদু হয়ত হামিদার বিয়েটাকে আস্তে আস্তে সহজভাবে মেনে নিতে পারত কিন্তু হামিদা ট্যারার ঘর করতে যাবে না, সে তার দাদীর কাছেই থাকবে—এ কারণে শাদুর অশান্তি আরো বেড়ে যায়। হামিদা মাঝে মাঝে শাদুকে অধিক রাতে আহ্বান জানায় তার প্রেমিক হিসেবেই, শাদু সে—আহ্বানে সাড়া না দিয়ে পারে না। একদিকে হামিদার স্বামীর গৃহে যাবার ব্যাপারে অনীহা, অন্যদিকে রাতে শাদুকে কাছে পাবার তীব্র আকাঙ্ক্ষা—এর কোনোটাই শাদুর কাছে তেমন প্রীতিকর মনে হয় না। শাদু পরিষ্কারভাবে হামিদাকে জানিয়ে দেয়: 'হয় স্বামীর ঘরে যা, নইলে তাকে তালাক দিয়ে আমাকে বিয়ে কর'।[১৬] হামিদা তার ঐ প্রস্তাবে রাজি হয় না। হামিদা শাদুকে প্রেম দেয়, আর তাকে নিয়ে নানাভাবে খেলতে থাকে—এতেই তার আনন্দ।

সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর নারীর প্রেম প্রকাশের ধরন অনেক সময় ভিন্ন ভিন্ন রকমের হয়ে থাকে। স্বামীর ঘরে না গিয়ে শাদুর সঙ্গে মেলামেশা করতে হামিদার নীতিবোধে একটুও বাধে না। তাই 'সে বলল, আজ রেতে আসিস আমাদের বাড়িতে, মনের জ্বালা জুড়োব তোর কাছে'।[১৭] গ্রামবাংলার নিম্নশ্রেণীর নারীর প্রেম তুলে ধরতে গিয়ে তার বক্র, কুটিল, জটিল, মধুর ও আবেগময় প্রতিটি দিককে লেখক যেভাবে উপস্থাপন করেছেন, তা যেমন সহজ, স্বতঃস্ফূর্ত তেমনি বাস্তব অর্থেই স্বাভাবিক। গল্পে আমরা দেখি হামিদা ট্যারাকে বিয়ে করা সত্ত্বেও শাদু তার মায়াজালে বারংবার জড়িয়ে পড়ার অপ্রতিরোধ্য কামনা-বাসনাকে কোনোভাবেই সংযত করতে পারেনি। হামিদার মোহবিস্তারকারী প্রচণ্ড এই শক্তি দেখে শাদু তাকে কখনো ডাইনি, কখনো ভয়ংকর একটা সাপের মতো মনে করেছে। আসলে হামিদার মনটাকে লেখক শঙ্খিনী শ্রেণীর মেয়েদের মতো করে আঁকবার চেষ্টা করেছেন। শঙ্খিনী শ্রেণীর মেয়েরা পুরুষকে নিয়ে নানা রকম লীলা করতে ভালোবাসে এবং যাকে ভালোবাসে তাকে বিয়ে না করেও তারা নিঃসঙ্কোচে দেহদান করে। গল্পটির শেষ মুহূর্তে হামিদা শাদুর কাছে এই ঘোষণা দেয় যে, 'আজ যেচি আমি সোয়ামির বাড়ি, তোর ছেলে রইল আমার প্যাটে। খানিকটো শোধ দেলোম'।[১৮] আমাদের গ্রাম অঞ্চলের অভাবগ্রস্ত নারী ও পুরুষের জীবনে কামনা-বাসনার একটি বাস্তবচিত্র লেখক ফুটিয়ে তুলেছেন হামিদা ও শাদুর মধ্য দিয়ে।

'জীবন ঘষে আগুন' গল্পটির পটভূমি বাংলার খরাকবলিত ও দুর্ভিক্ষ-পীড়িত লেখকের নিজ অঞ্চলের গ্রামসংলগ্ন একটি মেলা। 'একটি গ্রামীণ মেলাকে কেন্দ্র করে রচিত হলেও, গল্পাংশকে লেখক মিলিয়ে দিয়েছেন সমকালীন জীবনের স্পন্দনের সঙ্গে'।[১৯] অর্থাৎ, শোষিত-বঞ্চিত মানুষের শোষণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে উজ্জীবিত হওয়ার গল্প 'জীবন ঘষে আগুন'।

বাংলার ভূমিহীন তেঁতুল বাগদীদের যন্ত্রণাকাতর জীবনের সঙ্গে প্রাচীন উপকথাবহুল সংস্কার এবং সেই জীবন সংগ্রামের যে দুর্জয় শপথ—এই উভয়বিধ রূপকে ঠিকভাবে চিনে নিতে না পারলে এ গল্পের মর্মোদ্ধার করা কঠিন। যুগ যুগ ধরে এই সব ভূমিহীন মানুষের জীবনে ধর্মের কাহীনিসমূহ বাঁচার অধিকার আদায়ের চেতনাকে দুর্বল করে দেয়। কিন্তু তাদের মনের মধ্যে থাকে প্রচণ্ড ক্ষোভ ও ক্রোধ। সেই কারণেই ঐসব ক্ষুধিত বাগদী ক্ষুধার তাড়নায় এক সময় ভণ্ড ধর্ম প্রচারকের বিরুদ্ধে গর্জন করে ওঠে। নধরকান্তি আয়েসী–বাবুদের অসংযত যৌন লালসা, যা স্বল্প কিছু মুদ্রার বিনিময়ে সহজেই চরিতার্থ হয়। বাগদীদের মধ্যে তার প্রবল প্রতিক্রিয়াকে সমাজবাস্তবতার দৃষ্টিকোণ থেকে গল্পকার সুনিপুণ ভঙ্গিতে যেভাবে বিশ্লেষণ করেছেন তাতে বঞ্চিত ও লাঞ্ছিত জীবনের অন্তর্দাহ ও বিস্ফোরণকে যেমন স্বতঃস্ফূর্ত তেমনি স্বাভাবিক বলে মনে হয়। প্রসঙ্গ প্রণিধানযোগ্য সমালোচকের মন্তব্য:

> হাসান এই গল্পের কোথাও কোথাও জীবনের সবচেয়ে কঠিনতম এক বাস্তবতার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে সমাজ জীবনের কুৎসিত ও গলিত-নোংরা চেহারাটাকে শাসরুদ্ধকর একটি পরিবেশের মধ্যে টেনে এনেছেন। মাত্র দু টাকায় রফা করে ঘণ্টাবাবু তেঁতুলে বাগদীদের কালী নামের মেয়েটিকে উপভোগ করার জন্য গভীর রাত্রির প্রগাঢ় অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে তার পশ্চাৎ পশ্চাৎ তাদের তাল পাতায় ছাওয়ানো হিমশীতল অন্ধকার একটি খুপরিতে গিয়ে ওঠে। কালী কেরোসিনের লম্ফটি জ্বালবার কিছুক্ষণ পর এক সময় রিরংসু-ঘণ্টাবাবু নিরংশু-প্রায় সেই খুপরির এককোণে পঙ্গু অবস্থায় শায়িত কালীর স্বামীকে দেখতে পায়। কালীর আগমনের পদধ্বনি শুনতে পেয়ে ক্ষুধিত স্বামীটি সোৎকণ্ঠ চিৎকারে কিছু খাদ্য প্রার্থনা করে। কালী যান্ত্রিক ভঙ্গিতে মাটির শানকিতে একমুষ্টি অন্নকে ডালের সঙ্গে মিশিয়ে কয়েকটি পিণ্ড তৈরি করে এবং ক্ষিপ্রতার সঙ্গে শায়িত স্বামীর কাছে রেখে আসে। অধীর আগ্রহে অপেক্ষমান ঘণ্টাবাবু তার রিরংসা চরিতার্থ করার উদ্দেশ্যে ঘরের অন্য একটি কোণে হাজির হয়।[২০]

এখানে লেখক নিম্নবর্গের মানুষদের সংঘবদ্ধতাকে যৌক্তিক প্রেক্ষাপটে স্থাপন করেছেন। উঁচুবর্গের মানুষের অত্যাচারে তারা বিপন্ন। ক্ষমতাবান বাবুদের লুব্ধ দৃষ্টি পড়ে তাদের রমণীদের উপর। বাগদী রমণী কৃষ্ণভামিনীর ক্ষোভের মধ্যে মূর্ত হয়ে ওঠে যুগ যুগ ধরে প্রবাহিত শোষণের চিত্র। উঁচুশ্রেণীর ঘণ্টাবাবু নিম্নবর্গের রমণী কালীর অসহায়তার সুযোগ নিয়েছে। নিম্নবর্গের সচেতন মানুষেরা মুখ বুজে এ অন্যায়কে মেনে নিতে পারেনি। যুবক মনোহর প্রতিরোধ চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে ঘণ্টাবাবুকে হত্যা করেছে। মনোহরের সংগ্রামীচেতনা তাকে ভবিষ্যতের দিকে চালিত করেছে। আসন্ন সংগ্রামে সে তার কর্তব্য স্থির করে রাখে। কৃষ্ণভামিনীকে সে বলেছে তার দৃঢ় প্রতিজ্ঞার কথা

> খুন একন হবে ভামিনী। একটো নয়, দুটো নয়–বহুৎ বদরক্ত বার করবো বুঁইচিস। অতঃপর চূড়ান্ত সংগ্রাম দানা বেঁধে উঠেছে। অন্ত্যজ মানুষেরা তাদের অত্যাচারী প্রতিপক্ষ বাবুদের বিরুদ্ধে লড়াই করবার উন্মাদনা নিয়ে প্রস্তুত।[২১]

মানুষের জীবন বৈচিত্র্যের বাস্তবতাকে ভেঙে নতুন বাস্তবতা গড়ে তোলার এক অনন্য প্রয়াস লক্ষ্য করা যায় এই গল্পে। সেই সঙ্গে বস্তুতান্ত্রিক চেতনার প্রকীর্তিত রূপ-বৈশিষ্ট্যে বঞ্চিত জীবনের যে অসম্বাধ-অবমোচন-গল্পান্তে বাগদীদের সমবেত প্রচেষ্টায় ঘণ্টাবাবুর করুণ-মৃত্যু এবং সবশেষে মন্তাজের সহায়তায় বাগদীদের ত্বরিৎ ঐক্যজোট, তাতে শ্রেণীবিভক্ত সমাজের সংগ্রামী মানুষের সজীব চিত্রই উদঘাটিত হয়েছে।

অন্ত্যজশ্রেণীর মানুষ বৃদ্ধ অভিরাম যুগ যুগ বাহিত শোষণের চাপে বিমথিত। পুরোহিত-শাসিত সমাজের উঁচুশ্রেণীর মানুষদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে পারে না সে। কিন্তু তার উত্তরপুরুষ নতুন প্রজন্মের সাহসী সন্তান মনোহর বিদ্রোহকে পরমসত্য বলে জেনেছে। সে মুখ বুজে অত্যাচার সহ্য করেনি, মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়েছে। ভূস্বামীশাসিত সমাজের কাছে তার তীব্র জিজ্ঞাসা: 'ই মাটি কার? ই কি মোদের? ... বলো ই মাটি তুমার বাপের কিনা'?[২২] মনোহরের সহগামীরা হাতীর পদচ্ছাপে নিজেদের অক্ষমতাকে সক্ষম করে তুলবার মহড়া দেয়। শোষকশ্রেণীর প্রতিনিধি ঘণ্টাবাবুকে প্রতিরোধ চেতনায় উজ্জীবিত হয়ে হত্যা করেছে মনোহর এবং সেই হত্যাকে তারা নিজেদের অস্তিত্বের সংগ্রামের সঙ্গে অন্বিত করে দেখেছে এভাবে:

> তবু মৃত্যু কি জীবনে একবারই আসে না? এবং সেইসব বদ মরণ মরতে যে দুঃসহ ক্লান্তিতে ভুগতে হয়–তার চেয়ে একটি উজ্জ্বল হত্যাকাণ্ডের প্রতিরোধ কি প্রচণ্ডভাবেই না কাম্য![২৩]

গল্পে হাসান আজিজুল হক স্পষ্টভাবে দেখিয়েছেন, শোষকশ্রেণীর সঙ্গে শোষিতশ্রেণীর যে বিশাল দূরত্ব তা উভয়ের মধ্যে প্রীতির সম্পর্ক স্থাপনের মাধ্যমে দূরীভূত হতে পারে না। এই বৈষম্য দূর করবার একমাত্র উপায় হলো শোষণকামীশ্রেণীকে আঘাত করে নিজেদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করা। বাগদীদের সংগ্রাম তাদের অস্তিত্বের সংগ্রাম। মন্তাজ, মনোহর ও তেঁতুলে বাগদীদের সম্মিলিত প্রতিরোধ মানবসভ্যতার বিরুদ্ধে নয়, শ্রেণীসভ্যতার বিরুদ্ধে-যে শ্রেণীসভ্যতা চিরকাল তাদের নির্যাতন করে আসছে। তাদের সম্মুখে বাঁচা ও মরা এই দুটি পথ খোলা, এ অবস্থায় প্রেম, ভালোবাসা দিয়ে অত্যাচারী শ্রেণীকে কাছে টানতে যাওয়ার অর্থ নিজেদের ধ্বংসের পথ ত্বরান্বিত করা, কেননা 'ইদুঁরের চিঁ চিঁ আর্তনাদ যত সুন্দর সাহিত্যই সৃষ্টি করুক না কেন, বিড়াল নিশ্চিন্তে তাকে গিলে ফেলবে'।[২৪] শ্বাসরুদ্ধকর অবস্থায় লেখক সংগ্রামের পথকেই এ গল্পে সত্য বলে গ্রহণ করেছেন।

পশ্চিমবাংলার দিগন্ত-বিস্তৃত বিলকে তিনি শৈশব ও কৈশোর পর্যন্ত খুব কাছ থেকে দেখেছেন, যৌবনেও দেশত্যাগের আগ পর্যন্ত বিল ছিল তাঁর কাছে নিত্যসহচরের মতো, নিত্যকর্মে তার সঙ্গে হয়েছে চেনা-জানা। দেশত্যাগের পরেও শৈশব থেকে যৌবনের স্মৃতি-বিজড়িত বিলকে নতুন করে ফিরে পেয়েছেন খুলনার ফুলতলায়, তাঁর দ্বিতীয় আবাসে। পশ্চিমবঙ্গীয় প্রকৃতির সঙ্গে সেখানকার মানুষও তাঁর গল্পে ছায়া ফেলেছে বারবার, মানুষের স্বভাবে ও কথাবার্তায় সেখানকার স্মৃতিই হয়ত কখনো কখনো দুর্মরতম হয়ে উঠেছে কিন্তু সে প্রেরণা প্রাদেশিকতায় পাংশুল হয়ে ওঠেনি। বীক্ষায় ব্যঞ্জনায় ও চারিত্র্যে তা দৈশিকতার সীমা ছাড়িয়ে বিশ্বের

অন্যান্য দেশের শোষিত কৃষকদের সঙ্গে নির্বিকল্পভাবে একাত্মতা স্থাপনের জন্য উন্মুখ হয়েছে। প্রসঙ্গত সমালোচকের অভিমত:

> হাসানের প্রকৃতি-চিন্তার মূল সুরটি কর্মচঞ্চল মানুষের জীবনের উত্তাপে সঞ্জীবিত–অর্থাৎ হাসান কর্মচঞ্চল মানুষের পাশাপাশি এনেছেন সজীব ও প্রাণবন্ত প্রকৃতির নিগূঢ় রূপবৈচিত্র্যকে, রূপের সেই অফুরন্ত ঐশ্বর্যের দ্বারা মানুষের কর্মধারা বিপুলভাবে আন্দোলিত হয়, নিয়ন্ত্রিত হয়। তিনি প্রকৃতিকে বিপ্রতীপ তাৎপর্যে টেনে এনেছেন। প্রকৃতি তাঁর কাছে কখনো কখনো ভয়ঙ্করভাবে ক্রূর ও ছলনাময়ী। কিন্তু মানুষের বেঁচে থাকার দুরন্ত স্পৃহা বা তৃষ্ণা প্রকৃতির সেই ছলনাকে জয় করার আশ্চর্য শক্তি যুগিয়ে থাকে। নতুন নতুন মাত্রায় প্রকৃতির নব নব রূপকে উন্মোচিত বা অবারিত করতে গিয়ে হাসান জীবনোপলব্ধির প্রসারতা যেভাবে ঘটিয়েছেন তা সত্যিই প্রশংসনীয়।[২৫]

মানুষের জীবনপ্রবাহের সঙ্গে প্রকৃতির সাহচর্য ঘনিষ্ঠতায় আবদ্ধ। হাসান আজিজুল হকের গল্পে প্রকৃতি স্মরণযোগ্য অবস্থান জুড়ে আছে। তাঁর গল্পে প্রকৃতি মানুষের কর্মধারার সঙ্গে এমন ওৎপ্রোত হয়ে আছে যে, মনে হয় জীবন ও প্রকৃতি যেন একে অন্যের পরিপূরক। তাঁর প্রকৃতি-চেতনা এ দেশের শ্রমজীবী মানুষের জীবনের তাৎপর্যকে প্রতিভাসিত করে, কৃষিজীবী মানুষের জীবনধারার সঙ্গে সহজীবী নিসর্গের যোগাযোগ একসূত্রে বাঁধা পড়ে যায়। প্রকৃতির ঐশ্বর্যকে তিনি কর্মচঞ্চল মানুষের জীবনধারার সঙ্গে একই সমান্তরালে স্থাপন করেছেন। হাসান আজিজুল হক 'মন তার শঙ্খিনী' গল্পে প্রকৃতি সৌন্দর্যের প্রতীক হয়ে আসেনি, এসেছে সম্পূর্ণ বিপরীত তাৎপর্য নিয়ে। এ গল্পে প্রকৃতি ও জীবন একাত্ম—উভয়ের অস্তিত্বই যেন পরিপূরক। অর্থাৎ, 'নিঃস্ব মানুষের মনোবেদনাকে প্রখর করে দেখানোর উদ্দেশ্যে হাসান আজিজুল হক প্রকৃতিকে গ্রহণ করেন এবং নিঃস্ব মানুষের চেতনায় প্রকৃতির উপস্থিতিকে তাদের জীবনের পারিপার্শ্বিকতাসহ বিচার করেন'।[২৬] যা লেখকের ভাষায়:

> অন্ধকার ঘরে ছেঁড়া কাঁথার ওপর শাদু শুয়ে পড়ে। খড়ের ফুটো চাল দিয়ে শীতার্ত হিমেল আকাশটা চোখে পড়ে। আকাশের ঠিক সেই অংশেই গোটা কয়েক তারা নিদ্রাহীন স্তিমিত চোখে তার দিকে চেয়ে থাকে। আকাশটা যেন হামিদার সখের শাড়ী, যে শাড়ী সে কোনদিনই পরতে পারেনি, সে-শাড়ী সে একদিন পরবে, আকাশটা যেন সেই শাড়ী। তারাগুলি সেই শাড়ীরই চুমকি। মাটির দেয়ালের খাঁজে খাঁজে ইঁদুর দৌড়ে বেড়ায়, অন্ধকারের ভিতর থেকে টিকটিকি ডেকে ওঠে—শাদু এপাশ ওপাশ করে। কত রাত্রে পরিচিত স্পর্শে চোখ মেলে চায়, ফাটা শীর্ণহাতে কপালে হাত বুলোয় মা—বাঁ হাতে নিভু নিভু প্রদীপ।[২৭]

শাদুর কল্পনায় নীল আকাশে হামিদার আকাঙ্ক্ষিত শাড়ির কল্পনা এবং পরমুহূর্তে মাটির দেয়ালের খাঁজে খাঁজে ইঁদুরের দৌড়ানো, টিকটিকির ডাক ও নিভু নিভু প্রদীপ নিয়ে মায়ের শীর্ণ হাতের উপস্থিতি আশা-নিরাশার দোলাচলে মথিত দরিদ্র শাদুর জীবনে বিপ্রতীপ তাৎপর্য রচনা করে। 'পরবাসী' গল্পে লেখক প্রকৃতিকে টেনে এনেছেন জীবনের অফুরন্ত আশীর্বাদের প্রতীক হিসাবে—বিশৃঙ্খল জীবনের ভাঁজে-ভাঁজে এ প্রকৃতি মানুষের জীবনে আশ্চর্য এক উন্মাদনা ও অনুপ্রেরণার বন্যা নিয়ে আসে। যেমন:

> কালচে রং-এর মাটি অল্প ভিজে এবং পাথরের মত কঠিন। গরুর গোয়াল থেকে ধোঁয়া এসে কুয়াশায় মিশেছে। ভারি একটা পর্দা পড়েছে গাঁটিকে ঘিরে। সেই পর্দা ভেদ করে ওরা মাঠে এসে পড়ল। ভিজে ভারি ধানের লুটিয়ে পড়া শীষ চাবুকের মত আঘাত করে পায়ের গোছায়। শির

> শির করে বাতাস দেয়, ধানে ধানে ঘষা লেগে শন শন শব্দ হতে থাকে এবং এই অল্প একটু শব্দ ছাড়া বিরাট খোলা মাঠের কোথাও কোন শব্দ নেই। অন্ধকারে ছায়ার মত মানুষগুলোকে হুস হুস করে হাঁটতে দেখা যায়। তারপর কুয়াশার পাতলা চাদর ছিঁড়ে হঠাৎ সূর্যের অজস্র আলো লাল হয়ে মাঠে পড়তেই দেখা যায় বিরাট মাঠে প্রায় জনারণ্য। তখন একটা শব্দ ওঠে, একটা বিশাল গম্ভীর গুঞ্জন–মাঠের আকাশ এবং বাতাস বেষ্টন করে বাজাতে থাকে। এর অন্য কোন নাম নেই, একে জীবনের গুঞ্জন বলা চলে। বেঁচে থাকার গুঞ্জন–উষ্ণ উত্তপ্ত এবং চিরকালীন।[২৮]

'জীবন ঘষে আগুন' গল্পে লেখক প্রকৃতিকে যখন রুক্ষ ও বিবর্ণরূপে দেখেন, তখন সেই প্রকৃতির চেহারা ও স্বরূপ বদলে যায়। স্নিগ্ধতা ও কোমলতার সামান্যতম পরিচয় সেখানে খুঁজে পাওয়া যায় না। অর্থাৎ, 'প্রকৃতি স্থাপিত হয়েছে মানুষের কঠিন জীবনের সমান্তরালে। রাঢ় অঞ্চলের প্রাকৃতিক রুক্ষতা মানুষের জীবন সংগ্রামের প্রাখর্যকে ব্যঞ্জনা দিয়েছে'।[২৯] যা গল্পকারের ভাষায় ফুটে উঠেছে এভাবে:

> সেখানে কোনো বৃক্ষ ছিল না, কোনো বট বা অশ্বত্থ–শুধু কিছু কাঁটাগাছ, পান্‌সে ছায়া বাবলা, বড়জোর শেয়াকুল ধরনের গুল্ম এই সব মাঝে মাঝে। আর অনেক বড় লাল মাঠ–গরমের তাড়সে পীড়িত অসংখ্য গর্ত ইত্যাদি।[৩০]
>
> কিংবা সূর্যের গোলাটি মন্ত্রবলেই যেন আকাশের মাথায় উঠে এসেছে–মরণরত শূকর তাকে আহ্বান জানায়, সে প্রত্যূষের স্নিগ্ধতা ছিঁড়েখুঁড়ে চোখ রাঙিয়ে বেরিয়ে আসে–মুহূর্তেই হাওয়া অদৃশ্য উজ্জ্বল তামার পাতে পরিণত হয়– পাখিগুলো ভেগেছে, আর উপায় কি?[৩১]

উপর্যুক্ত বর্ণনার মধ্য দিয়ে হাসান আজিজুল হক দাহ্য প্রকৃতির প্রতপ্ত অগ্নিময় সত্তাকে প্রত্যাসন্ন সংগ্রামের প্রবল উত্তেজনার সঙ্গে সমন্বিত করেছেন। গল্পের সামগ্রিক আয়তনের মধ্যে প্রকৃতি নানারূপে বারবার এসেছে এবং দেখা যায় তিনি প্রকৃতি বর্ণনার প্রায় সবটুকু অংশ জুড়ে আসন্ন বিস্ফোরণের সম্ভাবনাকে উত্তরোত্তর ঘনীভূত করেছেন।

হাসান আজিজুল হকের গল্পে নৈশপ্রকৃতির ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। রাত্রির পটভূমিকায় তিনি সমাজ জীবনের অন্ধকার দিক থেকে 'সত্য' নিষ্কাশন করে আনেন। 'শকুন' গল্পের শুরুতে দেখা যায় দিনের আলো নিভে যাচ্ছে, অতঃপর রাত্রির অন্ধকারে রূপায়িত হতে থাকে সমাজের অন্ধকার দিকের কথা, রাতের অন্ধকারে সংঘটিত হয় কাদু শেখের বিধবা বোনের সর্বনাশ। 'একজন চরিত্রহীনের স্বপক্ষে' গল্পটিতে সতীনাথের নৈশ-অভিযাত্রার চিত্র উপস্থাপিত। নিজেকে সমাজের ভাল লোক হিসাবে প্রতিপন্ন করবার জন্য সতীনাথ দিবালোকে তার রক্ষিতার কাছে যায় না। কিন্তু রাত্রিকালে তার চরিত্র স্বরূপে প্রকাশিত হয়। আবার সতীনাথের মতো প্রবৃত্তিতাড়িত কয়েকটি যুবকও রাতের বেলা অসহায় মানুষের দুর্বলতার সুযোগ গ্রহণ করে। 'তৃষ্ণা' গল্পের প্রবৃত্তিতাড়িত বাশেদ প্রচণ্ড বাঁচার আর্তি নিয়ে সকলের অগোচরে মৃত্যুবরণ করেছে রাতের অন্ধকারে। গল্পসমূহে হাসান আজিজুল হকের প্রকৃতিচিত্রণ প্রকৃতিসর্বস্ব নয়। জীবনের ঘাত-প্রতিঘাতের সঙ্গে প্রকৃতির যে সম্পৃক্তি তাকেই তিনি গ্রহণ করেছেন। তাঁর গল্পে প্রকৃতি জীবনের চিরন্তনতাকে উজ্জ্বল করে তোলে।

প্রকৃতি তাঁর গল্পের সামগ্রিক আয়তনে যতখানি জায়গা পেয়েছে তার সবটুকুতেই মানুষের জীবননাট্যেরই ঐকতান—কখনো তা আশ্চর্য সাদৃশ্যে আবার কখনো তা ব্যাপকতার বৈপরীত্যের তাৎপর্যে চিত্রায়িত। দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদে বিশ্বাসী লেখক মনে করেন, প্রকৃতি কেবল সুন্দর নয়, প্রকৃতি মানুষকে সংগ্রামের মধ্য দিয়ে বেঁচে থাকার অগ্নিমন্ত্রও শিখিয়েছে। জীবনকে উপভোগ করতে হলে প্রকৃতি থেকে শিক্ষা নিতে হয়, জীবনকে সুন্দর করে তুলতে হলে প্রকৃতির শিক্ষা মানুষের জীবনে অপরিহার্য। প্রকৃতির অকৃপণ উদারতা সমাজের সর্বস্তরের মানুষের জীবনে সুখ ও শান্তি সমভাবে বিতরণের শিক্ষাও দিয়ে থাকে। সেই সঙ্গে হাসান আজিজুল হক দৃষ্টি আকর্ষণ করেন মানবজাতির সেই শক্তির দিকে, যা দিয়ে মানুষ চিরকাল মানুষ হয়ে টিকে থাকার সাহস পায়।

তথ্যনির্দেশ

১. মোহাম্মদ জাহিদ হোসেন, *বাংলাদেশের ছোটগল্প জীবন ও সমাজ*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, জুন ১৯৯৭, পৃ.৫৬
২. হাসান আজিজুল হক, *রচনা সংগ্রহ-১*, জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশন, ঢাকা, ফেব্রুয়ারি, ২০০১ পৃ. ২১
৩. আবু জাফর, *হাসান আজিজুল হকের গল্পের সমাজবাস্তবতা*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ডিসেম্বর ১৯৯৬, পৃ.৩০
৪. মহীবুল আজিজ, *হাসান আজিজুল হক : রাঢ়বঙ্গের উত্তরাধিকার*, অচিরা, ৪৬, বৌদ্ধ মন্দির সড়ক, চট্টগ্রাম, আশ্বিন ১৩৯৫, পৃ. ৩৭, ৩৮
৫. হাসান আজিজুল হকের বক্তব্য: ১৬ জানুয়ারী ১৯৮১, কুষ্টিয়ার 'কুমারখালী নবপ্রচেষ্টা সাহিত্য সংসদ' কর্তৃক স্থানীয় পাবলিক লাইব্রেরী মিলনায়তনে প্রদত্ত সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে, সংসদের মুখপত্র '*গৌড়ী*'তে প্রকাশিত।
৬. হাসান আজিজুল হক, *রচনা সংগ্রহ-১*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১
৭. হাসান আজিজুল হক, *রচনা সংগ্রহ-১*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১
৮. মহীবুল আজিজ, *হাসান আজিজুল হক : রাঢ়বঙ্গের উত্তরাধিকার*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৩
৯. সরিফা সালোয়া ডিনা, *হাসান আজিজুল হক ও আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের ছোটগল্প বিষয় ও প্রকরণ*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, জুন ২০১০, পৃ.৮৯
১০. হাসান আজিজুল হক, *রচনা সংগ্রহ-১*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২
১১. হাসান আজিজুল হক, *রচনা সংগ্রহ-১*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২, ৩৩
১২. হাসান আজিজুল হক, *রাঢ়বঙ্গের গল্প*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৪
১৩. মহীবুল আজিজ, *হাসান আজিজুল হক : রাঢ়বঙ্গের উত্তরাধিকার*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪২
১৪. আবু জাফর, *হাসান আজিজুল হকের গল্পের সমাজবাস্তবতা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৪
১৫. হাসান আজিজুল হক, *রচনা সংগ্রহ-১*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৭
১৬. হাসান আজিজুল হক, *রচনা সংগ্রহ-১*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৯
১৭. হাসান আজিজুল হক, *রচনা সংগ্রহ-১*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮১
১৮. হাসান আজিজুল হক, *রচনা সংগ্রহ-১*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৪
১৯. মহীবুল আজিজ, *হাসান আজিজুল হক: রাঢ়বঙ্গের উত্তরাধিকার*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৭

২০. আবু জাফর, *হাসান আজিজুল হকের গল্পের সমাজবাস্তবতা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৫
২১. মহীবুল আজিজ, *হাসান আজিজুল হক: রাঢ়বঙ্গের উত্তরাধিকার*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৯
২২. হাসান আজিজুল হক, *রাঢ়বঙ্গের গল্প*, দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ঢাকা, প্রকাশ ১৩৯৮, পৃ. ১
২৩. হাসান আজিজুল হক, *রাঢ়বঙ্গের গল্প*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৩
২৪. লু সুন, *সাহিত্য ও বিপ্লব*, ঢাকা, জানুয়ারী ১৯৮৯, পৃ. ১৪
২৫. আবু জাফর, *হাসান আজিজুল হকের গল্পের সমাজবাস্তবতা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৮
২৬. মহীবুল আজিজ, *হাসান আজিজুল হক: রাঢ়বঙ্গের উত্তরাধিকার*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৬
২৭. হাসান আজিজুল হক, *রাঢ়বঙ্গের গল্প*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫০
২৮. হাসান আজিজুল হক, *রাঢ়বঙ্গের গল্প*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬০, ৬১
২৯. মহীবুল আজিজ, *হাসান আজিজুল হক : রাঢ়বঙ্গের উত্তরাধিকার*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৭
৩০. হাসান আজিজুল হক, *রাঢ়বঙ্গের গল্প*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৭
৩১. হাসান আজিজুল হক, *রাঢ়বঙ্গের গল্প*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০২, ১০৩

বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি পত্রিকা, দ্বাত্রিংশ খণ্ড, শীত সংখ্যা, পৌষ ১৪২১/ডিসেম্বর ২০১৪

আবুল মনসুর আহমদের কয়েকটি অপ্রধান গ্রন্থ ও কিছু অগ্রন্থিত রচনা

মো: চেঙ্গীশ খান*

সারসংক্ষেপ

আবুল মনসুর আহমদের প্রকাশিত গ্রন্থের সংখ্যা আঠার। অবশ্য *নয়াপড়ার* (১৯৩৪) চার খণ্ড ও ছোটদের *কাসাসুল আম্বিয়ার* (১৯৫০) দুই খণ্ডসহ গ্রন্থের মোট সংখ্যা দাঁড়ায় বাইশটিতে। এর মধ্যে গল্প, উপন্যাস, প্রবন্ধ ও আত্মজীবনীমূলক রচনা ছাড়াও ঠিক সাহিত্যপদবাচ্য নয় এমন কিছু রচনাও রয়েছে। এমন অপ্রধান গ্রন্থের সংখ্যা মোট পাঁচটি: *মুসলমানী কথা* (১৯২৪), *চার খণ্ড নয়াপড়া* (১৯৩৪), *দুই খণ্ড ছোটদের কাসাসুল আম্বিয়া* (১৯৫০), *পরিবার পরিকল্পনা* (১৯৬৭) ও *আল-কোরআনের নসিহৎ* (১৯৭৫)। এছাড়াও বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত এমন কিছু প্রবন্ধ-নিবন্ধ বা সম্পাদকীয়-উপসম্পাদকীয় রয়েছে, যা গ্রন্থিত হয়নি। আবুল মনসুর আহমদ যেহেতু পেশা হিসেবে মূলত সাংবাদিকতার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন (অবশ্য বেশ কিছুদিন আইন ব্যবসাও করেছেন) এবং বিভিন্ন পত্রিকার সম্পাদক হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেছেন, সে-কারণে বিভিন্ন পত্রিকায় তাঁর অনেক লেখা প্রকাশিত হয়েছিল। বাংলা একাডেমীর উদ্যোগে আবুল মনসুর আহমদ রচনাবলী প্রকাশিত হলেও তাতে এসব অগ্রন্থিত লেখা স্থান পায়নি। এমনকি লেখকের প্রথম প্রকাশিত গ্রন্থ মুসলমানী কথা (১৯২৪) দুষ্প্রাপ্য হওয়ায় তাও প্রকাশ করা সম্ভব হয়নি। ফলে তার আলোচনা করা সম্ভব নয়। লেখকের জীবনী থেকে যতটুকু জানা যায় তার ভিত্তিতে মুসলমানী কথা এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারের মাইক্রো-ফিল্ম, বাংলা একাডেমী গ্রন্থাগার, ন্যাশনাল আর্কাইভস, কয়েক জনের ব্যক্তিগত সংগ্রহ ও লেখক-পরিবারের নিকট থেকে যেসব অগ্রন্থিত রচনা বা অপ্রকাশিত পাণ্ডুলিপি সংগ্রহ করা সম্ভব হয়েছে, এই প্রবন্ধে তার একটি সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হয়েছে।

অপ্রধান রচনা

মুসলমানী কথা (১৯২৪)

১৯২৪ সনে কলকাতার 'মোহাম্মদী বুক এজেন্সী' কর্তৃক প্রকাশিত এটিই লেখকের প্রথম প্রকাশিত গ্রন্থ। কাসাসুল আম্বিয়া, অর্থাৎ, নবীদের জীবনকাহিনী নিয়ে ছেলেদের উপযোগী কতকগুলো গল্পের সংকলন হলো *মুসলমানী কথা*। মূলত অর্থ উপার্জনের জন্যে তিনি গ্রন্থটি রচনা করেছিলেন। এ গ্রন্থ লেখার উদ্দেশ্য সম্পর্কে লেখক বলেছেন:

> ১৯২৪-২৫ সালে আমি যখন 'সাপ্তাহিক মোহাম্মদী'তে সহকারী সম্পাদকের কাজ করিতাম, তখন আমার বেতন ছিল মাত্র পঞ্চাশ টাকা। এই টাকায় তৎকালে সচ্ছলে আমার চলিয়া যাইত। কিন্তু কিছু সঞ্চয় করিতে পারিতাম না। এই সময় কতকটা উপরি আয়ের আশায়, কতকটা গ্রন্থকার হইবার শখে, ছেলেদের উপযোগী করিয়া কাছাছুল আম্বিয়ার কতকগুলি গল্প লইয়া একটি বই লিখিলাম। তার নাম রাখিলাম 'মুসলমানী উপকথা'।[১]

---

* সহযোগী অধ্যাপক (বাংলা), বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়, গাজীপুর–১৭০৫

এই বইয়ের কপিরাইট বিক্রি করতে গিয়ে মওলানা আকরম খাঁর পরামর্শে দীনেশচন্দ্র সেনের 'রামায়ণী কথা'র অনুকরণে বইটির নামের 'উপ' কথাটি বাদ দিয়ে নাম রাখলেন *মুসলমানী কথা*। আর এর কপিরাইট বিক্রি করতে গিয়ে লেখক একটা বড় সমস্যায় পড়েন। লেখকের পিতা এ সময় একটা কাজে তাঁর কাছে একশ টাকা চেয়ে পাঠান। আর ঐ টাকা যোগাড়ের জন্য *মুসলমানী কথা*'র কপিরাইট প্রথম বিক্রি করতে গেলেন *মাসিক মোহাম্মদী*র প্রকাশসংস্থা 'মোহাম্মদী বুক এজেন্সী'র কাছে কিন্তু তারা সেটি ছয়শ টাকা দিতে চাইলে লেখক তা অধিক টাকায়, অর্থাৎ, এগারশ টাকায় ভট্টাচার্য এন্ড সন্সের কাছে বিক্রি করলেন এবং একশ টাকা অগ্রিমও নিলেন। 'ভট্টাচার্য এন্ড সন্স' বইটি প্রকাশের যাবতীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করলেন এবং তার জন্য সুন্দর বিজ্ঞাপনও ছাপলেন। কিন্তু বইটির মধ্যে আরবি-ফারসি শব্দের বাংলা ফুটনোট বা পরিশিষ্টে তার বাংলা শব্দার্থ দেওয়ার কথা বললে লেখক তাতে রাজি হলেন না। ফলে তিনি বইটি ফেরৎ নিয়ে আসেন এবং অবশেষে 'মোহাম্মদী বুক এজেন্সী'র কাজে ছয়শ টাকায় বিক্রি করেন। লেখক এ ঘটনাটিকে বাংলা ভাষার মুসলমানিত্ব রক্ষায় তাঁর জীবনের 'প্রথম স্যাক্রিফাইস' হিসেবে উল্লেখ করেছেন।[২] এ বইটির মধ্যে কি কি গল্প ছিল তার সব জানা না গেলেও 'ভট্টাচার্য এন্ড সন্সে'র শিশু-মাসিক পত্রিকা 'শিশু সাথী'-তে 'কারুণের ধন' নামক গল্পটি ছাপা হয়েছিল এবং কলকাতার সাহিত্যিক সমাজে তা বেশ নাম করেছিল বলে লেখক তাঁর আত্মজীবনীতে উল্লেখ করেছেন।[৩] তবে এ গল্পটি এবং একই ধরনের অন্যান্য গল্প পরে *ছোটদের কাসাসুল আম্বিয়া* গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় *মুসলমানী কথা*র গল্পগুলো এতে স্থানান্তরিত হয়েছে বলে মনে করা যায়। বাংলা একাডেমী থেকে প্রকাশিত 'আবুল মনসুর আহমদ রচনাবলী'র সম্পাদক ড. রফিকুল ইসলাম বলেছেন: "*মুসলমানী কথা* এখন দুষ্প্রাপ্য। সৌভাগ্যক্রমে আবুল মনসুর আহমদ *ছোটদের কাসাসুল আম্বিয়া* (১৯৫০) প্রকাশ করায় মুসলমানী কথায় সন্নিবেশিত গল্পগুলি *ছোটদের কাসাসুল আম্বিয়া*য় সংকলিত হয়েছে আশা করা যায়।"[৪] গ্রন্থ হিসেবে ও ভাষা ব্যবহারের দক্ষতা ছাড়াও যে বিষয়টি এখানে বিশেষ উল্লেখযোগ্য তা হচ্ছে, আবুল মনসুর আহমদ তাঁর সাহিত্যিক জীবনের প্রথম থেকেই ভাষায় আরবি-ফারসি শব্দ ব্যবহারের মাধ্যমে বাংলাভাষার 'মুসলমানী' রূপটি আনতে চেয়েছিলেন– যা তাঁর পরবর্তী সাহিত্যচর্চার মধ্যে আরো স্পষ্টভাবে লক্ষ্য করা যায়। উল্লেখ্য যে, শিশু-কিশোর উপযোগী *মুসলমানী কথা* গ্রন্থটি সাহিত্যপদবাচ্য না হলেও *মাসিক মোহাম্মদী* পত্রিকা পৌষ, ১৩৪২ (৯ম বর্ষ, ৩য় সংখ্যা) ও বৈশাখ, ১৩৪৩ (৯ম বর্ষ, ৭ম সংখ্যা) বঙ্গাব্দে সমকালীন মুসলিম রচিত শ্রেষ্ঠ পঞ্চাশখানা পুস্তকের যে দুটি তালিকা প্রকাশ করেছিল, সে দুটি তালিকাতেই *মুসলমানী কথা* স্থান পেয়েছিল।[৫]

নয়াপড়া (১৯৩৪)

চারখণ্ডে রচিত *নয়াপড়া* মক্তবের চার ক্লাসের শিশুদের জন্য রচিত পাঠ্যপুস্তক। "ময়মনসিংহ শহরের তৎকালীন ফিরোজ লাইব্রেরির মালিক অধ্যাপক মৌঃ আসাদুজ্জমানের অনুরোধে আবুল মনসুর আহমদ এটি রচনা করেছিলেন। সেই লাইব্রেরিই ১৯৩৪ সনে এটি প্রকাশ করে।"[৬] মক্তবের ১ম, ২য়, ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণীর জন্য এই গ্রন্থ চারটি আবশ্যকীয় বিষয়

হিসেবে পাঠ্য ছিল। বর্তমানে এ গ্রন্থটির কোনো সন্ধান নাই এবং সে-কারণে বাংলা একাডেমী কর্তৃক প্রকাশিত 'আবুল মনসুর আহমদ রচনাবলী'তে এটি অন্তর্ভুক্ত করা সম্ভব হয়নি। এ সম্পর্কে সম্পাদক ড. রফিকুল ইসলাম বলেছেন: "দুর্ভাগ্যবশত *মুসলমানী কথা* এবং *নয়াপড়া* আমরা অনেক চেষ্টা করেও সংগ্রহ করতে পারিনি, আর সেজন্যই রচনাবলীতে ঐ দুটি রচনা সংযোজন করা গেল না।"[৭] তবে লেখক এই গ্রন্থ সম্পর্কে তাঁর *আত্মকথা*'য় যা বলেছেন, তা থেকে গ্রন্থ রচনার উদ্দেশ্য, গ্রন্থের বিষয়বস্তু ও তার ভাষা ব্যবহার সম্পর্কে একটা ধারণা লাভ করা যায়। লেখকের ভাষায়:

> আমি তখন ময়মনসিংহ জজকোর্টে ওকালতি করি। নতুন উকিল, পশার খুব জমে নাই। সাহিত্যিক নেশায় এবং উপরি আয়ের জন্য 'নয়াপড়া' নামক চার খণ্ডের একখানা শিশু পাঠ্য বই লিখি। চার খণ্ড বই মকতবের চার ক্লাসের জন্য টেক্সট বুক কমিটি কর্তৃক অনুমোদিত হয়। এই চারখানা বই হইতে আমি যথেষ্ট টাকা-কড়ি পাইতে থাকি। তিন বছর মুদ্দত পার হয়-হয় অবস্থায় বাংলার প্রাইমারি এডুকেশন এ্যাক্ট পাশ হয়। এই নতুন আইনে প্রাইমারি স্কুল ও মকতব এক করিবার বিধান হয়। আমার 'নয়াপড়া' অনুমোদিত পুস্তকগুলির মধ্যে 'এ' ক্লাসের বই ছিল।
>
> ...এমন সময় টেক্সট বুক কমিটির তরফ হইতে এক পত্রে আমাকে জানান হইল যে, আমার 'নয়াপড়া' নতুন আইনে পাঠ্য পুস্তকরূপে অনুমোদিত হইয়াছে, তবে উহাতে যে সব আরবী-ফারসী শব্দ আছে, সে সব শব্দের জায়গায় বাংলা প্রতিশব্দ বসাইতে হইবে।[৮]

কিন্তু লেখক তা মেনে নিতে রাজি না হওয়ায় পাঠ্যপুস্তক কমিটি বইটির অনুমোদন বাতিল করে দেয়। লেখক এ ঘটনাটিকে তাঁর জীবনের 'দ্বিতীয় স্যাক্রিফাইস' হিসেবে উল্লেখ করেছেন। পাঠ্যপুস্তক কমিটির অভিযোগ ছিল: গ্রন্থে ব্যবহৃত 'আল্লা' 'খোদা' 'পানি' ইত্যাদি মুসলমানি শব্দ হওয়ায় তা হিন্দু ছাত্রদের ধর্মভাবে আঘাত লাগবে। কিন্তু লেখক তাদের জানালেন: "একশ বছরের বেশি বাংলার মুসলমান ছাত্ররা পাঠ্য-পুস্তকে 'ঈশ্বর' 'ভগবান' 'জল' পড়তেও যদি তাদের ধর্মভাবে আঘাত লাগিয়া না থাকে, তবে এখন হইতে 'আল্লা' 'খোদা' পড়িয়া হিন্দুদেরও ধর্মভাবে আঘাত লাগা উচিত নয়।"[৯] মূলত লেখক-জীবনের প্রথম থেকেই তিনি বাঙালি মুসলমানের মুখের ভাষাকে সাহিত্যে স্থান দিতে চেয়েছিলেন এবং এ বিষয়ে তিনি কারো সঙ্গে আপোষ করেননি। এ সময় শেরেবাংলা এ. কে. ফজলুল হক অবিভক্ত বাংলার প্রধানমন্ত্রী ও শিক্ষামন্ত্রীর দায়িত্বে ছিলেন এবং তিনিও যে আগে থেকে গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত থাকা হিন্দু আমলাদের ইচ্ছার ক্রীড়নক ছিলেন, তার প্রমাণ পাওয়া যায়— শত চেষ্টা করেও তিনি এই বইটি আর চালু করাতে পারেননি। উপরন্তু 'হিন্দু বদমায়েশ অফিসার'দের জ্বালায় কিছু করতে পারি না বলে দায় এড়িয়েছেন। এখানে বাংলা সাহিত্যে বাঙালি মুসলমানের ভাষাকে কিরূপ অবজ্ঞা করা হতো, এ বিষয়টি যেমন পরিস্ফুটিত হয়েছে, তেমনি হিন্দু আমলা-নির্ভর প্রশাসনের একটি চিত্রও উঠে এসেছে, অথচ তখন রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ছিল মুসলমানরা। তবে এ বিষয়ে লেখক যে বাস্তবতার কাছে পরাজিত হয়েছেন তা বোঝা যায় তাঁর এ উক্তিতে: "ভাষা ও শব্দের হিন্দু মুসলমানিত্ব সম্বন্ধে *মুসলমানী কথার* অভিজ্ঞতার সাথে যোগ হইল *নয়া-পড়ার* অভিজ্ঞতা। কঠোর বাস্তবতার কাছে ভাবাবেগ-সম্ভূত আদর্শবাদ পরাজিত হইল।"[১০] এই আদর্শবাদের পরাজয়

নয়াপড়ার ক্ষেত্রেও যেমন হয়েছিল, তেমনি হয়েছিল তাঁর আজীবনের সাহিত্য সাধনায় বাংলাভাষা ও সাহিত্যে নিজের আদর্শ প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে।

ছোটদের কাসাসুল আম্বিয়া (১৯৫০)

এ গ্রন্থটি প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ডে প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৫০ সনে। এটি কাসাসুল আম্বিয়া, অর্থাৎ, ইসলামের নবীদের বিভিন্ন কাহিনী নিয়ে শিশু-কিশোরদের উপযোগী গল্প সংকলন। অবশ্য নবীদের বিভিন্ন অলৌকিক ঘটনা বা তাঁদের জীবনের যে বিভিন্ন কাহিনী আজও মুসলমান সমাজে প্রচলিত আছে, তা সব বয়সের মানুষেরই উপভোগ্য। তবে ইসলাম ধর্মের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট এসব ঘটনাকে কখনোই রূপকথা বলা যাবে না, যদিও ঘটনার বর্ণনারীতি ও বিষয়বস্তুর সঙ্গে রূপকথার যথেষ্ট মিল রয়েছে। ইসলাম ধর্ম অনুযায়ী সকলেই নবীদের এসব কাহিনীকে সত্য বলেই বিশ্বাস করেন এবং বিভিন্ন ধর্মীয় গ্রন্থের বর্ণনায় তার প্রমাণও আছে। লেখকের দুই খণ্ডে লিখিত *ছোটদের কাসাসুল আম্বিয়ার* গল্পগুলো ইসলাম ধর্মের অতীত ইতিহাস হিসেবেই বিবেচ্য।

ছোটদের কাসাসুল আম্বিয়ার প্রথম খণ্ডে মোট আটটি গল্প স্থান পেয়েছে: 'ইবলিসের পরদায়েশ', 'আদম-হাওয়া', 'নূহ নবীর কিশতি', 'শাদ্দাদের বেহেশত', 'নমরুদের অগ্নিকুণ্ড', 'ইবরাহিমের কোরবানি', 'দাউদ ও তালুদ' এবং 'হাওয়ার বাদশাহ সুলেমান'। সাহিত্য হিসেবে এ গল্পগুলোর কোনো শৈল্পিক মূল্য না থাকলেও সকলের বোঝার জন্য এসব গল্পে লেখক যে সহজ-সরল ভাষা প্রয়োগ করেছেন তা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। নিম্নে গল্পগুলোর বিষয়বস্তু সম্পর্কে একটা ধারণা দেওয়া হলো:

ইবলিসের পরদায়েশ গল্পে সৃষ্টিকর্তা কিভাবে আজাজিল নামক জিনকে তার ইবাদতের কারণে ফেরেশতা হিসেবে মর্যাদা দিয়েছিলেন, আর মাটির তৈরি মানুষ আদমকে সিজদা না করার অপরাধে ইবলিস শয়তানে পরিণত করলেন, তার ইতিহাস বর্ণিত হয়েছে। অতঃপর সৃষ্টিকর্তার কাছ থেকে চেয়ে নেওয়া তিনটা শক্তি (গায়েব হয়ে যেকোনো রূপ ধারণ করা, আসমান-জমিনের যেকোনো স্থানে মুহূর্তের মধ্যে উপস্থিত হওয়া এবং যে-কোনো জীব-জন্তুর দেহে প্রবেশ করার ক্ষমতা) অর্জন করে শয়তান এই শান্তিপূর্ণ দুনিয়াকে কিভাবে অশান্তিময় করার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হলো, সে-কথাও বর্ণিত হয়েছে। **আদম হাওয়া** গল্পে পৃথিবীর প্রথম মানুষ আদিপিতা আদমের বাম পাঁজরের হাড় থেকে সৃষ্টিকর্তা কীভাবে আদিমাতা হাওয়াকে সৃষ্টি করলেন এবং ময়ূরবেশী শয়তানের প্ররোচনায় নিষিদ্ধ গন্দম ফল খেয়ে সৃষ্টিকর্তার নির্দেশ অমান্যের অপরাধে বেহেশত থেকে দুনিয়ায় নিক্ষিপ্ত হলেন, সে কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। **নূহ নবীর কিশতি** গল্পের বিষয়বস্তু হলো: নয়শ পঞ্চাশ বছর ধরে নূহ নবী ধর্মপ্রচার করলেও মাত্র আশি জন ছাড়া যখন আর কেউ ইসলাম গ্রহণ করল না, বরং নবীকে বিভিন্ন ধরনের নির্যাতন করতে লাগল, তখন আল্লাহর নির্দেশে জিবরাইলের নির্দেশনায় নূহ নবী একটা বিরাট নৌকা তৈরি করে তাঁর অনুসারী ও বিভিন্ন জীব-জন্তুদের উঠাল, আর বন্যা শুরু হলে সমস্ত অবিশ্বাসীরা পানিতে ডুবে মারা গেল। অতঃপর ধীরে ধীরে পানি কমলে ছয়মাস আটদিন পর নূহ নবী ও তার অনুসারীরা মক্কা নগরীর জুদ্দি

পাহাড়ে নামলেন এবং ঐ নৌকা দিয়ে একটা মসজিদ নির্মাণ করলেন। **শাদ্দাদের বেহেশত** গল্পে ইয়েমেনের বাদশাহ শাদ্দাদ ধন-দৌলত ও প্রভাব প্রতিপত্তির বড়াই করে যখন নিজেকে খোদা হিসেবে দাবি করল এবং হুদ নবীর নিষেধ উপেক্ষা করে খোদার প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে যখন প্রচুর টাকা-পয়সা খরচ করে একটা বেহেশত নির্মাণ করে সেই বেহেশতে নামতে গেল, তখনই আল্লাহর নির্দেশে আজরাইল ফেরেশতা তার জান কবচ করল। **নমরুদের অগ্নিকুণ্ড** গল্পে মূর্তিপূজারী বাদশাহ নমরুদ কিভাবে ইবরাহিম নবীর ইসলাম ধর্মের দাওয়াত উপেক্ষা করে আল্লাহর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করল ও মূর্তি ভাঙার অপরাধে নবীকে অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করল এবং আল্লাহর নির্দেশে কিভাবে সে অগ্নিকুণ্ড শান্তিময় স্থানে পরিণত হলো, সে কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। এ ছাড়া সাত লক্ষ সৈন্য সাজিয়ে নমরুদ যখন যুদ্ধ করার জন্য আল্লাহর সৈন্যদের আহ্বান জানাল, তখন আল্লাহ সাত লক্ষ মশা পাঠিয়ে দিলেন ও এক-একটি মশা এক-একজন সৈন্যের নাক দিয়ে মাথায় ঢুকে কামড়াতে লাগল। অন্যদিকে একটি মশা নমরুদের মাথায়ও ঢুকল ও কামড়াতে লাগল। তারপরও নমরুদ ইসলাম ধর্ম গ্রহণ না করলে মশার কামড়ে এক সময় মারা গেল। **ইবরাহিমের কোরবানি** গল্পে মুসলমানদের প্রধান ধর্মীয় উৎসব ঈদুল আযহা, অর্থাৎ, কোরবানি ঈদের মূল প্রেরণা হযরত ইবরাহিমের পুত্র কোরবানির ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। স্বপ্নের মাধ্যমে আল্লাহ বৃদ্ধ নবী ইবরাহিমের শিশুপুত্র ইসমাইলকে কোরবানি করার নির্দেশ দেন এবং সে অনুযায়ী এক নির্জন স্থানে গিয়ে নিজের চোখ বেঁধে নবী ইবরাহিম পুত্র ইসমাইলকে কোরবানি করেন, কিন্তু কোরবানির পর চোখ খুলে দেখেন: সেখানে এক দুম্বা কোরবানি হয়েছে, আর ইসমাইল পাশে দাঁড়িয়ে হাসছে। **দাউদ ও তালুত** গল্পে নবী দাউদ ও এক অত্যাচারী বাদশাহ জালুতের কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। জালুত নামক এক অত্যাচারী বাদশাহর সঙ্গে তালুত নামক এক ন্যায়পরায়ণ বাদশাহর যুদ্ধে নবী দাউদ তালুতের পক্ষে নেতৃত্ব গ্রহণ করে জালুতকে পরাজিত করলেন, কিন্তু বাদশাহ তালুত প্রতিশ্রুতি মোতাবেক নবী দাউদকে অর্ধেক রাজ্যসহ তার মেয়ে দান করলেন না, বরং দাউদকে হত্যার ষড়যন্ত্র করলেন। অথচ বাদশাহ তালুত ও শিষ্যদের ঘুমন্ত অবস্থায় পেয়েও নবী দাউদ তাদের হত্যা করলেন না। বাদশাহ তালুত তার শত্রুদের দ্বারা নিহত হলে প্রজারা নবী দাউদকেই সিংহাসনে বসালেন এবং তিনি দেশে শান্তি-শৃঙ্খলা আনয়ন করলেন। **হাওয়ার বাদশাহ সুলেমান** ছোট-ছোট কয়েকটি গল্পের সমন্বয়ে গঠিত। বাদশাহ সুলেমান বাতাসের গতিতে যেকোনো জায়গায় যেতে পারতেন এবং জগতের সকল জীবজন্তুর ভাষা তিনি বুঝতেন ও তাদের সঙ্গে কথাবার্তা বলতেন। গল্পে নবী দাউদের পুত্র নবী সুলেমানের শিশু বয়সের ন্যায়বিচার সংক্রান্ত বুদ্ধি নিয়ে দুটি এবং পরিণত বয়সে জীবজন্তু-কীটপতঙ্গদের দাওয়াত করে খাওয়ানো নিয়ে একটি ও পরিশেষে রাজ্য হারিয়ে আবার তা পুনরুদ্ধার সংক্রান্ত ইমানের পরীক্ষা নিয়ে আরেকটি ঘটনা বর্ণিত হয়েছে।

ছোটদের কাসাসুল আম্বিয়ার দ্বিতীয় খণ্ডেও আটটি গল্প স্থান পেয়েছে: 'আইউব ও রহিমা', 'মাছের পেটে ইউনুস', 'ইউসুফ জোলেখা', 'মুসা ও ফেরাউন', 'কারুনের মাল', 'খাজে খিযির', 'ইয়াজুস-মাজুস' এবং 'মরিয়ম ও ঈসা'।

কাসাসুল আম্বিয়ার এসব গল্পের সঙ্গে সব মুসলমানই কম-বেশি পরিচিত এবং সারা বিশ্বের মুসলমান সমাজ তথা বাঙালি মুসলমান সমাজেও তা বহুল প্রচারিত। লেখক এই গল্পগুলোকে শিশু-কিশোরদের উপযোগী করে মিথের আকারে তা লিখিতভাবে নতুন করে পরিবেশন করেছেন। এখানে তাঁর গল্প বলার ঢংটিও শিশু-কিশোর উপযোগী এবং প্রতিটি গল্পের শুরুটাও বেশ চমৎকার:

> শয়তানের আরেক নাম ইবলিস, এর নাম আমরা সবাই জানি। অথচ আমরা কখনও দেখি নাই। না দেখিলেও শয়তানকে আমরা ভাল রূপেই চিনি। কোন লোক দুষ্ট-বদমায়েস হইলে আমরা বলি; লোকটা কি শয়তান। কেহ ইচ্ছা করিয়া অপরের অনিষ্ট করিলে আমরা বলি; লোকটা একেবারে ইবলিস। তবেই দেখা যাইতেছে, শয়তান বা ইবলিসকে আমরা বদমায়েশের রাজা বলিয়া মনে করিয়া থাকি। এই শয়তান কে কেনই বা সে শয়তান হইল। এসব কথা জানিবার কৌতূহল নিশ্চয়ই তোমাদের হয়। তবে শোন! শয়তানের নাম আগে ছিল আজাজিল...।[১১]

অথবা

> আরব দেশে একদা হানা নামে একজন মেয়েলোক ছিলেন। তাঁর স্বামীর নাম ছিল ইমরান। হানা বিবি খুব ধার্মিক ছিলেন। তাঁর পেটে কোনও সন্তান না হওয়ায় মিয়া-বিবিতে বড়ই মন-দুঃখে কাল কাটাইতেন।[১২]

এভাবেই আবুল মনসুর আহমদ প্রতিটি গল্পের শুরুতেই একটা চৎমকারিত্ব এনে পাঠকের কৌতূহল জাগ্রত করেছেন। এ ছাড়া প্রতিটি গল্পের শেষেও একটা মিলনাত্মক ভাব পরিবেশন করে কাহিনীর সমাপ্তি টেনেছেন। যেমন: "আইউব নবী সমস্ত সুখ-সৌভাগ্য দ্বিগুণ আকারে ফিরিয়া পাইলেন এবং পরম সুখে জীবনযাপন করিতে লাগিলেন।"[১৩] অথবা "তামাম দামেস্কবাসী আল্লাহর কুদরত দেখিয়া তাঁর উপর ইমান আনিল। ইউনুস নবীর হেদায়েতে দামেস্কবাসী শান্তিতে ও নিরাপদে দিন গুজরান করিতে লাগিল।"[১৪] শিশু-কিশোরদের জন্য প্রথাগত গল্পের ধারাবাহিকতায় ইসলাম ধর্মের বিভিন্ন নবীদের কাহিনী নিয়ে এসব গল্পের যেমন একটা ধর্মীয় সত্যতা রয়েছে, তেমনি মুসলমানরা তা বিশ্বাসও করে থাকেন এবং একারণে বাবা-মায়েরা পরম আগ্রহে 'ঠাকুরমার ঝুলি' শ্রেণীর গল্পের বিকল্প হিসেবে তাদের ছেলেমেয়েদের এসব গল্প শোনাতে আগ্রহবোধ করেন। এসব গল্পের আরেকটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে প্রতিটি গল্পের মধ্যেই একটা ধর্মীয় নৈতিক শিক্ষা আছে, যে শিক্ষায় ছেলেমেয়েরা ধর্মের প্রতি অধিক আকৃষ্ট হবে। তাই এসব গল্প রূপকথার পর্যায়ে পড়ে না। এ সম্পর্কে ড. রফিকুল ইসলামের মন্তব্য:

> শিক্ষিত অশিক্ষিত নির্বিশেষে মুসলমান নর-নারী শিশু প্রায় সকলেই ঐসব কাহিনীর সঙ্গে পরিচিত এবং তাদের রচিত লোক ও পুঁথি সাহিত্যে বহুল ব্যবহৃত। কাসাসুল আম্বিয়ার কাহিনীগুলিকে রূপকথা বলা যাবে না কারণ এসব কাহিনী কল্পিত নয়, বিভিন্ন একেশ্বরবাদী ধর্মের পবিত্র গ্রন্থ যেমন বাইবেলের ওল্ড ও নিউ টেস্টামেন্ট এবং পবিত্র কোরআন শরীফে ঐসব নবীদের কাহিনী পাওয়া যায়। ইসলাম ধর্মের পূর্ববর্তীধারায় খ্রিস্টান ও ইহুদি ধর্মের পয়গম্বরগণও নবীরূপে স্বীকৃত। সুতরাং ঐ সব কাহিনী মুসলমানদের ঐতিহ্য ও পুরাণ সদৃশ। আবুল মনসুর আহমদ সহজ সরল সরস কথ্য বাংলায় কাসাসুল আম্বিয়াকে আধুনিক সাহিত্যে

> প্রতিষ্ঠিত করেছেন, পূর্বে কাহিনীগুলি সমাজের লোকস্তরে প্রচলিত ছিল মাত্র। সুতরাং ছোটদের কাসাসুল আম্বিয়া শুধু শিশু-কিশোর পাঠকদের জন্য নয় বরং কেচ্ছা কাহিনী শোনার আগ্রহী বড়দের জন্যেও ভাণ্ডারস্বরূপ। বিশেষত যে কবি-সাহিতিকগণ 'মিথ' বা পুরাণের জন্যে দেশ বিদেশের প্রাচীন সাহিত্য খুঁজে বেড়ান তারাও কাসাসুল আম্বিয়া থেকে তাদের সাহিত্যে মিথের অভাব পূরণ করতে পারেন।[১৫]

কাসাসুল আম্বিয়ার গল্পগুলো সাহিত্যপদবাচ্য না হলেও ভাষা-ব্যবহারের দিক থেকে গ্রন্থটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। আবুল মনসুর আহমদ পূর্ব-বাংলার সাহিত্যে স্বতন্ত্র মুসলিম ধারা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে যে 'স্টান্ডার্ডাইজড কথ্য বাংলা'র জন্য আজীবন সংগ্রাম করেছেন, সেই ভাষাতেই এ গ্রন্থ রচিত হয়েছে। এ গ্রন্থের বিজ্ঞাপন হিসেবে 'জীবন ক্ষুধা' উপন্যাসের প্রথম মুদ্রণের শেষে উল্লিখিত হয়েছিল: "সহজ-সরল ঝরঝরে ভাষায় কিশোরদের দ্রুতপঠন ও প্রাইযের উপযোগী শ্রেষ্ঠ পুস্তক। আপনার ছেলেমেয়েদের শিক্ষার তমদ্দুনী বুনিয়াদ যদি পাকা করতে চান তবে এই পুস্তকের এক-এক কপি তাদের হাতে দিন।"[১৬] পশ্চিমবঙ্গীয় ভাষা-সাহিত্যের ধারা থেকে পৃথক হয়ে সদ্য প্রতিষ্ঠিত মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ পাকিস্তান রাষ্ট্রের 'তমুদ্দনী বুনিয়াদ' রক্ষার সংকল্প মাথায় রেখেই আবুল মনসুর আহমদ ১৯৫০ সনে এই গ্রন্থটি রচনা করেন। তাই এটি রচনার পেছনে লেখকের একটা রাজনৈতিক উদ্দেশ্য ছিল বলে মনে করা যায়।

পরিবার পরিকল্পনা (১৯৬৭)

এটি একটি যৌনবিজ্ঞান বিষয়ক গ্রন্থ। লেখক গ্রন্থটিকে একটি 'সন্দর্ভ পুস্তক' হিসেবে অভিহিত করেছেন।[১৭] গ্রন্থটি প্রথম প্রকাশিত হয় আহমদ পাবলিশিং হাউস, ঢাকা থেকে ১৯৬৭ সনে এবং এর পরে আর কোনো মুদ্রণ হয়নি। "নর-নারীর যৌন-জীবনের বৈজ্ঞানিক অথচ সাহিত্য-রসমণ্ডিত ব্যাখ্যাই এতে প্রদান করা হয়েছে এবং সে-সঙ্গে জন্ম-নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজনীয়তা ও উপায় সম্পর্কে বলা হয়েছে।"[১৮] গ্রন্থটি লেখার ক্ষেত্রে লেখক একটি অতীত অভিজ্ঞতার বর্ণনা দিয়েছেন। ১৯৩৫ সনের দিকে ময়মনসিংহে অবস্থানকালীন জজকোর্টে নতুন ওকালতি ও স্ত্রীর অসুস্থতাহেতু টাকার প্রয়োজনে ময়মনসিংহের তৎকালীন এডিশনাল এস.পি. আবুল হাসনাতের যৌনবিজ্ঞান বিষয়ক একটি গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি সংশোধন-পরিমার্জনের জন্য গ্রহণ করেন। প্রথমে লেখক এটিকে একটি অশ্লীল পুস্তক হিসেবে মনে করলেও যৌনবিজ্ঞান বিষয়ক কিছু বিদেশী ও এদেশীয় অনেক গ্রন্থ পড়ে সে ভুল ধারণা ভাঙে। আবুল হাসনাত সাহেবের নামে প্রচলিত *যৌনবিজ্ঞান* গ্রন্থটি সম্পর্কে লেখকের বক্তব্য:

> তিনি (আবুল হাসনাত) আমাকে হ্যাভলক এলিস, ফোরেল এবং মেরিস্টোপস প্রভৃতির বেশ কিছু বই পড়িতে দিলেন। প্রথম চারমাস আমি শুধু পড়িলাম ও নোট করিলাম। পরের দুইমাস আমি অবিরাম লিখিয়া গেলাম। চার মাসে আমি মোট ১৪৩ খানা যৌনবিজ্ঞানের বই পড়া শেষ করিয়াছিলাম। এর মধ্যে চল্লিশ-খানার বেশি বড় বড় বই। আর শতখানেকের বেশি চটি বই। ...এই সব বই পড়িয়া আমি সম্পূর্ণ নতুন জ্ঞান লাভ করিলাম। সাধারণভাবে জীবন-দর্শন বিশেষভাবে যৌন-জীবন সম্পর্কে আমার ধ্যান-ধারণার বহু পরিবর্তন হইল। ...লেখাটাও এমন প্রাণবন্ত, জোরালো, যুক্তিপূর্ণ ও শালীন ভাষায় রচিত হইল যে, যিনি এই বইয়ের জন্য ছয়মাসে

> আমাকে ছয় হাজারেরও বেশি টাকা দিলেন, তিনি পুস্তকের ভূমিকার একাংশ পড়িয়াই আর পড়িলেন না। সোজা ছাপার ব্যবস্থা করিলেন।
>
> ...নিজের লেখা ছাপার সময়ে প্রুফ দেখার আগ্রহ আমার বরাবরের। নিজের লেখাটা তা যার নামেই প্রকাশ হউক না কেন, ভুল ছাপান হইলে আমার মনে অসহনীয় কষ্ট হইত। ... ছাপা শেষ হইয়া আসিতে থাকায় আবুল হাসনাত সাহেব আমাকে আরেক বিপদে ফেলিলেন। তিনি আমাকে তাঁর বইয়ের কো-অথার রূপে নাম দিতে চাপিয়া ধরিলেন। আমার মধ্যস্থ বন্ধুদ্বয়ও সে অনুরোধে যোগ দিলেন। কিন্তু এবার আমি দৃঢ়তার সাথে অস্বীকার করিলাম।[১৯]

সমকালে কলকাতার বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা ও বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ আবুল হাসনাত সাহেবের *যৌনবিজ্ঞান* বইটাকে আবুল মনসুর আহমদের বই হিসেবেই জেনেছিলেন এবং তাঁর উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছিলেন। অবশ্য আবুল হাসনাত সাহেবও তাঁর গ্রন্থের ভূমিকায় তাঁর প্রতি ঋণ স্বীকার করে বলেছেন: "মূল সংস্করণে সুসাহিত্যিক আবুল মনসুর আহমদ সাহেব আমাকে প্রভূত সাহায্য করিয়াছিলেন।"[২০] আবুল মনসুর আহমদ এই গ্রন্থ রচনা বা সংশোধন-পরিমার্জন করতে গিয়ে যে জ্ঞান অর্জন করেছিলেন এবং এই জ্ঞান-পিপাসার ধারাবাহিকতায় অন্যান্য আরো যে-সমস্ত বই পড়েছিলেন তারই আলোকে বৃদ্ধ বয়সে *পরিবার পরিকল্পনা* নামক একটি 'সন্দর্ভ-পুস্তক' রচনা করেন। এ বিষয়ে লেখক বলেছেন:

> সক্রিয় রাজনীতি ও ওকালতি হইতে অবসর গ্রহণের পর বৃদ্ধবয়সে নিজেই 'পরিবার পরিকল্পনা' নামে যৌনবিজ্ঞানের একখানা বইও লিখিয়া ফেলিয়াছি। তাতে আমি খাদ্যাভাব মোচনের প্রচলিত উদ্দেশ্যে জন্ম-নিয়ন্ত্রণের চেয়ে সম্পত্তি ও পরিবারের সুখ-শান্তির জন্য জন্ম-নিয়ন্ত্রণকে উচ্চতর ও মহত্তর জীবন-বিধি রূপে প্রমাণ করিবার চেষ্টা করিয়াছি।[২১]

গ্রন্থের শুরুতে লেখক বলেছেন—

> আদম ও হাওয়া। একটি নর, একটি নারী, শুধু একটি নর আরেকটি নারী নয়, একজোড়া নর-নারী। যতদিন তাঁরা বেহেশতে ছিলেন, ততদিন তাঁরা ছিলেন শুধু স্বামী-স্ত্রী। দুনিয়ায় নামিয়া হইলেন তাঁরা জনক-জননী। পাতিলেন তাঁরা সংসার। জন্ম দিলেন তাঁরা সন্তানের। গড়িলেন তাঁরা পরিবার। ইতিকথা হিসেবেই বুঝেন, আর রূপক হিসেবেই বুঝেন, মানবজাতির আদি ইতিহাস এই; একটি নর ও একটি নারীর যৌনমিলন। ...সৃষ্টিকর্তা মাস্টার প্ল্যানার— আল্লাহ খায়রুল মাহেরিন। তিনি আঠার হাজার আলমের সৌর-জগত চালাইতেছেন প্ল্যান করিয়াই। তাঁর খলিফাকেও নিজের এই ক্ষুদ্র দুনিয়া চালাইতে হয় প্ল্যান করিয়াই। এরই নাম পরিবার পরিকল্পনা। ছোট মুখে এই বড় কথাটিই বলিতে চেষ্টা করা হইয়াছে এই পুস্তকে।[২২]

এভাবে ইসলামের আদি-ইতিহাস বর্ণনার মাধ্যমে সৃষ্টিকর্তাকে সবচেয়ে বড় পরিকল্পনাবিদ আখ্যা দিয়ে তাঁর সৃষ্টি হিসেবে মানুষকে পরিকল্পনা-মাফিক জীবনধারণের ও এই পৃথিবীকে সুখ-শান্তিতে ভরে দিতে প্রথম করণীয় হিসেবে পরিবারকে পরিকল্পনা অনুযায়ী চালানোর পরামর্শ দিয়েছেন লেখক।

আল কোরআনের নসিহৎ (১৯৭৫)

এটি মুসলানদের পবিত্র ধর্মগ্রন্থ আল কোরআনের নির্বাচিত অনুবাদ। ১৯৭৫ সনে এটি প্রথম প্রকাশ করে খোসরোজ কিতাব মহল। গ্রন্থের শুরুতে 'আমার আরজ' নামক ভূমিকায় লেখক এ গ্রন্থ রচনার একটি ইতিহাস বর্ণনা করেছেন। মূলত ছাত্রজীবন থেকেই লেখকের একটা

ইচ্ছা ছিল জনগণের ভাষায় জনগণকে কোরআন পড়ানো। অর্থাৎ, সহজ বাংলা ভাষায় 'কোরআনের সিলেকশন' বের করা। এ উদ্দেশ্যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় তিনি *সওগাত* পত্রিকার সম্পাদক মোহাম্মদ নাসিরুদ্দিনের উৎসাহ ও অর্থ সাহায্যে কোরআনের নির্বাচিত অংশের অনুবাদ করেন এবং তা ছাপাও শুরু করেন। কিন্তু কাগজের সমস্যা এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ও পাকিস্তান-আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে ছাপার কাজ সম্পূর্ণ হয়নি। দেশ বিভাগের পর কলকাতা থেকে সবকিছু ঢাকায় আনার পথে উক্ত পাণ্ডুলিপি ও ছাপার ব্লক হারিয়ে যায়। তখন নতুন করে আর লেখা সম্ভব হয়নি। আইউব খানের শাসনামলে আর একবার এটি লেখার উদ্যোগ নিলেও তা সফল হয়নি। অতঃপর ১৯৭৪ সনে তিনি এটি নতুন করে লিখে প্রকাশ করেন। অর্থাৎ, *আল কোরআনের নসিহৎ* গ্রন্থটি মূলত দুইবার লেখা হয়েছে এবং দ্বিতীয় বারের অনুবাদটাই পাঠকদের হাতে এসে পৌঁছেছে। এই গ্রন্থ লেখার পেছনে লেখকের মূল অনুপ্রেরণা ছিল খ্রিস্টান মিশনারি, বাইবেল সোসাইটি, ব্যাপ্টিস্ট মিশনসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান। তারা যেমন বাংলায় অনূদিত বাইবেলসহ বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থের বা তার নির্বাচিত অংশের অনুবাদ বিনামূল্যে ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে বিতরণ করে, তেমনি লেখকের উদ্দেশ্য ছিল মুসলিম বা অন্য ধর্মীয় বাঙালি জনগোষ্ঠী যাতে আল কোরআনের গুরুত্বপূর্ণ অংশ তাদের নিজের ভাষায় সহজে জানতে পারে। তাই লেখক চেয়েছিলেন এই বইটিকে 'পকেট সাইজের' করে জনগণের মধ্যে বিতরণ করা। তবে সেটা না হলেও এটা যেন আগ্রহী পাঠকরা বিছানায় বা টেবিলে হাতের কাছে রেখে পড়তে পারেন, তার ব্যবস্থা করা হয়েছে বলে লেখক মনে করেন। আর সেক্ষেত্রে লেখকের বক্তব্য:

> আমি কোরআন পড়াইতে চাই শিক্ষার লাগি। সওয়াবের লাগি তেলাওয়াত করাইতে চাই না। সে কাজটা মুসল্লি-মুত্তাকি ধার্মিক মুসলমানরার লাগি। সে কাজ করিতে যে আদব-তমিয দেখাইতে ও অযু-গোসল করিতে হয়, আমার পাঠকরার লাগি তা সম্ভবও না, তার দরকারও হইবে না। মূলতঃ এই কারণেই আমার এই সিলেকশন লেখা। আমরার দেশের গরিব-গোবরা ত বটেই, মধ্যবিত্ত বাপ-মা ও তাঁরার ছেলেমেয়েরা কার্যতঃ এতখানি পাক-সাফ থাকিতে পারেন না। এমনি নাপাক অবস্থায়ও যাতে তারা আল্লার সাথে কথা বলার মতই কালামুল্লার সাথেও আলাপ-আলোচনা করিতে পারেন, সেই উদ্দেশ্যেই পুরা কোরআনের বদলে শুধু কোরআনের সিলেকশন বাহির করার আমার এই উদ্যোগ।[২৩]

লেখকের এই উদ্দেশ্য সফল হয়েছে বলা যায়।

আল কোরআনের নসিহৎ গ্রন্থটি তিনটি ভাগে বিভক্ত। প্রথম ভাগে 'ধর্মজীবন' সম্পর্কে কোরআনের বিভিন্ন অংশ থেকে নির্বাচিত আয়াতের অনুবাদ। এ অংশে মোট চৌদ্দটি অধ্যায় রয়েছে। এ অধ্যায়গুলোতে রয়েছে সৃষ্টিকর্তা, সৃষ্টজীব, মানুষ, জীবন-মৃত্যু, পরকাল, ধর্ম, ধর্মগ্রন্থ, নবী-রসুল, ফেরেশতা, বেহেশত, বিচারের দিন, উপাসনা, তকদির ও আমল এবং শয়তান সম্পর্কিত আয়াতের অনুবাদ। দ্বিতীয় ভাগে স্থান পেয়েছে 'সংসার-জীবন'। এ অংশের মোট চৌদ্দটি অধ্যায়ে স্থান পেয়েছে: মা-বাপ, স্বামী-স্ত্রী, তালাক, এতিম, ধন-দওলত, পোশাক-পাতি, মিতব্যয় ও অপব্যয়, বখিলি ও সাখাওয়াতি, লোভ ও সবুর, অধ্যবসায়, বিনয় ও অহংকার, সততা ও ভণ্ডামি, অনুতাপ এবং হালাল-হারাম প্রসঙ্গ। তৃতীয় ভাগে রয়েছে 'সমাজ জীবন' সম্পর্কে কোরআনের বিভিন্ন আয়াতের অনুবাদ। মোট

এগারটি অধ্যায়ে বিভক্ত এ অংশে রয়েছে: সাম্য-ভ্রাতৃত্ব, আদব-কায়দা, ন্যায়বিচার, যুদ্ধ ও শান্তি, যালেম ও মুসলিম, অপরাধ ও শাস্তি, মাফ ও সবুর, তেজারতি, দান-খয়রাত এবং বিভিন্ন পাঁচ মিশালী নসিহত। প্রত্যেকটি আয়াতের অনুবাদের ক্ষেত্রে লেখক প্রমাণ হিসেবে আয়াতের শেষে দুটি সংখ্যা লিখেছেন এবং এর প্রথম সংখ্যাটি দ্বারা সুরা ও দ্বিতীয় সংখ্যাটি দ্বারা ঐ সুরার আয়াত-নম্বর বোঝানো হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ নিচে গ্রন্থের তিনটি ভাগের তিনটি আয়াত দেওয়া হলো:

> আল্লাহ আসমান-জমিন সৃষ্টি করিয়াছেন। আর আসমান থনে পানি নাযিল করেন, পরে তা দিয়া ফসল পয়দা করেন যা তোমরার খোরাকি। তিনি জাহাজরে তোমার অধীন করিয়াছেন যাতে তারা তাঁর হুকুমে সমুদ্দুরে চলাফেরা করিতে পারে। তিনি নদীরেও তোমরার অধীন করিয়াছেন। (১৪ঃ৩২)[২৪]
>
> তোমরার স্ত্রীরা তোমরার লেবাস আর তোমরা তোমরার স্ত্রীর লেবাস। তোমরা একে অপরের সাথে কি কর, আল্লাহ তা জানেন। (২ঃ১৮৭)[২৫]
>
> যদি তোমরা দাদ লইতে চাও, তোমরারে যে পরিমাণ আঘাত করা হইয়াছে দাদ লও তার মিছালে। তবে তোমরা যদি সবুর কর, সেটাই হইবে উত্তম। বেশক আল্লাহ সবুরকারীর সাথেই আছেন। (১৬ঃ১২৬)[২৬]

এই গ্রন্থের একটা বিশেষ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে লেখকের নিজস্ব ভাষাদর্শের প্রয়োগ, অর্থাৎ, পূর্ববঙ্গীয় মুসলমানদের কথ্যভাষা 'ঢাকাইয়া বাংলা'র ব্যবহার। আর এ বিষয়ে তাঁকে অনুপ্রাণিত করেছিলেন আবুল হাশিম—যাঁর নামে তিনি গ্রন্থটি উৎসর্গ করেছেন। বিভাগপূর্ব বাংলার প্রাদেশিক মুসলিম লীগের সেক্রেটারি আবুল হাশিম এসময় (পঞ্চাশের দশক) ঢাকার ইসলামিক একাডেমীর পরিচালক ছিলেন।[২৭] আবুল হাশিম এ গ্রন্থের ভাষা প্রয়োগের ক্ষেত্রে লেখককে বলেছিলেন:

> আমি বলিতেছি, পূর্ব বাংলার মুসলিম জনগণের যবানী ভাষার কথা, আপনি যেটাকে বলেন, 'ঢাকাইয়া বাংলা', আর আপনার সাহিত্যিক বন্ধুরা যাকে বিদ্রূপ করিয়া বলেন 'ময়মনসিংহী ভাষা', আমার অনুরোধ, আপনি আমাদের বংগানুবাদ কুরআনে-করীমকে এই পূর্ববাংলার মুসলিম যবানী বাংলায় তর্জমা করুন।[২৮]

আর আবুল মনসুর আহমদের ভাষাদর্শ ছিল মোটামুটি এটিই। তাই এ গ্রন্থের ভাষা সম্পর্কে তিনি নিজেই বলেছেন:

> এর ভাষায় এমন কিছু শব্দ ব্যবহার করা হইয়াছে যা জনগণের মুখে আছে, কিন্তু সাহিত্যে নাই। সাহিত্যে নাই মানে এখনকার সাহিত্যে নাই। আগেকার দিনের সাহিত্যে এই সব শব্দের অনেকগুলিই চালু ছিল। পুঁথি সাহিত্যে ত ছিলই; গ্রাম-বাংলার বহু কবি-সাহিত্যিকদের পুস্তকেও ছিল। ...আমি যে জনগণের ভাষায় লিখিবার চেষ্টা করিয়াছি, সেটা বাংগাল দেশের জনগণ। কাজেই তারার মুখের যবানই আমি ব্যবহার করিয়াছি।[২৯]

মূলত লেখকের গল্প-উপন্যাস-প্রবন্ধে যে ভাষার ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়, তা ছিল তাঁর আদর্শায়িত ভাষা 'পূর্ববাংলার স্টান্ডার্ডাইয্ড কথ্য বাংলা', আর এই গ্রন্থের ভাষা তা থেকে একটু ভিন্ন হয়ে শুধু পূর্ববাংলার মুসলিম কথ্যবাংলায় রূপান্তরিত হয়েছে। তবে সাহিত্যে এই ভাষার প্রয়োগ কেবলই তাঁর নিজস্বতা হিসেবেই বিবেচ্য।

অগ্রন্থিত রচনা

পূর্বে উল্লিখিত হয়েছে যে, আবুল মনসুর আহমদের অসংখ্য রচনা অগ্রন্থিত অবস্থায় আছে। যেহেতু তিনি তাঁর জীবনের একটা বড় সময় ব্যয় করেছেন সংবাদপত্রে চাকরি করে এবং রাজনীতির সঙ্গে তাঁর ছিল ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ, সে-কারণে সাহিত্য ছাড়াও সম্পাদকীয়-উপসম্পাদকীয়, কলাম লেখা এবং সময়ের প্রয়োজনে বিভিন্ন ঘটনার প্রতিক্রিয়া বা উপদেশ-পরামর্শ দিয়েছেন। এসব লেখাই সমকালীন বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। লেখকের এসব রচনার কিছু তথ্য তাঁর আত্মজীবনীতে পাওয়া যায়। তবে অধিকাংশ তথ্যই পাওয়া যায় যাঁরা বিশ শতকের বিভিন্ন পত্র-পত্রিকার বিষয় নিয়ে গবেষণা করেছেন বা বই লিখেছেন তাঁদের গ্রন্থে। লেখকের সব অগ্রন্থিত রচনা সংগ্রহ করে তাঁর বিচার-বিশ্লেষণ করতে স্বতন্ত্র একটা গবেষণার প্রয়োজন। এসব গ্রন্থের সূত্র ধরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার ও সেখানে রক্ষিত মাইক্রোফিল্ম, বাংলা একাডেমী গ্রন্থাগার ও বাংলাদেশের ন্যাশনাল আর্কাইভস থেকে আবুল মনসুর আহমদের অগ্রন্থিত যে-সব রচনার সন্ধান পাওয়া যায় সে-সম্পর্কে একটা সংক্ষিপ্ত ধারণা দেওয়া হলো:

ওয়াশিংটন আর্ভিং-এর 'টেলস অব-আল হাম্রা' গ্রন্থের অংশবিশেষের অনুবাদ ১৯১৩-১৪ সনের দিকে 'আঞ্জুমান উলামায়ে বাঙ্গালা'র মুখপত্র *মাসিক আল ইসলামে* প্রকাশিত হয়েছিল বলে লেখক তাঁর 'আত্মকথায়' উল্লেখ করেছেন।[৩০] এই অনূদিত অংশটি ছিল স্পেনের গ্রানাডা, কর্ডোভা, সেভিল প্রভৃতি প্রাচীন নগরীর মুসলিম স্থাপত্যের বর্ণনা। এটিই লেখকের প্রথম প্রকাশিত রচনা এবং উক্ত বিষয়বস্তু নিয়ে *আল ইসলাম* পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে কয়েকটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল। পত্রিকার সম্পাদক লেখককে তাঁর প্রবন্ধের জন্য প্রশংসা করেছিলেন এবং আরো প্রবন্ধ লেখার অনুরোধ জানিয়েছিলেন। প্রবন্ধগুলো পাওয়া যায়নি।

'প্রতিদান' নামক একটি গল্প প্রকাশিত হয় ত্রৈমাসিক *বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকায়* ২য় বর্ষ, ১ম সংখ্যা; বৈশাখ, ১৩২৬ বঙ্গাব্দে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারে পত্রিকাটি সংরক্ষিত আছে। এ গল্পের লেখক হিসেবে তিনি নিজের নামের শেষে 'আলী' শব্দটি ব্যবহার করে লিখেছিলেন: 'আবুল মনসুর আহ্‌মদ আলী'। গল্পটি উত্তম পুরুষে লেখা। গল্পের নায়ক মাহমুদ স্কুলের একজন নামকরা ভাল ছাত্র হলেও তার সঙ্গে বন্ধুত্ব হয় আজিজ নামে এক খারাপ ছাত্রের। মাহমুদ যখন বি.এ. ক্লাসে পড়ে তখনো আজিজ ম্যাট্রিক পাশ করতে পারেনি। তিনবার ম্যাট্রিক পরীক্ষায় ফেল করায় মাহমুদের সঙ্গে তার সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যায়। এমনকি মাহমুদ যখন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র তখন আজিজের সঙ্গে একদিন খারাপ ব্যবহার করে। কিন্তু সব সময় মাহমুদের মনের ভেতরে তার প্রতি একটা বিরাট টান ছিল। সময়ের ব্যবধানে মাহমুদ যখন মহকুমা ম্যাজিস্ট্রেট তখন আজিজ গ্রামের একজন অতি সাধারণ মানুষ। তারপরেও গভীর মমত্ববোধ থেকে মাহমুদ আজিজকে স্মরণ করেছে ও খোঁজ করেছে। একদিন নিজের কোর্টেই খুনের আসামী হিসেবে কাঠগড়ায় দেখতে পায় আজিজকে। লোকচক্ষু উপেক্ষা করে আজিজকে জড়িয়ে ধরতে যায় মাহমুদ। কিন্তু আজিজ তা প্রত্যাখ্যান করলে মাহমুদের আত্মসম্মানে আঘাত লাগে। বিচারে আজিজকে দুই বছরের কারাদণ্ড দেয় বিচারক মাহমুদ। কোর্ট থেকে বেরিয়ে দুজনের কথা হয়। মূলত বন্ধু হিসেবে

আজিজের প্রতি মাহমুদ যাতে পক্ষপাতিত্ব না করতে পারে সেজন্যই আজিজ মাহমুদকে প্রত্যাখ্যান করেছিল। এভাবেই চমৎকার প্রতিদানের মাধ্যমে গল্পটি শেষ হয়েছে। আবুল মনসুর আহমদ এরূপ ট্রাজিক ছোটগল্প আর লেখেননি। তবে এ ধারা অব্যাহত থাকলে ব্যঙ্গগল্পের পাশাপাশি ছোটগল্পকার হিসেবেও তিনি যে সার্থকতার পরিচয় দিতে পারতেন, এ গল্পের মাধ্যমে তা বোঝা যায়।

'কুড়ান ভাই' নামে একটি গল্প প্রকাশিত হয়েছিল *সওগাত* পত্রিকার ২য় বর্ষ, ১ম সংখ্যা; অগ্রহায়ণ, ১৩২৬ বঙ্গাব্দে। গবেষক লায়লা জামান তাঁর *সওগাত পত্রিকার সাহিত্যিক অবদান ও সামাজিক ভূমিকা* গ্রন্থে তথ্যটি দিয়েছেন।[৩১] গল্পটি সংগ্রহ করা সম্ভব হয়নি।

'স্বার্থপর' নামে একটি গল্প প্রকাশিত হয়েছিল *সওগাত* পত্রিকার ২য় বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা; ফাল্গুন, ১৩২৬ বঙ্গাব্দে।[৩২] গল্পটি সংগ্রহ করা সম্ভব হয়নি।

'অধিকার' নামে একটি গল্প প্রকাশিত হয়েছিল *সওগাত* পত্রিকার ২য় বর্ষ, ৮-১১ সংখ্যা; আষাঢ়-শ্রাবণ, ১৩২৭ বঙ্গাব্দে।[৩৩] গল্পটি সংগ্রহ করা সম্ভব হয়নি।

'গোলামী সাহিত্য' নামে একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল *সাম্যবাদী* সাময়িক পত্রের ৩য় বর্ষ, ১ম সংখ্যা; পৌষ, ১৩৩১ বঙ্গাব্দে।[৩৪] লেখক অবশ্য তাঁর *আত্মকথায়* মন্তব্য করেছেন: "... ১৯২২ সালে 'বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকায়' প্রকাশিত হয় আমার 'গোলামী সাহিত্য' নামক প্রবন্ধ। এই প্রবন্ধটা বর্তমানে আমার সামনে নাই। অনেক তালাশ করিয়াও যোগাড় করিতে পারিলাম না।"[৩৫] লেখকের এ মন্তব্য সত্য হলে এ-প্রবন্ধটি পরে সাম্যবাদী সাময়িকপত্রে প্রকাশিত হয়েছিল। আমরা *সাম্যবাদী* সাময়িকপত্রেও এ প্রবন্ধের সন্ধান পাই। এ প্রবন্ধে লেখক বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, রমেশচন্দ্র, শরৎচন্দ্র প্রমুখ বাংলা সাহিত্যের দিকপাল সাহিত্যিকদের সাহিত্যকে গোলামী সাহিত্য হিসেবে আখ্যায়িত করে তাদের কঠোর সমালোচনা করেছিলেন। প্রবন্ধের কয়েকটি উদ্ধৃতি:

> মোসলমানদের প্রতি ঔদার্যের অভাবহেতু তার [বঙ্কিমচন্দ্রের] রচিত আদর্শ এতই একদেশদর্শী হইয়া পড়িয়াছিল যে, শতকরা ৫২ জন বাঙালী বঙ্কিম সাহিত্য হইতে বিন্দুমাত্র প্রেরণা পাইল না এবং ঠিক এই কারণেই বঙ্কিমী আদর্শ বাঙলার জন্য এমন ব্যর্থ হইয়া গেল।
>
> ...তাঁর [রবীন্দ্রনাথের] বিরাট সাহিত্য বাঙালীকে জাগরণের পথে, সাধনার মার্গে এক পা আগাইয়া দিতে পারে নাই— বাঙালীর জাতীয় চরিত্রকে অধিকতর কলুষিত করিয়া দিয়াছে মাত্র। যাহা বাকী ছিল; তাহা পূর্ণ করিয়া দিয়াছেন— ভাষার জাদুকর, বিন্যাস-কৌশলের ওস্তাদ— শরৎচন্দ্র। ইহার অসাধারণ হস্তকৌশলে গোটা বাঙালী জাতিটা এমনই হিপ্‌নটাইজ্‌ড্‌ হইয়া পড়িয়াছে যে, শরৎচন্দ্র মদিরা-মত্ত সংজ্ঞাহীন বাঙালী আজ কলুষের নর্দ্দমায় পড়িয়া 'মদাংদেহি' বলিয়া দুই হাতে নর্দ্দমার কর্দ্দম গিলিতেছে। ...ইহাদের অসংখ্য পুস্তকরাশির মধ্যে সর্ব্বত্রই অতি নিপুণতার সহিত বাঙালীকে প্রণয়ী করিয়াই আঁকা হইয়াছে; মানুষ করিয়া কুত্রাপি আঁকা হয় নাই। বাঙালী যুবক যে প্রণয়ী একথা কেহ অস্বীকার করিতেছে না কিন্তু বাঙালী যে শুধু প্রণয়ীই নহে, সে যে মানুষ, আর বাঙলার স্ত্রী জাতি যে শুধুই রমণী-কামিনী প্রেম বিলাসিনী নহেন, তারা যে মা, তারা যে সহধর্ম্মিণি, একথা ভুলিয়া গিয়া রবীন্দ্র-শরচ্চন্দ্র বাঙালীর যে সর্ব্বনাশ করিয়াছেন তার প্রায়শ্চিত্ত তাঁরা নিজ হাতে করিয়া না গেলে তরুণ বাঙালী তাঁহাদিগকে ক্ষমা করিবে না।

> ...দেশের মুক্তি-যজ্ঞে আহুতি দিয়া যখন বার বৎসরের পুত্র হাসিমুখে কারাবরণ করিয়া লইতেছে, ঠিক সেই সময় সাহিত্যিক পৌঢ় পিতা নায়ক-নায়িকার নৈশ অভিসারের নিখুঁত বিন্যাসে ব্যস্ত। বাঙলার নারী যখন দেশমাতৃকার মুক্তি-সাধনায় স্বামী-পুত্রের হাত ধরিয়া পুলিশের উদ্ধত সঙীনের সাম্‌নে রাস্তায় বাহির হইয়া পড়িতেছে, ঠিক সেই সময়েই সাহিত্যিকদের লেখনীমুখে বাঙলার বিলাসিনী রমণী পিয়ানোর সামনে বসিয়া নানা অঙ্গভঙ্গী সহকারে ভ্রাতৃবঁধুর মন হরণে ব্যস্ত। ইহাই এই যুগের বস্তুতান্ত্রিক বাঙলা সাহিত্য এবং ইহাকেই আর্টের বিশেষত্ব ও সৌন্দর্যের চরম উৎকর্ষ বলিয়া গর্ব করিবার মত নিলর্জ্জ বেহায়ার সংখ্যাই বাঙলায় অধিক।
>
> ...ইহারা রায়বাহাদুরী যতটা চান, স্বরাজ ততটা চান না। কারণ বোধ হয় এই যে, পোড়া দেশ শাসনের ভার ইংরাজের কাঁধে চাপাইয়া ইঁহারা দিব্যি আরামে সাহিত্য সাধনা করিতেছে। দেশশাসনের মত দায়িত্ব কাঁধে আসিলে তাঁরা ত নিশ্চিন্তে বসিয়া 'অভিসারে আনন্দ' 'গোপন-চাওয়া' 'প্রিয়ার আধখোলা কচি বুক' 'বাতায়নের ফাঁকে' 'পথে চলার পাওয়া' প্রভৃতি কবিতা লিখিবার অবসর পাইবেন না।[৩৬]

জীবনের প্রথম দিকে লেখক এই প্রবন্ধে যে মানসিকতা পোষণ করতেন তা তাঁর সমগ্র সাহিত্যিক জীবনেও বিদ্যমান ছিল। শেষ জীবনে এসে এই প্রবন্ধ সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে তিনি তাঁর *আত্মকথায়* বলেছেন: "এই মতবাদ যে আমার ক্ষণস্থায়ী ভাবাবেগ ছিল না, তার প্রমাণ এই যে পরবর্তীকালের বিভিন্ন সময়ে আমি একাধিক লেখায় এই একই কথা বলিয়া ও লিখিয়াছিলাম।"[৩৭] লেখকের বিবেচনায় বাংলার দিকপাল সাহিত্যিকদের সাহিত্যের সঙ্গে বাংলার মানুষের বাস্তবজীবনের কোনো মিল নাই এবং এসব সাহিত্যের মাধ্যমে তাঁরা পাশ্চাত্য শিল্প-সাহিত্য-কৃষ্টির গোলামী করছে। তবে এসব মত একান্তভাবেই লেখকের নিজস্ব।

'সাহিত্য ও যুগধর্ম' নামে একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল *সওগাত* পত্রিকার ৪র্থ বর্ষ, ২য় সংখ্যা; আশ্বিন, ১৩৩৩ বঙ্গাব্দে।[৩৮] বিভিন্ন যুক্তিতর্কের মাধ্যমে লেখক 'গোলামী সাহিত্যে'র বিষয়বস্তুই এই প্রবন্ধে বর্ণনা করেছেন বলে লেখক তার *আত্মকথায়* উল্লেখ করেছেন।[৩৯]

'ছহি বড় তৈয়বনামা' নামে একটি রাজনৈতিক প্যারডি ১৯২৩-২৪ সনের দিকে সাপ্তাহিক *মুসলিম জগৎ* পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল বলে লেখক তাঁর *আত্মকথায়* উল্লেখ করেছেন। এ সম্পর্কে লেখক বলেছেন:

> ছহি বড় তৈয়বনামা' মশহুর পুঁথি 'ছহি বড় সোনাভানে'র অনুকরণে একটি রাজনৈতিক প্যারডি-স্যাটায়ার। আমার রাজনৈতিক সহকর্মী খেলাফত নেতা শ্রদ্ধেয় মৌলবী তৈয়ব উদ্দিন আহমদ দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের স্বরাজ দলের একজন আইন সদস্য। তিনি অন্যতম মন্ত্রী স্যার আব্দুল করিম গযনবীর খাতির এড়াইতে না পারিয়া সরকার পক্ষে একটি ভোট দিয়া দলীয় শৃংখলা ভংগ করেন। তাঁর এই কাজের নিন্দায় আমি এই স্যাটায়ারটি লিখি। স্যাটায়ার লেখায় এই আমার প্রথম উদ্যম। 'মুসলিম জগতে' এটি বাহির হওয়ার সংগে সংগে কলিকাতার সাহিত্যিক মহলে বিশেষতঃ মুসলিম সাহিত্যিক মহলে আমার সুনাম হয়।[৪০]

প্রবন্ধটি সংগ্রহ করা সম্ভব হয়নি।

'সভ্যতার দ্বৈতশাসন' নামে একটি দীর্ঘ প্রবন্ধ ১৯২৩-২৪ সনে দিকে সাপ্তাহিক *মুসলিম জগৎ* পত্রিকায় কয়েক মাস ধরে প্রকাশিত হয়েছিল। এ সম্পর্কে লেখক তাঁর *আত্মকথা*-য় বলেছেন:

> 'সভ্যতার দ্বৈত শাসন' রাজনৈতিক দার্শনিক দীর্ঘ প্রবন্ধ। ইহা কয়েক মাস কাল ধরিয়া 'মুসলিম জগতে' ধারাবাহিক প্রকাশিত হয়। এই সময়ে ১৯১৯ সালের ভারত শাসন আইনে যে কিছু আংশিক স্বায়ত্বশাসন দেওয়া হইয়াছিল, কংগ্রেস-খিলাফত নেতারা উহাকে 'ডায়ার্কি বা দ্বৈতশাসন' বলিতেন। ...আমি এই প্রবন্ধে প্রমাণ করিবার চেষ্টা করিয়াছিলাম, ইংরাজের দেওয়া গোটা ইউরোপীয় সভ্যতাটাই দ্বৈতশাসন। কাজেই ইংরাজ সাম্রাজাবাদীরা যে আমাদের ঘাড়ে রাজনৈতিক দ্বৈতশাসন চাপাইবার চেষ্টা করিতেছেন, এটা কোনও বিচ্ছিন্ন আকস্মিক ব্যাপার নয়। তাদের সভ্যতার এটা অংশ। ...যতদূর স্মরণ পড়ে, ঐ প্রসংগে আমি বলিবার চেষ্টা করিয়াছিলাম যে পাশ্চাত্য সভ্যতা দু'মুখা সভ্যতা। এ সভ্যতা মুখে-মনে এক কথা বলে না। যা শিখায় তা করায় না।[৪১]

'বাঙ্গালার রাষ্ট্রীয় ভবিষ্যৎ' নামে একটি প্রবন্ধ *বুলবুল* পত্রিকায় ১ম বর্ষ, ৩য় সংখ্যা; পৌষ-চৈত্র, ১৩৪০ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত হয়েছিল বলে ড. মুস্তাফা নুরউল ইসলাম তাঁর *সাময়িকপত্রে জীবন ও জনমত* গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন।[৪২] এ প্রবন্ধে লেখক অত্যন্ত উদার মানসিকতার পরিচয় দিয়ে স্বদেশের মুক্তিসাধনায় অগ্রগামী হিন্দুদের সহযোগিতার জন্য মুসলমানদের প্রতি আহবান জানিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন:

> মুসলমানরা আজ যে অধিকারের জন্য সংগ্রাম করছে না, শিক্ষিত মুসলমানের নিকটও যে নিষ্ক্রিয়তা ও নিশ্চেষ্টতা শান্তিপ্রিয়তারূপে প্রশংসিত হচ্ছে, তার কারণ বাঙ্গালার মুসলমানদের কোনো রাষ্ট্রীয় আদর্শ নেই। এরা মোল্লা সমাজের ভ্রান্ত মত প্রচারের ফলে বহুকাল কাবুলের আমীর; রুশের বাদশাহ, আরবের শরীফের ছায়ার পিছনে ঘুরে ফিরেছে। যে মায়া মরীচিকা শুধু বাঙ্গালার মুসলমান নয়, সমস্ত বিশ্বের মুসলমানকে এযাবৎকাল উদভ্রান্ত ও সম্মোহিত করে রেখেছিল বিংশ শতাব্দীর মেহ্‌দী মোস্তফা কামালের গদার এক আঘাতে তা চুরমার হয়ে গিয়েছে, এবং তার ফলে বিশ্বের সমস্ত মুসলমানদের চমক ভেঙ্গেছে, বাঙ্গালী মুসলমানের ঘুম এখনো ভেঙেছে বলে বোধ হয় না। তার কারণ এদের মধ্যে সত্যিকারের নেতা আজো জন্মায় নি।[৪৩]

ব্রিটিশ-শাসনে শিক্ষায়-সম্পদে-রাজনীতিতে হিন্দুদের এগিয়ে যাওয়াকে লেখক প্রশংসা করলেও মূলত তাদের আন্তরিকতার অভাবেই মুসলমানরা এগিয়ে আসছে না বলে হিন্দুদের যেমন সমালোচনা করেছেন, তেমনি মুসলমানরা তাদের সাম্প্রদায়িক মনোভাব থেকে মুক্ত হতে পারছে না বলে তাদেরও সমালোচনা করেছেন। পরিশেষে একই আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে সব ধরনের বিরোধ মিটিয়ে হিন্দু-মুসলিম ঐক্য কামনা করে বলেছেন: "যত বিরোধ এইখানে এবং এ বিরোধের ফাঁক দিন দিন কেবল বেড়েই যাচ্ছে। বিরোধ কোনো চুক্তিতে মিটবে না। আদর্শের একত্বই এ বিরোধ মেটাতে পারে, আর কিছুতেই নয়।"[৪৪]

'খদ্দর পরিব কেন?' নামে একটি প্রবন্ধ *সাম্যবাদী* সাময়িক পত্রের ২য় বর্ষ, ২য় সংখ্যা; ফাল্গুন, ১৩৩০ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত হয়েছিল।[৪৫] এ প্রবন্ধে লেখক খেলাফত-স্বদেশী আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে ভারতব্যাপী যে বিদেশী বস্ত্র বর্জন করে দেশীয় বস্ত্র তথা খদ্দর

পরিধানের ধুম পড়েছিল তার যৌক্তিকতা বিশ্লেষণ করেছেন। সে-সময়ে যারা খদ্দরের আবশ্যকতা ও সম্ভাব্যতাকে অস্বীকার করে তার বিরোধিতা করেছিলেন তাদের উদ্দেশে তিনি এ প্রবন্ধটি লিখেছিলেন। দেশকে স্বাধীন করার চেয়ে আত্মনির্ভরশীল করা খদ্দর পরিধানের একটি প্রধান উদ্দেশ্য বলে লেখক মনে করেছিলেন। লেখকের মতে, দেশকে স্বাধীন করে অধিকার অর্জন করার চেয়ে সে অধিকার রক্ষার ক্ষমতা অর্জন করা বেশি গুরুত্বপূর্ণ। আর সেজন্য প্রয়োজন দেশাত্মবোধে উদ্বুদ্ধ হয়ে আত্মনির্ভরশীলতা অর্জন করা এবং তার একটা প্রধান উপায় দেশীয় বস্ত্র তথা খদ্দর পরিধান করা। প্রবন্ধের দুটি উদ্ধৃতি:

> আমাদিগকে দুনিয়ায় বাঁচিয়া থাকিবার পক্ষে যে দুইটা জিনিষ সর্ব্বাপেক্ষা দরকারী, তা হইতেছে ভাত ও কাপড়। ...কাপড়ের জন্য আমরা বিদেশীর মুখাপেক্ষী এবং ইহার জন্য শুধু ইংরাজকেই আমরা বৎসরে পঁয়ষট্টি কোটি টাকা দান করিয়া থাকি। যদি আমাদের কাপড় আমরা প্রস্তুত করিতে পারিতাম, তবে দরিদ্র দেশের রক্তশোষা টাকার এই বিরাট স্তূপে কিছুতেই ইংরাজের সিন্দুক বোঝাই হইত না।[৪৬]
>
> রাস্তাঘাটে কেবলই মিলের কাপড় দৃষ্ট হয়। ইহার কারণ দেশাত্মবোধের তীব্রতার অভাবে বাঙালী এ সব ব্যাপারে স্থিরভাবে চিন্তা করিবার সামর্থ্য হারাইয়া ফেলিয়াছে। নইলে, বন্যাপীড়িত উত্তর বঙ্গবাসীর হাতের তৈরী খদ্দর কেন কলিকাতা পঁহুছা মাত্র হুহু করিয়া বিক্রয় হইয়া গেল না? আমার টাকাগুলি মাঞ্চেস্টারের কিম্বা মারওয়াড়ী কলওয়ালার হাতে তুলিয়া দিবার আগে কেন ভাবি না যে, আমার দরিদ্র ভাইদের হাতের তৈরী কাপড়গুলি হয়তঃ অবিক্রিত অবস্থায় পড়িয়া রহিয়াছে? এ সমস্তের মূলেই রহিয়াছে আমাদের দেশাত্মবোধের তীব্রতার অভাব এবং তার মূলে রহিয়াছে দাস-মনোবৃত্তি।[৪৭]

খেলাফত-অসহযোগ আন্দোলনের উত্তাল মুহূর্তে ভারতের কেন্দ্রীয় নেতাদের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী 'গ্রামে চলো নীতি'র প্রতি সম্মান দেখিয়ে আবুল মনসুর আহমদ ঢাকা থেকে নিজের গ্রামে গিয়ে জাতীয় বিদ্যালয়, তাঁতের স্কুল, চরকা স্কুল, পল্লী সমিতি, তুলার বীজ বিতরণ প্রভৃতির[৪৮] মাধ্যমে এ আন্দোলনে শুধু সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণই করেননি, খদ্দর পরিধানের যৌক্তিকতা বিশ্লেষণ করে বাংলার মানুষকে সচেতন করার উদ্দেশ্যে এমন একটি তাত্ত্বিক প্রবন্ধও লিখেছিলেন।

'মানুষ মোহাম্মদ' নামে একটি প্রবন্ধ *মাসিক মোয়াজ্জিন* পত্রিকায় ৮ম বর্ষ, ৩য় সংখ্যা; ১৩৪২ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত হয়েছিল বলে গবেষক ইসরাইল খান তাঁর *মুসলিম সম্পাদিত ও প্রকাশিত বাংলা সাহিত্য পত্রিকা* নামক গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। এ প্রবন্ধটি সংগ্রহ করা সম্ভব হয়নি।[৪৯]

'নবী দিবসে' নামক আরেকটি প্রবন্ধ *মাসিক মোয়াজ্জিন* পত্রিকায় ৯ম বর্ষ, ৫ম সংখ্যা; ১৩৪৩ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত হয়েছিল।[৫০] প্রবন্ধটি পাওয়া যায়নি।

'সাহিত্যিকের দৃষ্টিতে ভারতীয় রাজনীতি' প্রবন্ধটি ত্রৈমাসিক পত্রিকা *চতুরঙ্গে* ২য় বর্ষ, ২য় সংখ্যা; পৌষ, ১৩৪৬ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত হয়েছিল।[৫১] এ প্রবন্ধে লেখক মানবজাতির উন্নয়নের জন্য রাজনীতিতে সাহিত্যিকদের অংশগ্রহণের যৌক্তিকতা বিশ্লেষণ করেছেন, কেননা সাহিত্যিকরা জাতির পথপ্রদর্শক। তিনি লিখেছেন:

> রাজনীতিতে সাহিত্যিকদের এই হস্তক্ষেপ বিশ্বের সর্বত্র প্রয়োজন হলেও রুশিয়ার পরেই বোধ হয় আমাদের এই দুর্ভাগা দেশেই তার প্রয়োজন আশু। কারণ মানবজাতির যে দুর্ভাগ্য তাদের জীবনকে কুৎসিত, কদর্য্য ও অসুন্দর করেছে, সে দুর্ভাগ্য বোধ হয় ভাতরবর্ষেই সকল দেশের চাইতে বেশী।[৫২]

লেখকের ভাষায়:

> আমরা ভারতবাসীর মুক্তি চাইছি। কিন্তু ভারতবাসী সেটা চাইছে কই? মুক্তি চাইবার মত মন্ত্র তার তৈরী হয়েছে কী? ভারতবর্ষে আজ যে কদর্য্যতা, কৌৎসিত্য ও অসৌন্দর্য্যের তাণ্ডব চল্‌ছে, এসব দূর করতে গেলে চাই আমূল পরিবর্তন, রাজনীতিক যাকে বল্‌ছে বিপ্লব, কিন্তু সে বিপ্লবী মন কই? ভারতবাসী যে বিপ্লবের যোগ্য হয়নি, তার প্রমাণ তার সাহিত্য। তার সাহিত্যে বিপ্লবের সুর কোথায়? তার বুকে বিপ্লবের প্রাণস্পন্দন শুন্‌ছো কি? শুনছি না কেন? কারণ তার সাহিত্য প্রাণহীন। ভারতবাসীর সাহিত্যের সঙ্গে তার জীবনের যোগ নেই; তাতে তার দুঃখ বেদনার ছাপ নেই; মুক্তির পথ-নির্দেশ নেই। তা বলে কিন্তু সাহিত্যিককে তাঁর দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেয়া চলবে না। সাহিত্যিককে আমাদের জীবন-সংহিতা লিখতে হবে, আমাদের জীবন-ক্ষুধাকে রূপ দিতে হবে তাঁর সৃষ্টিতে। সমস্ত জাতির সত্যিকারের মুক্তির অগ্রদূত সাহিত্যিককেই হতে হবে।[৫৩]

মূলত এই আদর্শ লালন করতেন বলেই লেখক নিজেও যেমন একজন সাহিত্যিক হয়ে দেশের স্বার্থে রাজনীতিতে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেছেন, তেমনি অন্যান্য সাহিত্যিককেও একই মন্ত্রে উজ্জীবিত হয়ে রাজনীতিতে আসার আহ্বান জানিয়েছেন।

'সাহিত্যে নবযুগ' নামক একটি সম্পাদকীয় নিবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল *দৈনিক কৃষক* পত্রিকায় ফাল্গুন, ১৩৪৫ বঙ্গাব্দে।[৫৪] প্রগতিশীল লেখকদের এক সম্মিলনীতে বুদ্ধদেব বসু বলেছিলেন, তখন রাবীন্দ্রিক যুগ শেষ হয়ে নবযুগ শুরু হয়েছে। এই মন্তব্যের যাঁরা সমালোচনা করেছিলেন আবুল মনসুর আহমদ আবার তাঁদের সমালোচনা করে বলেছিলেন, রবীন্দ্রযুগ শেষ হয়ে যে নবযুগ শুরু হয়েছে তার নাম নজরুল যুগ। আর তা প্রমাণ করতে গিয়ে তিনি রবীন্দ্রনাথ ও তাঁর অনুসারীদের সমালোচনা করেছিলেন। লেখকের ভাষায়:

> রবীন্দ্র-সাহিত্যে ভাবের তীব্রতা ছিল না। ভাবের এই তীব্রতার অভাবে রবীন্দ্রনাথের কল্পনার উচ্চতাকে বাহ্যতঃ ত্রুটিপূর্ণ করিতে পারে নাই। কারণ রবীন্দ্রনাথের প্রতিভা যুগের প্রতিভা। বাহ্যতঃ ত্রুটিপূর্ণ করিতে পারে নাই বলিলাম এইজন্য যে, ভাবের তীব্রতাহীন সাহিত্য সাহিত্য নয়। কল্পনার উচ্চতায় সাহিত্য হয় না-হয় দর্শন। রবীন্দ্র-সাহিত্য প্রকৃতপক্ষে সাহিত্য নয়, দর্শন। ...রবীন্দ্র প্রতিভার অসাধারণত্ব বর্তমান যুগের সহিত্যামোদীর চক্ষু হইতে এই ত্রুটি গোপন করতে সমর্থ হইয়াছে। এই ত্রুটি ধরা পড়িয়াছে রবীন্দ্রানুকারীদের সাহিত্যে। ভাবের তীব্রতাহীন উচ্চকল্পনামূলক সাহিত্য যে কতটা প্রাণহীন, মৃতকল্প হইতে পারে, রবীন্দ্রনাথের সমস্ত শিষ্যের সাহিত্যই তার জাজ্‌জ্বল্যমান প্রমাণ।
>
> ...বাংলা সাহিত্যকে এই আসন্ন মৃত্যুর হাত হইতে রক্ষা করিয়াছেন নজরুল ইসলাম। ...সাধারণ বাঙালী পাঠক নজরুল প্রতিভাকে নতমস্তকে স্বীকার করিয়া লইয়াছে। কারণ নজরুল ইসলাম তরুণ বাংলার মনকে রূপায়িত করিয়া ধরিয়াছেন। অনুভূতির তীব্রতা নজরুল-সাহিত্যের বিশেষত্ব। বাঙ্গালী ভাবপ্রবণ জাতি, কল্পনাপ্রবণ নয়। তাই নজরুল বাংলার জাতীয়

> কবি। নজরুল ইসলাম বাংলার মনকে সাম্প্রদায়িক, স্বাজাতিক ও আন্তর্জাতিক—এই তিনরূপে আঁকিয়াছেন এবং এই তিনরূপেই তিনি বাঙ্গালী মনের সাগরে ডুব দিয়াছেন।
> ... সুতরাং বাংলা সাহিত্যের রাবীন্দ্রিক যুগ শেষ হইয়াছে। নজরুল-যুগ আরম্ভ হইয়াছে।[৫৫]

একই সঙ্গে তিনি এই প্রবন্ধে যাঁরা 'শিল্পের জন্য শিল্প' নীতিতে বিশ্বাসী তাঁদের সমালোচনা করে 'জীবনের জন্য শিল্প' নীতির পক্ষে বিভিন্ন যুক্তি তুলে ধরেছেন।

'সাহিত্যে সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্য' নামে একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল *মাসিক মোহাম্মদী* পত্রিকায় ১৬শ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা; মাঘ, ১৩৪৯ বঙ্গাব্দে।[৫৬] এই প্রবন্ধটি মূলত সাহিত্যিক বুদ্ধদেব বসুর 'সাহিত্যে পাকিস্তান অসম্ভব' নামক একটি প্রবন্ধের প্রতিবাদে লেখা হয়েছিল। বুদ্ধদেব বসু তাঁর প্রবন্ধে বাংলা সাহিত্যকে সম্প্রদায়গত হিসেবে বিবেচনা করে যারা 'মুসলমান লেখক' বা 'মুসলমান সাহিত্যিক' হিসেবে পরিচয় দিতেন তাদের সমালোচনা করেছিলেন। এর জবাবে আবুল মনসুর আহমদ বাংলাভাষা ও সাহিত্যে মুসলমানদের স্বাতন্ত্র্যের কথা বলেছিলেন:

> সেটা হইবে বাঙ্গালী মুছলমানদের মাতৃভাষা, হিন্দুর মাতৃভাষা নয়। বিদ্যাসাগর প্রভৃতির পাণ্ডিত্যের ধাক্কায় যদি উচ্চশ্রেণীর হিন্দুরা মাতৃভাষা ত্যাগ করিয়াই থাকে, তবে বাঙ্গলার মুছলমান তাহাদিগকে বিলাত ফেরৎ ব্যারিস্টারদের মতই অনুকরণের অযোগ্য মনে করিবে। তাদের ধমকে তারা মাতৃভাষার স্বকীয়তা নষ্ট করিবে না। মুছলমানই মাতৃভাষার সৃষ্টি করিয়াছে; বাঙ্গলা সাহিত্যও সৃষ্টি করিয়াছে। ...বাঙ্গলার পাড়াগাঁয়ে চারি কোটি মুছলমানের মুখে যে অফুরন্ত শব্দ সম্পদ আছাড়িয়া মরিতেছে, সাহিত্যের মর্য্যাদায় যদি তারা বাঙ্গলার অভিধানে স্থান পায়, তবে বাংলা ভাষা হইয়া উঠিবে ভারতের আন্তর্জাতিক ভাষা; বাংলা সাহিত্য হইয়া উঠিবে নিখিল ভারতীয় জাতীয় সাহিত্য।[৫৭]

'পাকিস্তানের বিপ্লবী ভূমিকা' নামে একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল *মাসিক মোহাম্মদী* পত্রিকার ১৬শ বর্ষ, ৫ম সংখ্যা; ফাল্গুন, ১৩৪৯ বঙ্গাব্দে। এ প্রবন্ধে লেখক বাস্তবতাকে মেনে নিয়ে প্রগতির স্বার্থে এবং সামাজিক-সাহিত্যিক-কৃষ্টিক প্রয়োজনে পাকিস্তান রাষ্ট্র সৃষ্টির প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরেছিলেন। তিনি বলেছিলেন:

> 'পাকিস্তান' আজ ভারতের রাষ্ট্রিক, সামাজিক, সাহিত্যিক ও কৃষ্টিক জীবনে এক বিপুল বিপ্লবের ভূমিকায় অভিনয় কচ্ছে। ...যে ব্যক্তি-স্বাধীনতা ও দেওয়ানী আজাদীর নামে সাম্যবাদের নিন্দা করা হয়, সেই আজাদীই সাম্যবাদের চরম লক্ষ্য। তা হলে যা কিছু মানুষের আত্মবিকাশের স্থায়ী প্রতিবন্ধক, অথবা, সে প্রতিবন্ধকের আয়োজন, তাই প্রগতি-বিরোধী; আর যা কিছু এই আত্মবিকাশের সহায়ক, অথবা তার আয়োজন, তাই প্রগতিশীল।[৫৮]

অর্থাৎ, সাম্য ও ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে প্রত্যেকের আত্মবিকাশ ও প্রগতির স্বার্থেই লেখক পাকিস্তান দাবির প্রতি সমর্থনের কথা বলেছিলেন।

'পূর্ব পাকিস্তানের অর্থনৈতিক সমস্যা' নামে একটি নিবন্ধ *মাসিক মোহাম্মদী* পত্রিকায় ১৬শ বর্ষ, ৯ম সংখ্যা; আষাঢ়, ১৩৫০ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত হয়েছিল।[৫৯] এ নিবন্ধে লেখক চাকরিক্ষেত্রে মুসলমান ও হিন্দুর বৈষম্যের একটি চিত্র তুলে ধরেছিলেন। লেখকের ভাষায়:

> বাঙলায় সরকারি চাকুরি থেকে জনসাধারণের বার্ষিক আয় ৬ কোটি টাকা। এই ৬ কোটির কত অংশ মুসলমানরা পায়? আপনারা জানেন, অনেক ধস্তাধস্তি করে অনেক রেশিওর রশি টানাটানি করে মুসলমানদের কোলে যে পরিমাণ চাকুরি আনতে পারা গিয়েছে, তার সংখ্যা শতকরা ২৩। এই ২৩ জনেরও অধিকাংশই অধস্তন কর্মচারি। কাজেই মাথাগণতিতে মুসলমান চাকুরিয়া শতকরা ২৩ জন হলেও টাকার দিক দিয়ে কিন্তু তাদের অংশ শতকরা ২৩ হয়নি। যথাসম্ভব দলিল দস্তাবেজ ঘেঁটে আমরা যে সংখ্যা পেয়েছি, তাতে দেখা যাচ্ছে, টাকার দিক দিয়ে সরকারি চাকুরিতে মুসলমানদের অংশ শতকরা ১৫ মাত্র। ফলে সরকারি চাকুরিতে বিতরিত ৬ কোটি টাকার মধ্যে মুসলমানের ভাগে পড়ে এক কোটিরও কিছু কম।[৬০]

অখণ্ড বাংলায় হিন্দুদের তুলনায় মুসলমানদের সংখ্যা বেশি হলেও সরকারি চাকুরিতে বরাদ্দ মোট টাকার মাত্র ১৫ শতাংশ মুসলমানদের পেছনে ব্যয় হওয়ার হিসেব দিয়ে লেখক পাকিস্তান দাবির পক্ষে যুক্তি তুলে ধরেছিলেন।

'পূর্ব্ব পাকিস্তানের জবান' নামের প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয়েছিল *মাসিক মোহাম্মদী* পত্রিকায় ১৭শ বর্ষ, ১ম সংখ্যা; কার্তিক, ১৩৫০ বঙ্গাব্দে[৬১] অর্থাৎ, ১৯৪৩ সনে। এই প্রবন্ধে লেখক পাকিস্তান সৃষ্টি চার বছর আগে, অর্থাৎ, যখন লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে একাধিক স্বাধীন মুসলিম রাষ্ট্রের দাবি উঠেছিল, তখন উর্দুর পরিবর্তে বাংলাভাষাকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা ও জাতীয় ভাষা করার দাবি জানিয়ে তার পক্ষে যুক্তি তুলে ধরেছিলেন। তিনি বলেছিলেন:

> উর্দ্দু নিয়ে এই ধস্তাধস্তি না করে আমরা সোজাসুজি বাঙলাকেই যদি পূর্ব পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা ও জাতীয় ভাষারূপে গ্রহণ করি, তবে পাকিস্তান প্রবর্তনের সঙ্গে সঙ্গেই আমরা মুসলিম বাঙলার শিক্ষিত সম্প্রদায় নিজেরাই পূর্বপাকিস্তানের রাষ্ট্রীয়, সামাজিক, শিক্ষাগত, অর্থনৈতিক ও শিল্পগত রূপায়ণে হাত দিতে পারবো। আমাদের নিজেদের বুদ্ধি, প্রতিভা ও জীবনাদর্শ দিয়েই আমাদের জনসাধারণকে উন্নত, আধুনিক জাতিতে পরিণত করবো।[৬২]

অর্থাৎ, যখন পাকিস্তান রাষ্ট্রের রূপরেখাই নির্মিত হয়নি, তখন বাংলাভাষাকে পূর্ব-পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা ও জাতীয় ভাষা করার এই জোর দাবি জানিয়েছিলেন লেখক। এ পর্যন্ত প্রাপ্ত তথ্য থেকে বলা যায়, এটিই ছিলো বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার প্রথম দাবি।

'বাংলা ভাষার সংস্কার' নামে একটি প্রবন্ধ *সওগাত* পত্রিকায় ২৭ বর্ষ, ১২ সংখ্যা; কার্তিক, ১৩৫২ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত হয়েছিল।[৬৩] এ প্রবন্ধে লেখক বাংলাভাষার প্রচলিত ধারাকে 'হিন্দু আঙ্গিক' হিসেবে আখ্যায়িত করে তাকে মুসলমান আঙ্গিকে রূপান্তরের পক্ষে ব্যাখ্যা তুলে ধরেছিলেন এবং সেই সঙ্গে হিন্দুদের তা গ্রহণ করার আহবান জানিয়ে বলেছিলেন:

> হিন্দু ভাইরা যদি বাংলা ভাষার বর্তমান হিন্দু আঙ্গিক ত্যাগ করে মুসলিম আঙ্গিক গ্রহণ করেন, তবে এক সাথে দুটো লাভ হবে। এক. বাংলার হিন্দু ও মুসলমানের এক ভাষা ও এক সাহিত্য থাকবে। দুই. বাংলা ভাষা উর্দু ও হিন্দীর সাথে বাজী রেখে চলতে পারবে। ...আর যদি হিন্দু ভাইরা না করেন, তবে হিন্দু বাংলা ও মুসলিম বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ক্ষেত্রেও পৃথক হয়ে পড়তে বাধ্য। শুধু বানান ও লিপি সংস্কারে এর এ সম্ভাবনা রোখা যাবে না।[৬৪]

'হারজিৎ' নামে একটি গল্প ১৯৪৫ সনের ১ জানুয়ারি *জাগরণ* পত্রিকার 'সবুজ সংখ্যায়' প্রকাশিত হয়েছিল।[৬৫] এ গল্পটি পাওয়া যায়নি।

'বাংলায় মুসলিম রাজনীতির পটভূমি ও পরিচয়' নামক একটি প্রবন্ধ বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগের মুখপত্র *মিল্লাত* পত্রিকায় ১ম বর্ষ, ২য় সংখ্যা; ২৩ নভেম্বর, ১৯৪৫ সনে প্রকাশিত হয়েছিল বলে বদরুদ্দীন উমর উল্লেখ করেছেন।[৬৬] তবে প্রবন্ধটি পাওয়া যায়নি।

'আকাল আনিল কারা?' নামে একটি পুস্তিকা ১৯৪৬ সনের নির্বাচনে মুসলিম লীগের প্রচারপত্র হিসেবে প্রকাশিত হয়েছিল। বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগের প্রচার সম্পাদক হিসেবে এই পুস্তিকায় আবুল মনসুর আহমদ ১৯৪৩ সনের দুর্ভিক্ষকে (পঞ্চাশের মন্বন্তর) হক মন্ত্রীসভার সৃষ্টি হিসেবে প্রমাণ করে মুসলিম লীগ মন্ত্রীসভাকে নির্দোষ প্রমাণের চেষ্টা করেছিলেন।[৬৭]

'বাংলা ভাষাই হবে আমাদের রাষ্ট্রভাষা' নামে দুই পৃষ্ঠার একটি লেখা তমদ্দুন মজলিসের প্রচার-পুস্তিকা হিসেবে ১৯৪৭ সনের ১৫ সেপ্টেম্বরে প্রচারিত 'পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা বাংলা-না উর্দু' নামক পুস্তিকায় প্রকাশিত হয়েছিল।[৬৮] এই প্রবন্ধে লেখক বাংলাকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করার পক্ষে যুক্তি তুলে ধরেছিলেন। তিনি বলেছিলেন:

> উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা করিলে পূর্ব-পাকিস্তানের শিক্ষিত সমাজ রাতারাতি 'অশিক্ষিত' ও সরকারি চাকুরির 'অযোগ্য' বনিয়া যাইবেন। উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ফারসীর জায়গায় ইংরেজিকে রাষ্ট্রভাষা করিয়া বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ মুসলিম শিক্ষিত সমাজকে রাতারাতি 'অশিক্ষিত' ও সরকারী কাজের 'অযোগ্য' করিয়াছিল।"[৬৯]

অর্থাৎ, ব্রিটিশরা যেমন তাদের শাসনের সুবিধার্থে হিন্দুদের কাছে টেনে নিয়ে ও মুসলমানদের দূরে সরিয়ে রেখে তাদের শাসনব্যবস্থাকে দীর্ঘস্থায়ী করেছিল এবং তার ফলে ভারতে মুসলমানরা সমস্ত ক্ষেত্রে পশ্চাৎপদ জাতিতে পরিণত হয়েছিল, তেমনি পূর্ব-বাংলার মানুষের উপর উর্দুভাষা চাপিয়ে দিলে এদেশের অবস্থানও একই রূপ হবে।

'ব্যঙ্গ কবিতা' নামে একটি প্রবন্ধ রেডিও পাকিস্তান, ঢাকা কেন্দ্র থেকে কথিকারূপে প্রচারিত হয়েছিল এবং পরে তা ১৯৬০ সনে প্রকাশিত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'সাহিত্য সংগ্রহ' (গদ্য)-তে পাঠ্য হিসেবে স্থান পেয়েছিল।[৭০] এই প্রবন্ধে লেখক সাহিত্যে ব্যঙ্গরচনার গুরুত্ব তুলে ধরে ব্যঙ্গের উদ্দেশ্য এবং সে প্রসঙ্গে বাংলার দিকপাল সাহিত্যিকদের ব্যঙ্গ কবিতা ও প্যারডির আলোচনা করেছেন। স্যাটায়ার সম্পর্কে লেখকের বক্তব্য:

> উইট ও হিউমার উন্নত হ'য়ে দাঁড়ায় স্যাটায়ারে। তাই ব'লে রঙ্গ-কৌতুক ও উইট হিউমার যে উ'ঠে গেছে তা' নয়। তারা নিজ নিজ অবস্থানে থেকে মানুষকে আগের মতই আনন্দ দিয়ে যাচ্ছে। স্যাটায়ার সবার উপরে ব'সে মিছরির ছুরি চালিয়ে আনন্দদানের সাথে সাথে সংস্কারকের কাজ করছে। স্যাটায়ার আসলে উপদেশ—সুগার-কোটেড কুইনাইন মাত্র। বিখ্যাত রস-সাহিত্যিক এডিসন বলেছেন: স্যাটায়ার থেকে হিউমার বাদ দিলে তা হয়ে দাঁড়াবে গির্জার সারমন অর্থাৎ ধর্মীয় নছিহত। বস্তুত, হিউমার ছাড়া স্যাটায়ার হ'তে পারে না। স্যাটায়ারে থাকবে বটে—ত্রুটি বিচ্যুতির গায় চিনি মাখানো চাবুক। কিন্তু তার পিছনে থাকবে মহত্তর আদর্শের প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত। তার আক্রমণের বিষয়বস্তু হবে দুর্বলেরা নয়, —সবলেরা, ক্ষমতাহীনেরা নয়, —ক্ষমতাশালীরা। কারণ, দুর্বলের দোষ দোষই নয়— তার দোষে সমাজ বা জাতির কিচ্ছু আসে যায় না। এই কারণেই স্যাটায়ারের বিষয়বস্তু প্রধানত শ্রেণী বা জাতি–

> ব্যক্তি নয়। ব্যক্তিকে আক্রমণ করলে সেটা হ'য়ে পড়বে ক্যারিকেচার, যদি না সে ব্যক্তি হন রিপ্রেযেন্‌টেট। স্যাটায়ারের টার্গেট ব্যক্তিই হোক, আর জাতিই হোক, আক্রমণটা হতে হবে বিদ্বেষ বা 'ম্যালিস' মুক্ত। আক্রোশ, বিদ্বেষ বা ম্যালিস থাকলে তা হিউমার হবে না। সুতরাং স্যাটায়ার হবে না। যে রসিকতায় আক্রান্ত ব্যক্তি বা জাতি স্বয়ং হাসতে বাধ্য হবে, সেটাই হবে খাঁটি রসিকতা।[৭১]

এছাড়া লেখক এই প্রবন্ধে ব্যঙ্গকবিতা তথা প্যারডি চর্চার একটা সংক্ষিপ্ত ইতিহাস বর্ণনা করেছেন।

'একদিনও দেরি নয়' নামে একটি প্রবন্ধ ১৯৬৬ সনে *দৈনিক ইত্তেফাক* পত্রিকার ২০ ও ২১ ফেব্রুয়ারিতে প্রকাশিত হয়েছিল। বাংলা পরিভাষা সম্পর্কে এ প্রবন্ধে তাঁর গুরুত্বপূর্ণ অভিমত ব্যক্ত হয়েছে।[৭২]

'সশ্রদ্ধ মোবারকবাদ' নামে একটি নিবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৬৮ সনের *দৈনিক আজাদ* পত্রিকার ৭ জুন তারিখে। এই প্রবন্ধে লেখক মওলানা আকরম খাঁর (১৮৬৮-১৯৬৮) জীবনাবসানে (১৯৬৮ সনের ১৮ আগস্ট) তাঁর কর্মময় জীবনের ওপর আলোচনা করে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন।[৭৩]

অপ্রকাশিত রচনা

আবুল মনসুর আহমদের অপ্রকাশিত কোনো পাণ্ডুলিপি বা রচনার তেমন সন্ধান পাওয়া যায় না। তবে 'জীবন-ক্ষুধা' (১৯৫৫) উপন্যাসের প্রথম সংস্করণের শেষে এক বিজ্ঞপ্তিতে তিনি 'তিতুমীর' ও 'মা খাকী' নামের দুটি উপন্যাসকে যন্ত্রস্থ বলে উল্লেখ করেছিলেন।[৭৪] পরে তা প্রকাশিত হয়নি এবং সে পাণ্ডুলিপিরও কোনো খোঁজ পাওয়া যায়নি।

লেখকের 'মালেকুল বরাত' নামে একটি ব্যঙ্গগল্পের পাণ্ডুলিপির সন্ধান পাওয়া যায়, যা প্রকাশিত হয়নি। ১৯৬১ সনের ১০ অক্টোবর তিনি এই গল্পটি লিখেছিলেন।[৭৫] এখানে মন্ত্রিত্বের যোগ্যতাকে ব্যঙ্গ করা হয়েছে। গল্পের নায়ক রশীদ বহু চেষ্টার পরেও কোনো চাকরি যোগাড় করতে পারে না। মন্ত্রিদের অবৈধ সুপারিশে তাঁদের আত্মীয়-স্বজন ও ভক্ত-অনুরক্তরাই সব চাকরি নিয়ে নেয়। তাই রশীদ মন্ত্রী হওয়ারই সিদ্ধান্ত নিল এবং সেজন্য সে পীরের পরামর্শ অনুযায়ী সরাসরি মালেকুল বরাত, অর্থাৎ, প্রধানমন্ত্রীর কাছে গেল। এ সময় পাকিস্তানে সামরিক আইনের বদৌলতে নির্বাচন বাতিল করে সমস্ত রাজনৈতিক দলকে নিষিদ্ধ করা হয়েছিল। ফলে নির্বাচনের মাধ্যমে এমপি-মন্ত্রী হওয়ার ধারাবাহিক প্রক্রিয়ার পরিবর্তে সামরিক শাসকের ব্যক্তি-ইচ্ছায় যাকে খুশি তাকে মন্ত্রি করা হচ্ছিল। গল্পের ভাষায়:

> মন্ত্রিগিরি বাতিল হয় নাই বটে, কিন্তু ইলেকশন বাতিলের ফলে তাতে এক ব্যক্তির মনোপলি হৈয়া গেছে। ইলেকশনের আমলে পলিটিক্যাল বিযিনেসে কম্পিটেটিভ মার্কেট ছিল, এখন হৈছে ওটা মনোপলি মার্কেট। ফলে মন্ত্রিগিরি ঐ সঙ্গে আমার বরাতটাও এক ব্যক্তির হাতে চৈলা গেল হুজুর। ... ইলেকশন পাবলিকলিই হোক, আর প্রাইভেটই হোক, সিস্টেম পার্লামেন্টারীই হোক আর প্রেসিডেনসিয়ালই হোক শেষ পর্যন্ত একজনকেই সবার উপরে বসান লাগে। সব ক্ষমতা তার হাতে দেওয়া লাগে। তাকে প্রেসিডেন্টই কও আর প্রাইম-মিনিস্টারই কও। ...ইলেকশনে তোষামোদ করতে হয় কতজনকে। নমিনেশনের লাগি পার্টি মেম্বারদেরে খোশমোদ করতে

> হয়। ভোটের আগে ভোটারদের বাড়ীবাড়ী ক্যানভাস করতে হয়। শেষ পর্যন্ত মন্ত্রিগিরির লাগি প্রধানমন্ত্রির দুয়ারে ধন্না দিতে হয়। প্রাইভেট ইলেকশনের মনোপলি মার্কেটে ঘাটে ঘাটে তদবির ও ঘরোয়া খোশামোদের এসব ঝামেলা নাই। একজনকেই খুশী করতে পারলেই হল। কাম ফতে।[৭৬]

তাই রশীদ সে-পথেই গেল এবং জীবনে কোনোদিন রাজনীতি বা নির্বাচন না করেই সরাসরি মন্ত্রী হয়ে গেল। আবুল মনসুর আহমদ এ গল্পের মাধ্যমে পাকিস্তানি সামরিক শাসক ও তাদের স্বৈরতান্ত্রিক আচরণকে ব্যঙ্গ করেছেন।

উপসংহার

বৈচিত্র্যময় জীবনের অধিকারী আবুল মনসুর আহমদের বহুমুখী পদচারণা আমাদের বিস্মিত করে। সাহিত্য, রাজনীতি, সাংবাদিকতা, আইন ব্যবসায় ও বিভিন্ন সামাজিক-সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে তাঁর মুখনিঃসৃত বাণী বা বিভিন্ন ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া বা উপদেশ-নির্দেশ সম্পর্কে আমরা এখনো অজ্ঞাত। সমকালীন বিভিন্ন সভা-সমিতি, বক্তৃতা বিবৃতি বা পত্র-পত্রিকায় তাঁর অসংখ্য লেখার সন্ধান এখনো আমরা জানি না। এসব লেখায় অনেক অজানা তথ্য বেরিয়ে আসতে পারে, যা থেকে লেখক সম্পর্কে আমাদের অনেক ধারণা পাল্টে দিতে পারে। এর জন্য প্রয়োজন একটি স্বতন্ত্র গবেষণার।

তথ্যনির্দেশ

১. *আত্মকথা*, প্রথম প্রকাশ, ১৯৭৮, আহমদ পাবলিশিং হাউস, ঢাকা, পৃ. ২৬৬
২. ঐ, পৃ. ২৭০
৩. ঐ, পৃ. ২৬৮
৪. রফিকুল ইসলাম, *আবুল মনসুর আহমদ রচনাবলী*, ১ম খণ্ড, প্রথম প্রকাশ, ১৯৯৮, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, পৃ. পরিশিষ্ট ৪৮২
৫. প্রথম তালিকাটি প্রকাশ করে *মাসিক মোহাম্মদী* পত্রিকার কর্মকর্তারা এবং তা সংশোধন করে মুস্তাফিজুর রহমান খান দ্বিতীয় তালিকাটি প্রকাশ করেন। প্রথম তালিকায় *মুসলমানী কথার* স্থান ছিল ৩১ নম্বরে এবং দ্বিতীয় তালিকায় স্থান ছিল ২০ নম্বরে। ইসরাইল খান, *মুসলিম সম্পাদিত ও প্রকাশিত বাংলা সাহিত্য পত্রিকা* (১৯৩১–১৯৪৭), প্রথম প্রকাশ, ২০০৫, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, পৃ. ৩১৪-৩১৫।
৬. নূরুল আমিন, *আবুল মনসুর আহমদ*, *জীবনী গ্রন্থমালা*, প্রথম প্রকাশ, ১৯৮৭, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, পৃ. ৭২
৭. রফিকুল ইসলাম, প্রাগুক্ত, পৃ. ভূমিকা (নয়)
৮. *আত্মকথা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭২
৯. ঐ, পৃ. ২৭৩
১০. ঐ, পৃ. ২৯২
১১. ইবলিসের পরদায়েশ, *ছোটদের কাসাসুল আম্বিয়া*, ১ম খণ্ড, রচনাবলী ১ম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৬১
১২. মরিয়ম ও ইসা, *ছোটদের কাসাসুল আম্বিয়া*, ২য় খণ্ড, রচনাবলী ১ম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৪৯
১৩. আইউব ও রহিমা, *ছোটদের কাসাসুল আম্বিয়া*, ১ম খণ্ড, রচনাবলী ১ম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪১৪
১৪. মাছের পেটে ইউনুস, *ছোটদের কাসাসুল আম্বিয়া*, ২য় খণ্ড, রচনাবলী ১ম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪২০
১৫. রফিকুল ইসলাম, প্রাগুক্ত, পৃ. পরিশিষ্ট ৪৮৪

১৬. উদ্ধৃত: নূরুল আমিন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৫
১৭. আত্মকথা, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭৮
১৮. নূরুল আমিন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৯
১৯. আত্মকথা, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮১-২৮৩
২০. আবুল হাসানাৎ, *যৌন বিজ্ঞান*, ১ম খণ্ড, পঞ্চম সংস্করণ, ১৯৮৯, মল্লিক ব্রাদার্স, কলকাতা, 'বর্তমান সংস্করণ সম্বন্ধে নিবেদন' দ্রষ্টব্য। ১৯৩৬ সনে এক খণ্ডে গ্রন্থটির প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছিল। পরের সংস্করণগুলোতে অনেক নতুন তথ্য, মত ও পরিসংখ্যান যুক্ত হয়ে দুটি খণ্ডে প্রকাশিত হয়। এই দুটি খণ্ড একত্রে ১৯৫১ সনে *All About Sex, Love and Happy Marriage* নামে ইংরেজি সংস্করণও প্রকাশিত হয়
২১. আত্মকথা, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮৪
২২. উদ্ধৃত: নূরুল আমিন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৯
২৩. *আল কোরআনের নসিহৎ*, 'আমার আরজ' দ্রষ্টব্য, প্রথম প্রকাশ, ১৯৯৯, আহমদ পাবলিশিং হাউস, ঢাকা, পৃ. (৮)
২৪. ঐ, পৃ. ২০
২৫. ঐ, পৃ. ৫৯
২৬. ঐ, পৃ. ৯৭
২৭. আতোয়ার রহমান, *সংবাদপত্রে উপমহাদেশের স্বাধীনতা*, প্রথম প্রকাশ, ২০০১, বা/এ, ঢাকা, পৃ. ১২৯; অবশ্য আবুল মনসুর আহমদ এ সময়টাকে বলেছেন 'আইউব খানের শাসনামল', 'আমার আরজ', পৃ. (৬)
২৮. আমার আরজ, *আল কোরআনের নসিহৎ*, প্রাগুক্ত, পৃ. (৭)
২৯. ঐ. পৃ. ১০
৩০. *আত্মকথা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫৯
৩১. লায়লা জামান, *সওগাত পত্রিকার সাহিত্যিক অবদান ও সামাজিক ভূমিকা* (১৯১৮-১৯৫০), প্রথম প্রকাশ, ১৯৮৯, বাংলা এবাডেমী, ঢাকা, পৃ. ১৪০
৩২. ঐ
৩৩. ঐ
৩৪. সুনীল কান্তি দে, *মুসলিম সমাজচিত্র: সাম্যবাদী সাময়িক পত্রে*, প্রথম প্রকাশ, ১৯৯৪, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, পৃ. ২৬৩
৩৫. আত্মকথা, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬২
৩৬. গোলামী সাহিত্য, *সাম্যবাদী সাময়িক পত্র*, ৩য় বর্ষ, ১ম সংখ্যা; পৌষ ১৩৩১, উদ্ধৃত: সুনীল কান্তি দে, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬৫-২৬৭
৩৭. *আত্মকথা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮৯
৩৮. লায়লা জামান, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪১
৩৯. *আত্মকথা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮৯
৪০. ঐ, পৃ. ২৬৫
৪১. ঐ, পৃ. ২৬৫-২৬৬
৪২. মুস্তাফা নূরউল ইসলাম, *সাময়িকপত্রে জীবনে ও জনমত* (১৯৩১-১৯৪৭), ২য় খণ্ড, প্রথম প্রকাশ, ২০০৫, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, পৃ. ১৭৭
৪৩. বাঙ্গালার রাষ্ট্রীয় ভবিষ্যৎ, *বুলবুল*, ১ম বর্ষ ৩য় সংখ্যা; ১৩৪০ পৌষ-চৈত্র, উদ্ধৃত: মুস্তাফা নুরউল ইসলাম, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৬
৪৪. ঐ. পৃ. ১৭৭

৪৫. সুনীল কান্তি দে, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮১
৪৬. খদ্দর পরিব কেন? *সাম্যবাদী*, ২য় বর্ষ, ২য় সংখ্যা; ফাল্গুন, ১৩৩০, উদ্ধৃত: সুনীল কান্তি দে, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮৪
৪৭. ঐ, পৃ. ২৮৯
৪৮. *আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর*, রফিকুল ইসলাম সম্পাদিত *আবুল মনসুর আহমদ রচনাবলী*, ৩য় খণ্ড, প্রথম প্রকাশ, ১৯৯৮, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, পৃ. ১৮-২১
৪৯. ইসরাইল খান, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১২
৫০. ঐ, পৃ. ২১২
৫১. ঐ, পৃ. ১৮৮
৫২. ঐ, পৃ. ১৮৩
৫৩. সাহিত্যিকের দৃষ্টিতে ভারতীয় রাজনীতি, *চতুরঙ্গ*, ২য় বর্ষ, ২য় সংখ্যা; পৌষ, ১৩৪৬, উদ্ধৃত: ইসরাইল খান, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৩-১৮৪
৫৪. সূত্র: নূরুল আমিন, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩০
৫৫. সাহিত্যে নবযুগ, *দৈনিক কৃষক*, কলকাতা, ফাল্গুন, ১৩৪৫; উদ্ধৃত: নুরুল আমিন, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৩
৫৬. দিলওয়ার হোসেন, *মোহাম্মদী পত্রিকায় মুসলিম সমাজ*, প্রথম প্রকাশ, ১৯৯৪, বা/এ, ঢাকা, পৃ. ৯০ ও মুস্তাফা নূরউল ইসলাম, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩৯২
৫৭. সাহিত্যে সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্য, *মাসিক মোহাম্মদী*, ১৬শ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, মাঘ ১৩৪৯; উদ্ধৃত: মুস্তাফা নুরউল ইসলাম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৯১-৯২
৫৮. পাকিস্তানের বিপ্লবী ভূমিকা, *মাসিক মোহাম্মদী*, ১৬ শ বর্ষ, ৫ম সংখ্যা; ফাল্গুন, ১৩৪৯, উদ্ধৃত: সরদার ফজলুল করিম (সম্পাদিত), *পাকিস্তান আন্দোলন ও মুসলিম সাহিত্য*, ১ম প্রকাশ, ১৯৬৮, বা/এ, ঢাকা, পৃ, ৭২
৫৯. দিলওয়ার হোসেন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৭
৬০. পূর্ব পাকিস্তানের অর্থনৈতিক সমস্যা, *মাসিক মোহাম্মদী*, ১৬ বর্ষ, ৯ সংখ্যা, আষাঢ়, ১৩৫০, উদ্ধৃত; দিলওয়ার হোসেন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৭
৬১. ঐ, পৃ. ১০০
৬২. 'পূর্ব্ব পাকিস্তানের জবান', *মাসিক মোহম্মদী*, ১৬শ বর্ষ, ১ম সংখ্যা, কার্তিক ১৩৫০ (১৯৪৩); পত্রিকাটি বাংলা একাডেমী গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত আছে।
৬৩. সফিউদ্দিন আহমদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৮; লায়লা জামান, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৩-১৪৪
৬৪. বাংলা ভাষার সংস্কার, *সওগাত* ২৭:১২, কার্তিক, ১৩৫২; উদ্ধৃত: লায়লা জামান, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৩–১৪৪
৬৫. সূত্র: ইসরাইল খান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫৯
৬৬. বদরুদ্দীন উমর, বিশ শতকের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত, মুনতাসীর মামুন সম্পাদিত, *চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ও বাঙালি সমাজ*, পরিবর্ধিত নতুন সংস্করণ, ২০০২, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, পৃ. ১৯৯
৬৭. *আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪২
৬৮. বদরুদ্দীন উমর, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪, ১৮
৬৯. ঐ, পৃ. ১৮
৭০. নূরুল আমিন, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩২
৭১. ঐ, পৃ.১৩৩
৭২. ঐ, পৃ. ১৯

৭৩. এটি এম আতিকুর রহমান, *বাংলার রাজনীতিতে মওলানা আকরম খাঁ*, প্রথম প্রকাশ, ১৯৯৫, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, পৃ. ৩৫

৭৪. লেখকের *জীবন-ক্ষুধা* উপন্যাস গ্রন্থাকারে প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৫৫ সনে (শ্রাবণ, ১৩৬২) ময়মনসিংহ থেকে। প্রকাশক 'এ রহমান এন্ড সন্স', দুর্গাবাড়ি রোড, ময়মনসিংহ, কিন্তু টাইটেল পেজে 'এম আনাম এন্ড কোং'— এর ব্লক ছাপা হয়েছিল, পরবর্তী পৃষ্ঠায় যাকে 'সোল এজেন্ট' হিসেবে পরিচয় দেওয়া হয়, পৃষ্ঠা সংখ্যা ৪৭৮, মূল্য ৬ টাকা, সূত্রঃ নূরুল আমিন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৬

৭৫. নূরুল আমিন, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৯

৭৬. ঐ, পৃ. ১৫৬-৫৭

বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি পত্রিকা, দ্বাত্রিংশ খণ্ড, শীত সংখ্যা, পৌষ ১৪২১/ডিসেম্বর ২০১৪

সুবোধ ঘোষের ছোটগল্পে ফ্রয়েডীয় মনোবিকলন

মোমেনুর রসুল*

সার-সংক্ষেপ

বাংলা ছোটগল্পের ক্রমবিকাশমান ধারায় সুবোধ ঘোষ অনন্য এক কথাসাহিত্যিক রূপে পরিচিত। কল্লোল পরবর্তী সময়ের এই লেখকের রচনায় বিশ্ববিশ্রুত ফ্রয়েডের মনোবিজ্ঞান তত্ত্বের ছায়া প্রতিভাসিত। বিশেষত তাঁর ছোটগল্পে ফ্রয়েডীয় মনোবিকলনের বিভিন্ন পর্যায় উপস্থাপিত হয়েছে। মানুষের নিভৃত মনের নিষিদ্ধ কামনাগুচ্ছ যে কত ভয়াবহ ও জটিল আকার ধারণ করতে পারে তা সুবোধ ঘোষের গল্পের চরিত্রের মনোজগৎ বিশ্লেষণ করলে উপলব্ধি করা যায়। মূলত মানুষের অন্তর্মানসে সক্রিয় লিবিডোর সর্বগ্রাসী প্রভাব, সর্ব যৌনবাদে আস্থা, মনের ত্রিস্তর চেতন-অবচেতন, অচেতনের দ্বন্দ্ব-উদঘাটনের মাধ্যমে তার অসুস্থ, অস্বভাবী ও বিকৃত চিত্র উপস্থাপিত হয়েছে তাঁর গল্পে। বর্তমান প্রবন্ধে সুবোধ ঘোষের ছোটগল্পে চিত্রিত ফ্রয়েডীয় মনোবিকলনের বিভিন্ন সূত্রকে সহায় করে সংশ্লিষ্ট গল্পগুলো বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

আধুনিক জীবনের নানামুখী সংকট মানুষকে জটিল আবর্তের মধ্যে নিক্ষেপ করায় সেই জটিলতা তার মনের মধ্যেও পরিলক্ষিত হয়। কথাসাহিত্যে বিশেষত ছোটগল্পের ন্যায় দৃঢ়পিনদ্ধ শিল্পে তাই মানবমনের অপার রহস্যের দ্বার উন্মোচনের প্রয়াস দুর্লক্ষ্য নয়। প্রাচীন ও মধ্যযুগের সাহিত্যে, মহাকাব্য বা আখ্যানধর্মী রচনাসমূহের মধ্যে মানবসম্পর্ক ও তার মনোজগতের যে স্বরূপ উপস্থাপিত হয়েছে, তাতে সমাজবাস্তবতার সঙ্গে ধর্ম, মূল্যবোধ, প্রথা এবং সংস্কার লেখকদের মন-মানস অনেকাংশে নিয়ন্ত্রণ করেছে। সেখানে মানুষের জৈবিক সম্পর্কের বিষয়টি ছিল সূক্ষ্মতাবর্জিত, স্থূল ও একরৈখিক-মনের জটিল প্রান্তগুলো তার বিচিত্র রূপ নিয়ে তাতে উপস্থাপিত হয়নি। আধুনিক যুগে যখন কথাসাহিত্যের আবির্ভাব ঘটে, তখন থেকেই মানুষের মন ও মনোজগতের অন্তরস্থ বিষয় লেখকদের কাছে গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচিত হয়েছে। এক্ষেত্রে বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভিক পর্যায়ে মানব মনস্তত্ত্ব-সংক্রান্ত সিগমন্ড ফ্রয়েডের (১৮৫৬-১৯৩৯) যুগান্তকারী আবিষ্কার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের অভিমত এ প্রসঙ্গে স্মরণযোগ্য:

> মনস্তাত্ত্বিক শাখাটিও ছোটগল্পের অন্যতম মুখ্য সমৃদ্ধি। এর বিকাশকে সবচাইতে আনুকূল্য করেছেন মনোবিজ্ঞানী সিগমুন্ড ফ্রয়েড। গল্পসাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধিতে ফ্রয়েডবাদের বিশেষ একটি ভূমিকা রয়েছে। এ যুগে এই পর্যায়ী গল্পেই লেখকের শক্তির পরিমাপ করা হয়ে থাকে।[১]

মানবমনের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম প্রবণতাসমূহের বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণে ফ্রয়েড ছিলেন অনন্য। বস্তুত মনোবিশ্লেষণসূত্রে মানবমনের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াসংক্রান্ত যে অভিসন্দর্ভ তিনি উপস্থাপন

---

* সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

করেছেন তা মানববিদ্যার ইতিহাসে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সংযোজন। তাঁর এই অভিসন্দর্ভকে নিকোলাস কোপারনিকাস (১৪৭৩-১৫৪৩) ও চার্লস ডারউইনের (১৮০৯-১৮৮২) আবিষ্কারের তুল্যমূল্য গণ্য করা হয়। ফ্রয়েডই প্রথম আবিষ্কার করেন, মানুষের যাবতীয় কর্মকাণ্ডের নেপথ্য চালিকাশক্তি তার অবচেতন মন। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, 'অবচেতনাই মানবমনের নিয়ামক' বা Sex is the main spring of our unconscious life. মানুষ তার ইচ্ছাশক্তির অধীন নয়—মানুষের ইচ্ছাশক্তি নিয়ন্ত্রিত হয় অবচেতন মনের গভীরে সুপ্ত অন্ধকার গুহাবাসী এক প্রবল জৈবিক শক্তির মাধ্যমে। ফ্রয়েডের এই বক্তব্য আধুনিক যুগের কথাসাহিত্যিকদের চেতনামূলে বৈপ্লবিক রূপান্তর ঘটিয়েছে। পুরনো বিষয় ও চিন্তাধারাকে নস্যাৎ করে নতুন মনোবিশ্লেষণ পদ্ধতির বিজ্ঞাননির্ভর এই ব্যাখ্যা শিল্পে-সাহিত্যে তো বটেই, উত্তরকালে ফ্রয়েডের শিষ্য আলফ্রেড অ্যাডলারের (১৮৭০-১৯৩৭) *The Practice and Theory of Individual Psychology* (১৯২৪) ও কার্ল গুস্তাভ ইয়ুঙ (১৮৭৫-১৯৬১)-এর *The Essays on Analytical Psychology* (১৯২৮)-র মধ্য দিয়ে বিকশিত হয়। আধুনিক কথাসাহিত্যে মানবমনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে ফ্রয়েডীয় মনোবিশ্লেষণ পদ্ধতির ব্যাপক ব্যবহারে সাহিত্যিকদের আগ্রহ লক্ষ্য করা যায়। সমালোচকের মতে:

> সামাজিক জীবনে ও লোক ব্যবহারে পরিচিত খণ্ড-মানুষের এই পূর্ণাঙ্গ সত্তাকেই আবিষ্করণের প্রয়াস শুরু হয়েছে। ফ্রয়েডীয় মনোবিজ্ঞানের যত সংযোজন ও পরিমার্জনই হোক না কেন সেখান থেকেই বর্তমান যে মনোগহনের দীপবর্তিকা লাভ করেছে তাতে মতদ্বৈধ নেই।[২]

ফ্রয়েড তাঁর গ্রন্থসমূহে[৩] মনঃসমীক্ষণধর্মী তত্ত্ব ও দর্শন উপস্থাপন করেছেন। তাঁর বক্তব্যের সারাৎসার হচ্ছে: মানুষের মনের জগৎ দুটি অংশে বিভক্ত— একটি চেতন, অপরটি অবচেতন। মানবমনের তিন চতুর্থাংশ বা তার বেশি অংশ জুড়ে রয়েছে অবচেতন মন যার ওপর মনের বা মানুষের নিজের কোনো নিয়ন্ত্রণ নেই। অথচ এই অবচেতন মনই মানুষের সকল কর্মকাণ্ডকে নিয়ন্ত্রণ করে প্রতিমুহূর্তেই। মানুষের অবচেতন মনে বা মগ্ন চৈতন্যে একচ্ছত্র অধিষ্ঠান কাম, ক্রোধ, হিংসা, স্বার্থপরতা প্রভৃতি রিপু। মানবমন যুক্তি দ্বারা চালিত নয়, কারণ সে তার ইচ্ছাশক্তির কর্তা নয়। মানুষের ইচ্ছা নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে তার মনের অবচেতনলোকের অন্ধকারে সুপ্ত থাকা জৈবিক শক্তি দ্বারা। 'বাজিকর যেমন পর্দার আড়ালে বসে অদৃশ্য সূতার সাহায্যে পুতুলদের নাচায়, তেমনি করে এক অন্ধ জৈবিক শক্তি মানুষ-পুতুলদের নাচিয়ে বেড়াচ্ছে'।[৪] মানুষের জীবনে মাত্র দুটি প্রবৃত্তি আছে: জৈবিক প্রবৃত্তি ও বংশ প্রবৃত্তি যা নিবৃত্তির জন্য মানুষ নিরন্তর ছুটোছুটি করে বেড়ায়।

মানুষের মনের ভেতর দুটি পরস্পর বিরোধী শক্তি কাজ করে— একটি জীবনমুখী, অপরটি মৃত্যুমুখী। জীবনমুখী শক্তিটির নাম ফ্রয়েডীয় প্রত্যয় অনুযায়ী 'ইরস' (Eros) এবং মৃত্যুমুখী শক্তিটির নাম 'থ্যানাটস' (Thanatos)। মানুষের জীবনমুখী শক্তির বিকাশ হয় দুটো প্রধান প্রবৃত্তির মধ্য দিয়ে: আত্মরক্ষার প্রবৃত্তি ও বংশবৃদ্ধির প্রবৃত্তি। 'আমরা যত রকম কাজ করি না কেন, তার মধ্যে এই দুটি প্রবৃত্তিই প্রকাশ পায়'[৫]। এই 'ইরস'কে ফ্রয়েড বলেছেন 'লিবিডো'। লিবিডো হচ্ছে কামপ্রবৃত্তি যা নারী-পুরুষের পারস্পরিক আকর্ষণের মূলে সর্বদা বিচরণশীল। লিবিডোর মূলে রয়েছে বংশবৃদ্ধির উদ্দেশ্য, আর বংশবৃদ্ধির মূলে রয়েছে

মানুষের আত্মরক্ষার প্রবৃত্তি। এভাবেই Eros জীবনকে সামনের দিকে নিয়ে যায়। ফ্রয়েডের মতে, লিবিডোর পরিধি অনেক বিস্তৃত। সাধারণ অর্থে লিবিডো যে অর্থ প্রকাশ করে, ফ্রয়েডে তার অর্থ অনেক সম্প্রসারিত। সাধারণ অর্থে লিবিডো যৌন প্রবৃত্তির মধ্যে সীমাবদ্ধ। কিন্তু ফ্রয়েডীয় প্রত্যয় অনুযায়ী যেকোনো রকম আকর্ষণকেই লিবিডো বলা যায়। তিনি দেখিয়েছেন যৌন আকর্ষণ থেকেই মানুষের সমস্ত আকর্ষণের উৎপত্তি ঘটে।

ফ্রয়েডের মতে মনের স্তর তিনটি: Id অর্থাৎ ইদম, Ego বা অহম Super Ego অর্থাৎ অধিসত্তা। ইদম হচ্ছে মানুষের সহজাত আদিম প্রবৃত্তি, যার প্রবল প্রভাব থাকে শৈশবাবস্থায়। এর লক্ষণ দুটো: ক্ষুধা ও রিরংসা। শিশুর বয়োবৃদ্ধি, পরিবেশ-সচেতনতা, শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক চর্চার মাধ্যমে সৃষ্টি হয় ইগো বা অহম। ইদম পর্যায়ে মনের প্রবৃত্তি থাকে অনুশাসনমুক্ত; কিন্তু পরিবেশ-সচেতনতার কারণে যে অহম-স্তরের সৃষ্টি হয় তার সঙ্গে ইদমের ঘটে তীব্র বিরোধ। এই বিরোধ হচ্ছে আদিম সত্তার সঙ্গে নৈতিক সত্তার বিরোধ। মানবমনের চূড়ান্ত বিকাশকে বলা হয় সুপার ইগো। একে বিবেকের সঙ্গে তুলনা করা যায় অনায়াসে। এটি হচ্ছে সেই মার্জিত অহম, যা মনোবিবর্তনের সর্বশেষ স্তর এবং যা শাসন করে ইগো ও ইদমকে। ত্রিস্তরে বিভক্ত মানবমনের প্রথম স্তর হচ্ছে দুর্জ্ঞেয়; কিন্তু মনের এই দুর্জ্ঞেয় প্রদেশ নির্জ্ঞান স্তরের শক্তি প্রবল; এবং সে-শক্তিকে ফ্রয়েড বলেছেন যৌনতাত্ত্বিক মূল প্রাণশক্তি বা লিবিডো। মানবমনের ইগো-সুপার ইগোর সঙ্গে ইদমের দ্বন্দ্ব সার্বক্ষণিক। এই দ্বন্দ্ব মূলত সচেতন বিবেকাংশের সঙ্গে অবচেতন নির্জ্ঞানের দ্বন্দ্ব। ফ্রয়েডের মতে, সচেতন মনের সঙ্গে লিবিডোকেন্দ্রিক ইদমের দ্বন্দ্ব যেমন যাবতীয় বিকারগ্রস্ততা, অস্বভাবী আচরণ, স্নায়ুব্যাধি ও নিউরোসিসের আদি কারণ, তেমনি ইদম স্তরের এই লিবিডোই মানুষের সকল সক্রিয়তা ও উদ্যমের সংগোপন উৎস।

ফ্রয়েড ব্যক্তির যৌন মনস্তত্ত্বের যে অজানা রহস্যকে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে উন্মোচন করেছেন তারই বৈচিত্র্যময় স্বরূপ সুবোধ ঘোষের কয়েকটি গল্পে মুখ্য হয়ে উঠেছে। অবচেতনা অন্তর্গত তীক্ষ্ণ ইন্দ্রিয়জ-প্রবৃত্তি, তার আলো-আঁধারি রূপ, দুর্জ্ঞেয় রহস্যময়তা এবং তার বিনাশী শক্তি যা প্রাত্যহিক নর-নারীকে কখনো কখনো তাড়িত করে অস্বভাবী মনোবৃত্তিতে, তাকে নিক্ষেপ করে অন্ধকরে, সেই দেহজ বাসনানির্ভর চরিত্রের সাক্ষাৎ মেলে সুবোধ ঘোষের বেশ কিছু গল্পে। বিচিত্র জীবনাভিজ্ঞতা, বিপুল পঠন-পাঠনের অধিকারী সুবোধ ঘোষের প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা[৬] সীমিত পরিসরে অর্জিত হলেও 'জ্ঞানার্জনের পথ থেকে তিনি এতটুকু সরে আসেন নি'[৭] বরং 'বিভিন্ন বিচিত্র জীবন-সংগ্রামের মধ্য দিয়েই বহু বিচিত্র অধ্যয়ন করেছেন তিনি। জীবন-সংগ্রামই ছিল তাঁর স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়। এভাবেই তিনি দর্শন, বিজ্ঞান, মনস্তত্ত্ব, নৃতত্ত্ব, ধর্মতত্ত্ব থেকে শুরু করে জ্ঞান জগতের সকল শাখাতেই স্বচ্ছন্দ বিচরণ করেছেন।'[৮] সমালোচক কল্যাণ মণ্ডলের মতে:

> বিদ্যায়তনিক কারখানায় সুবোধ ঘোষ বেশিদিন পড়েননি। বড় বড় লম্বা চওড়া ডিগ্রিও তাঁর ছিল না। কিন্তু তাঁকে পড়তে হয়েছে প্রচুর, জানতে হয়েছে বিস্তর। জীবনের মুক্ত পাঠশালা থেকে তিনি সঞ্চয় করেছিলেন অজস্র বিচিত্রসব অভিজ্ঞতার ডালি। সেই ডালিগুলি ভরা ছিল কালোয়-ধলোয়, মানবজীবন ও মানবসম্পর্কের বিচিত্র সৌন্দর্য্যে ও কদর্যতায়, জটিলতায় আর মধুরিম সরলতায়। কলেজের পড়াশুনোর

> পাঠ তিনি চুকিয়ে দিয়েছেন মাত্র পনের বছর বয়সে, বলা চলে দোরগোড়া থেকেই তাঁর ফিরে যাওয়া জীবনের দুর্গম পথে। জীবিকার অন্বেষণ তাঁকে এক স্থান থেকে স্থানান্তরে টেনে নিয়ে গেছে। কিন্তু বিদ্যায়তনিক পড়াশুনো ছেড়ে দিতে হলেও সুবোধ ঘোষ কোনোদিনই তাঁর জ্ঞানার্জনের দুয়ার রুদ্ধ করেননি। বরং তাঁর জ্ঞানতৃষ্ণাকে নিবারিত করে চরিতার্থতা দেবার জন্য তিনি নিয়মিত স্বনির্ভর অধ্যয়নের মাত্রা ও পরিধিকে বাড়িয়ে নেবার চেষ্টা করেছেন সর্বদাই। এ বিষয়ে তিনি নিজেই জানিয়েছেন: (হাজারিবাগ জেলা স্কুলের অ্যাসিস্ট্যান্ট হেডমাস্টার) "দার্শনিক মহেশচন্দ্র ঘোষের লাইব্রেরি ছিল আমার নিজের ইচ্ছানুচালিত শিক্ষার একটি বড় সহায়। আমার এই আত্মনির্ভর শিক্ষার সিলেবাসে কাহিনী সাহিত্যের কোন স্থান একরকম ছিল না বললেই চলে। ইতিহাস, দর্শন ও ধর্মতত্ত্বের বই পড়বার দিকে আমার বেশি ঝোঁক ছিল।" বিজ্ঞান, মনস্তত্ত্ব কিংবা পুরাতত্ত্ব, নৃতত্ত্বেও তাঁর কম আগ্রহ ছিল না।[৯]

সমালোচকের এমন তথ্যবহুল বক্তব্য যে সর্বাংশে স্বীকার্য তা লেখকপত্নী মুকুলরাণী ঘোষের নিম্নোক্ত স্মৃতিচারণায় স্পষ্টভাবে প্রকাশিত:

> মাঝে মাঝে ভাবি, এত বই কি উনি পড়েছেন? কিন্তু যে বইটাই খুলতে যাই, দেখি পেনসিলের দাগে আন্ডারলাইন করা কিম্বা মার্জিনে নোট লেখা ওঁর নিজের হাতে। ভোরে উঠে মুখ ধুয়ে চা খেয়েই লাইব্রেরিতে চলে যেতেন, লেখাপড়ার কাজ শুরু হয়ে যেত।[১০]

সুবোধ ঘোষ তাঁর লেখকজীবনের সূচনালগ্নে ফ্রয়েড সংক্রান্ত ১২টি মূল্যবান প্রবন্ধ রচনা করেছিলেন যেগুলো *সিগমুণ্ড ফ্রয়েড* নামে ১৯৪৩ খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়েছিল। পরবর্তী সময়ে এই ১২টি প্রবন্ধ নিতাই বসুর সম্পাদনায় ২০০০ সালের জানুয়ারি মাসে সাহিত্যলোক থেকে প্রকাশিত *সুবোধ ঘোষ: প্রবন্ধাবলী* গ্রন্থের দ্বিতীয় অধ্যায়ে 'মনোবিজ্ঞান' শীর্ষক অংশে স্থানপ্রাপ্ত হয়েছে। প্রবন্ধগুলোতে মনস্তত্ত্বের বিভিন্ন দিক ও তার কারণ বিশ্লেষিত হয়েছে যুক্তিপরম্পরায়। ফ্রয়েডের মনস্তত্ত্বসংক্রান্ত তাত্ত্বিক বিষয় স্বীকরণ করে সুবোধ ঘোষ তাঁর নিজস্ব দৃষ্টিকোণ থেকে প্রবন্ধগুলো রচনা করেছেন। কোনো কোনো ক্ষেত্রে লেখকের স্বাধীন মতামত প্রকাশের প্রবণতাও চোখে পড়েছে। এ প্রসঙ্গে সমালোচক বসন্ত লস্কর উল্লেখ করেন:

> সুবোধ ঘোষের 'সিগমুণ্ড ফ্রয়েড' সাধারণ পাঠকের ফ্রয়েড নিয়ে যাবৎ কৌতূহল তো মেটাবেই, এমনকি ক্ষেত্রে ক্ষেত্রে ফ্রয়েডের একনিষ্ঠ ছাত্ররাও শ্রীঘোষের একান্ত technical বিষয়ের ও প্রাঞ্জল উপস্থাপনায় চমকিত হবেন। সিগমুণ্ড ফ্রয়েডকে যে তিনি শুধু পাঠক হিসেবে পড়েছেন তাই নয় : অসামান্য সব ছোটগল্পের স্রষ্টা সুবোধ ঘোষ যে একজন sub-creator হয়ে উঠতে পেরেছিলেন, তার সেই রহস্যের চাবি লুকানো আছে এই সত্যে যে, তিনি ফ্রয়েডকে আত্মস্থ করেছিলেন। যার ফলে 'সিগমুণ্ড ফ্রয়েড' ফ্রয়েডকে প্রাথমিক ভাবে জানার ক্ষেত্রেই সহায়ক বই মাত্র নয়, এই বই ফ্রয়েডীয় তত্ত্বের transcreation.[১১]

আলোচ্য প্রবন্ধসমূহে সুবোধ ঘোষ ফ্রয়েডের তত্ত্বটিকে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যাখ্যা করেছেন। ফ্রয়েড মনের সমগ্রতাকে যে তিনটি ভাগে ভাগ করেছেন তার উৎসও তিন রকম। যথা অদস বা ইদ (Id), অহম বা ইগো (Ego) এবং অধিশাস্তা বা সুপার ইগো (Super Ego)। আধুনিক মনোবিজ্ঞানীরা ইদ, ইগো এবং সুপার ইগো মনের এই ত্রি-উৎসকে যথাক্রমে 'child', 'adult' এবং 'parent' নামে অভিহিত করতে অধিক পছন্দ করেন। কিন্তু নামের পরিবর্তনের সঙ্গে বিষয়ের কোনো পরিবর্তন হয় না। সহজাত যে মানসিক বৃত্তি তা

হলো স্বয়ম্ভু আদিম ব্যক্তিত্ব, ফ্রয়েড যার নাম দিয়েছেন ইদ। বলা যায় ইদ ব্যক্তিত্বের সর্বাপেক্ষা গূঢ়তম অংশ, যার ইচ্ছা বহির্জগতের সংস্পর্শে এসে শুধু সুখভোগ করা, কিন্তু এর জন্যে সে বিচক্ষণ-অহময়ের দ্বারস্থ হয়। অন্যদিকে অহম বিচারের রায় প্রার্থনা করে অধিশাস্তা বা বিবেকের কাছে। একে নৈতিক সত্তা বললেও ভুল হয় না। 'এ সত্তা সৃষ্টির মূলে প্রধানতঃ ক্রিয়াশীল হয় পিতামাতার শিক্ষা ও উপদেশ। এ ভিন্ন সামাজিক নিয়মকানুন ও অনুশাসন আর ধর্মও তার প্রভাব ঘটায়।'[১২] মূলত 'বাপ মা যেমন কিশোরকে শাসন করেন, পরা ইগোরও কাজই হল গুরুগিরি। এটা ঠিক, ওটা ভুল–নিরন্তর এই শাসন সে ইগোর উপর জারি রাখে।'[১৩] সুবোধ ঘোষ "মনের রথী ও সারথী" প্রবন্ধে বলেছেন:

> ইদ যেন সকল ইচ্ছার মূলাধার—প্রতিনিয়ত চরিতার্থতার জন্য উন্মুখ হয়ে রয়েছে। আর ইগো হলো সতর্ক সামাজিক বৃত্তি, যা হিসেব ও বিবেচনা করে চলে। ইগো ইদকে শাসিয়ে স্তব্ধ করে রাখতে চায়।[১৪]

ফ্রয়েডের মতে, ব্যক্তির স্বাভাবিক জীবন নির্ভর করে অদসের এই আত্মপ্রকাশের চেষ্টা ও অধিশাস্তার কাছে অহম-এর আত্মসমর্পণের ভারসাম্যের মধ্যে। এর ব্যত্যয় ঘটলে অচেতন-অবচেতনের বাসনাকে সীমাহীনভাবে ছেড়ে দিলে চেতনমনে অহমসত্তার বিলোপ ঘটবে এবং সেই ব্যক্তি বিভিন্ন মানসকূট ও অপচারের শিকার হয়ে পড়বেন। মানসকূট (complex) হলো ভাবনাবিকার এবং অপচার (perversion) হলো আচরণের বিকার। "মন ও মনসিজ" প্রবন্ধে সুবোধ ঘোষ বলেছেন, 'আচরণের ভেতর দিয়ে চরিতার্থতা লাভের অভাবেই লিবিডো মানসকূট সৃষ্টি করে।'[১৫] মনোচিকিৎসক ফ্রয়েড মানুষের ভাবনা ও আচরণের প্রেষণা হিসেবে লিবিডো (Libido) কেই একমাত্র দায়ী করেছেন। ফ্রয়েডের মতে, 'এই লিবিডো প্রকৃতিতে অত্যন্ত স্বার্থপর, দৈহিক সুখ-অন্বেষী, মানবীয় মূল্যবোধ কিংবা সমাজ ও ধর্মনীতি অনুসরণে অনাগ্রহী।'[১৬] মানবজীবনের প্রারম্ভিক স্তরে এ লিবিডো বা রতি নিজেকে প্রকাশ করে আত্মপ্রীতির মাধ্যমে, যৌবনে যার রূপান্তর ঘটে প্রেমে। কিন্তু পার্থিবলোক লিবিডোর স্বচ্ছন্দ প্রকাশকে কোনোদিনই ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গিতে পর্যবেক্ষণ করে না। ফলে লিবিডো আত্মপ্রকাশ ঘটায় মানসকূট অথবা অপচার-এর মাধ্যমে। মূলত মানবমনের ইদগত অচরিতার্থতায় মানসকূট সৃষ্টি করে, লিবিডো মানুষকে সামাজিক অপরাধের দিকে ঠেলে দেয়। 'বাস্তবের সঙ্গে লিবিডোর প্রতিক্রিয়ার ফলে মনের মানুষ জটিল হয়ে পড়ে। নানা বাঁকাচোরা পথে লিবিডো আত্মপ্রকাশে তৎপর হয়ে ওঠে।'[১৭] বাস্তবের সঙ্গে লিবিডোর এই দ্বন্দ্বের ফলে নানা ধরনের বিকৃত মনোভাব বা মানসকূটের উদ্ভব ঘটে। সুবোধ ঘোষ "মন ও মনসিজ" প্রবন্ধে এ সংক্রান্ত মানসকূটের কয়েকটি দৃষ্টান্ত উল্লেখ করেছেন। যেমন, অপরকে পীড়ন করে বা দুঃখ দিয়ে সুখলাভের প্রবণতা (Sadism), আত্মপীড়ন বা অপরের দ্বারা নিপীড়িত হয়ে উৎকট ধরনের আনন্দলাভের ইচ্ছা (Masochism), নিজের প্রতি অনুরাগবশত আত্মকাম (Narscism), নিজেকে অপরের নিকট আকর্ষণীয় করে তোলার প্রবণতা (Exhibitionism), বস্তুজগৎ বা পদার্থের প্রতি অকারণ মোহগ্রস্ত হবার ইচ্ছা (Fetishism) প্রভৃতি। এছাড়া লেখক তাঁর আলোচ্য প্রবন্ধে মাতা ও পুত্রের আসক্তিজনিত 'ইদিপাস' এবং পিতা-পুত্রীর 'ইলেকট্রা' মানসকূটের উল্লেখ করলেও এ সংক্রান্ত কোনো গল্পের দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় না। ফ্রয়েডের মনোবিকলন সংক্রান্ত সুবোধ ঘোষের বেশ কিছু গল্প

আমরা দেখি যেগুলোতে ব্যক্তির যৌন মনস্তত্ত্বের বিবিধ প্রান্ত উন্মোচিত হয়েছে। সুবোধ ঘোষের এই চেতনার গল্পগুলোর দুটি ধরন উল্লেখসূত্রে সমালোচক তপন মণ্ডল বলেছেন:

> একটিতে শুধু অসুস্থমনের বিকৃতির কথা অর্থাৎ মানসকূটের নিদর্শন, অন্যটিতে প্রকৃতই সুস্থতার অন্বেষণ অর্থাৎ চরিত্রগুলির আচরণগত অপচারের পরিবর্তন। একটি যদি হয় মানবমনের কুৎসিত দিকগুলির প্রতিচিত্রণ, অন্য দিকটি অবশ্যই কুৎসিতের মধ্যে সৌন্দর্য অনুধ্যান।[১৮]

প্রায় একই মন্তব্য করেছেন আরেক সমালোচক শিবশংকর পাল:

> সুবোধ ঘোষের ফ্রয়েডিয় মনস্তত্ত্বমূলক গল্পগুলিতে দু'ধরনের জীবন-বৈচিত্র্য লক্ষণীয়। কোন কোন গল্পে ফ্রয়েডিয় মনস্তত্ত্ব ও মনঃসমীক্ষণ পদ্ধতির সাহায্যে মধ্যবিত্তের অসুস্থতা, বিকার, জীবনবিমুখ অবক্ষয়িত মানসিকতার 'নষ্ট শসা,' 'পচা চালকুমড়া,' 'গলগণ্ড' সমন্বিত বীভৎস চেহারাটাকে উন্মোচিত করে দিয়েছেন। এ ধরনের গল্পগুলিতে কোন চরিত্রের সুস্থ উত্তরণ লেখক দেখাননি। তিনি নিজেই যেন খানিকটা জীবনবিমুখ হয়ে পড়েছিলেন এ গল্পগুলিতে। আবার কিছু কিছু গল্পে মনঃসমীক্ষণের সাহায্যে বিকারগ্রস্ত, অসুস্থ, উন্মত্ত মানুষগুলির চাপা পড়ে থাকা মানবিকতায় নতুন টাটকা রক্ত সঞ্চার করে তাদেরকে সুস্থ পৃথিবীতে ফিরিয়ে এনেছেন। এই গল্পগুলিতে লেখকের মানবিক মূল্যবোধ চর্চা অব্যাহত থেকেছে।[১৯]

সুবোধ ঘোষের প্রথম প্রকাশিত গল্প 'অযান্ত্রিক'[২০] (১৯৪০)-এ ফ্রয়েডীয় মনোবিকলন-আশ্রিত বস্তুরতির সার্থক চিত্র উপস্থাপিত। আলোচ্য গল্পের নায়ক আর্থিক দিক থেকে প্রায় সহায়-সম্বলহীন এবং সাংসারিক ও পারিবারিক দিক থেকেও বিবিক্ত, অসহায় বিমলের একমাত্র সঙ্গী একটি জরাজীর্ণ গাড়ি 'জগদ্দল' যা 'সাবেক আমলের একটা ফোর্ড, প্রাগৈতিহাসিক গঠন, সর্বাঙ্গে একটা কদর্য দীনতার ছাপ'[২১]; এরূপ প্রাণহীন পদার্থের প্রতি নায়ক বিমলের যে আকর্ষণ গল্পে উপস্থাপিত হয়েছে তা তার বস্তুকামের সার্থক দৃষ্টান্ত বলা যেতে পারে। *Three Essays on the theory of Sexuality* গ্রন্থে ফ্রয়েড মানুষের যৌনচেতনার বিচিত্র ধরনধারণ নিয়ে যে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করেন তার একটি তাৎপর্যপূর্ণ অংশ হলো বস্তুরতি (Fetishism)।[২২] এর লক্ষণ হলো, বস্তুনিচয়ের প্রতি অকারণ মোহজাত হৃদয় দৌর্বল্য। গল্পে বিমল তার গাড়ি জগদ্দলের প্রতি যে আচরণ প্রকাশ করেছে তা ফ্রয়েডীয় বস্তুরতির অনুগামী। যন্ত্র হিসেবে নয়, জগদ্দলকে একান্ত আপনজন হিসেবে বিবেচনা করে বিমল তার প্রতি ভালোবাসা, মমত্ববোধ, রাগ, দুঃখ, অভিমান— এসকল অনুভূতি প্রকাশ করেছে। 'যন্ত্রের প্রতি মানুষের যে স্বাভাবিক আচরণ প্রকাশিত হয় তা থেকে ভিন্নতর এক অযান্ত্রিক সম্পর্কে বিমল আর জগদ্দল নিত্য স্পন্দিত হয়েছে।'[২৩] কেবল তা-ই নয়, এই গাড়িটি কখনো বিমলের কাছে স্ত্রীসদৃশ হয়ে ওঠে। তাই পিয়ারা সিং যখন বিমলকে তার এ আপনজনকে মুক্তি দিয়ে নতুন গাড়ি ক্রয়ের প্রস্তাব দেয় বিমল তার জবাবে প্রতিবাদী হয়ে বলে ওঠে, 'হুঁ, তারপর তোমার মতো একটা চটকদার হাল-মডেল বেশ্যে রাখি।'[২৪] এখানে জগদ্দলকে বিদায় করে হাল আমলের গাড়ি কেনা বিমলের কাছে স্ত্রীকে বিদায় দিয়ে বেশ্যাকে বাড়িতে আনারই নামান্তর। এছাড়া নিজের হাতঘড়ি, বাসনপত্র এমনকি আসনের তক্তপোশটা পর্যন্ত বিক্রি করে 'জেনুইন পার্টস' আনিয়ে জগদ্দলকে নতুন করে সাজায় বিমল যা তার বস্তুরতিবাদের সার্থক চিত্রায়ণ বলা যেতে পারে। কাহিনীর নায়ক বিমল হলেও এখানে পৃথকভাবে যেন একটি জীবিত সত্তা হয়ে ওঠে জগদ্দল নিজেও। বিমলের

বেদনার জগৎকে যথাযথভাবে চিত্রিত করার জন্য সার্থকভাবে নির্মিত হয়েছে জগদ্দল চরিত্রটি। মনুষ্যেতর প্রাণীকে এইভাবে গল্পের মূল আখ্যানে তুলে এনে মানুষের মতো আচরণ সার্থকতার সঙ্গে সম্পন্ন করায় গল্পের পৃথক একটি চরিত্র করে গড়ে তোলার নিদর্শন বাংলা সাহিত্যে আমরা এর আগেও প্রত্যক্ষ করেছি। প্রসঙ্গত প্রভাতকুমারের "আদরিণী", শরৎচন্দ্রের "মহেশ", তারাশঙ্করের "কালাপাহাড়" প্রভৃতির উল্লেখ করা যায়। কিন্তু কোনো যন্ত্রকে গল্পের কেন্দ্রে চরিত্র হিসেবে স্থাপন করে গল্পআখ্যান নির্মাণ বাংলা সাহিত্যে এই প্রথম। বীরেন্দ্র দত্তের মতে, বিমল গল্পের নায়ক হলেও জগদ্দল গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র, কারণ:

> বিমলের যা কিছু চিন্তা-ভাবনা, ক্ষোভ, ক্লেশ, দুঃখ-কষ্ট, অসহায়তা, আনন্দ, উল্লাস-সব কিছুই জগদ্দলকে কেন্দ্র করে, তাকেই মানবজীবনের তথা বিমলের পক্ষে বিশাল শ্রমজীবনের একমাত্র ভিত্তি করে।[২৫]

বস্তুরতির এমন সার্থক দৃষ্টান্ত বাংলা ছোটগল্পে প্রায় দুর্লভ বলা যায়। নিঃসঙ্গ বিমলের পনেরো বছরের এই আপনজন যখন বিক্রি হয়েছে চোদ্দ আনা মণ দরে, তখনও তার জগদ্দলের প্রতি ভালোবাসা অন্তর্হিত হয়নি। এখানেই গল্পটি বিশিষ্ট ও অনন্য হয়ে উঠেছে। সমালোচক জগদীশ ভট্টাচার্য আলোচ্য গল্প প্রসঙ্গে বলেছেন:

> 'অযান্ত্রিকে' যন্ত্রযুগ যেন কথা কয়ে উঠল! জড়ে আর জীবে, যন্ত্রে আর মানুষে এ যুগের জীবন যে অবিচ্ছেদ্যভাবে গ্রথিত, এই সত্যই যেন নতুন করে উদ্ভাসিত হল এই গল্পে।[২৬]

অপর সমালোচক চলচ্চিত্রকার ঋত্বিক ঘটকের মতে:

> সবচেয়ে নাড়া দিয়েছিল গল্পটার philosophic implication. এই একটি গল্প যেটা আমাদের সাহিত্যে একটা নতুন ধরনের সম্পর্কের রূপদান করেছে–মানুষ ও যন্ত্রের মধ্যে অবশ্যম্ভাবী তাৎপর্যপূর্ণ যে সম্পর্ক। ... কথাটা হলো, আমাদের ঐতিহ্যের সাথে ভবিষ্যৎকে একীভূত করার পথটা আমাদের বাছতে হবে, যন্ত্রযুগকে স্বাগত জানাবার হৃদয়বৃত্তি অর্জন করতে হবে। 'অযান্ত্রিক' গল্পটি ঠিক এই সত্যটিকেই আমাদের সাহিত্যে সর্বপ্রথম বুঝিয়ে দিল।[২৭]

বস্তুরতির পাশাপাশি মানব-মনস্তত্ত্বের অপর বিকৃত অস্বভাবী আচরণ আত্মবিজ্ঞাপনের রুচি বা (Exhibitionism) এর সাক্ষাৎ মেলে সুবোধ ঘোষের "গরল অমিয় ভেল"[২৮] (১৯৪২) শীর্ষক ছোটগল্পে। গল্পটি 'সুবোধ ঘোষের নিঃসন্দেহে সর্বোত্তম ব্যক্তি মনস্তাত্ত্বিক ছোটগল্প।'[২৯] দ্বিতীয় মহাসমরকালীন পর্বে রচিত এ গল্পটিতে এক মধ্যবিত্ত তরুণীর জটিল মনস্তত্ত্বের রূপরেখা এবং তার অবচেতন মনের রহস্যময় প্রবৃত্তি অত্যন্ত সূক্ষ্মভাবে অঙ্কন করেছেন লেখক। সুবোধ ঘোষ আলোচ্য গল্পে চন্দ্রবাবুর কন্যা মালা বিশ্বাসের হীন মানসিকতা এবং পুরুষের জন্য প্রেমার্তিজনিত বিকৃত আত্মরতির চিত্র উপস্থাপন করেছেন সার্থকভাবে। কেবল কেন্দ্রীয় চরিত্র মালা বিশ্বাস নয় ; গল্পের পরিপ্রেক্ষিত নারী চরিত্রসমূহের মনস্তাত্ত্বিক জটিলতা আর পুরুষের জন্য তাদের অবদমিত আকাঙ্ক্ষার স্বরূপটিও এখানে উন্মোচিত হয়েছে। সমালোচকের মতে :

> এই চিত্র আঁকার প্রয়াসে আছে অভিনবত্ব। গল্পের উপস্থাপনা কৌশল আদ্যন্ত পাঠকদের রুদ্ধশ্বাস আড়ষ্টতায় ধরে রাখে। 'গরল অমিয় ভেল' গল্পে সুবোধ ঘোষ এক ব্যক্তি নারীর (মালা) মনের জগতের আধুনিকা স্বভাবের বিকারকে যেমন এঁকেছেন, তেমনি কয়েকজন যুবতী নারীদের একত্র সমবেত করে

> শিক্ষিত যুবতীদের মধ্যে mass psychology-র সূত্রে অসাধারণ দক্ষতায় তাদের আকর্ষণ করেছেন। আলোচ্য গল্পটি অবশ্যই জটিল মনস্তত্ত্বের এক রহস্যময় এ্যালবাম—যার মধ্যে আছে পুরুষদের ভিড়ে কয়েকটি রমণীর অন্ধকার মনোলোকের ছবি।[৩০]

আলোচ্য গল্পের নারী চরিত্র মালা বিশ্বাসের বিকৃত মানসিকতার মূলে ক্রিয়াশীল তার কদর্যরূপ। তাই সে উগ্র আধুনিকা:

> সকলেই চেনে মালা বিশ্বাসের মুখের বসন্তের দাগগুলি, কালো মোটা চেহারা, চোখে অদ্ভুত রকমের চশমা, হাতে ছাতা, তার শাড়ি, রঙ-এর বৈচিত্র্য আর পরবার কায়দায় হাঁ করে তাকিয়ে দেখার মতো।[৩১]

লেখা বাহুল্য, মালা বিশ্বাসের অবচেতনলোকে বিচরণশীল তার স্বভাবজাত বৈশিষ্ট্য। কেননা 'নিজেকে পুরুষের সামনে আকর্ষণীয় করে তুলতেই হবে, নচেৎ তার নারীজীবন বৃথা।'[৩২] মালা বিশ্বাসের এরূপ আচরণের মূলে রয়েছে তার অপরিণত ব্যক্তিত্ব ও হীন মানসিকতা:

> মানসিক অপরিপক্বতা থেকেই প্রদর্শনকামের উৎপত্তি ঘটে। অপরিণত ব্যক্তিত্ব, সামাজিক দক্ষতার অভাব এবং ব্যক্তি পারস্পরিক সম্পর্ক স্থাপনে অপটুত্বের জন্যই প্রদর্শনকামীরা এরূপ অস্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় যৌন তৃপ্তি লাভের চেষ্টা করে।[৩৩]

আলোচ্য গল্পে মালা নারীমহলে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের শিকার হয়ে যোগ দেয় স্কুলের বার্ষিক উৎসবে। তার এ অপমানের তীব্রতা প্রকাশ পায় ক্রসরোডের মোড়ে অবস্থিত কালো পাথরের টিলায় অজ্ঞাতনামা এক লিপি-বিশারদ কর্তৃক লিখিত শহরের অচেনা মেয়েদের নামে কলঙ্ককীর্তনের অপপ্রচারে। তাদের মধ্যে মহীতোষ বাবুর কন্যা পূর্ণিমা, কোনো এক সুমিতা নন্দী, সুধা দত্ত, প্রীতি মুখার্জী, মালা বিশ্বাসের বান্ধবী মুক্তি রায় প্রমুখ উল্লেখযোগ্য। মালার জীবন আরো দুর্বিষহ হয়ে ওঠে যখন কুৎসার এই অপপ্রচার এ সকল নারীর জীবনে প্রশস্তি হয়ে আবির্ভূত হয়। শহরজুড়ে আলোড়ন সৃষ্টিকারী এ নারীদের বিপরীতে মালা এক গভীর যন্ত্রণাদায়ক শূন্যতায় নিক্ষিপ্ত হয়:

> সার্থক জীবন পূর্ণিমাদের। ওরাই প্রার্থিতা। আড়াল থেকে মুক্ত করে এনে সংসার ওদেরই মুখ দেখতে চায়। ওরা দয়িতা-কামনার লীলাকুরঙ্গী। কুৎসা কলুষও ধন্য হতে চায় ওদেরই আশ্রয়ের প্রসন্নতায়। আর সকল কামনার সীমানার ওপারে এক বেদনাহীন বিরাগের মরুস্থলীতে দাঁড়িয়ে আছে মালা। সে একা, সে নিঃস্ব।[৩৪]

নৈঃসঙ্গ্যের বেড়াজাল থেকে মুক্তি পেতে অবচেতনের অন্ধ আবেগে তাড়িত হয়ে মালা এক চাঁদ-ওঠা সন্ধ্যেয় লোকচক্ষুর আড়ালে নিজেই নিজের নামে কুৎসা-কলুষ বাণী কালো পাথরের বুকে সাদা খড়ির আঁচড়ে প্রচার করে। গল্পের শেষে লেখক তাই নিরাসক্ত স্বভাবে মালা বিশ্বাসের পতনকে একেবারে নিখুঁত নির্মমতায় অঙ্কন করেছেন:

> মালা বিশ্বাস, তোমায় দূর থেকে সেলাম করি। এক দুই তিন চার ... থাক, বেচারাদের নাম আর করবো না। কত পতঙ্গের পাখা পুড়ে গেল। আর সংখ্যা বাড়িও না। তোমার চিঠির তাড়া রাণী ঝিলের জলে ভাসিয়ে দিয়ে এবার সুস্থির হও।[৩৫]

মূলত সুবোধ ঘোষ 'এ গল্পে মালা চরিত্রের নির্মাণে আধুনিক মনোবিজ্ঞানের যথার্থ প্রয়োগ করেছেন।'[৩৬] মালার হীন মানসিকতা, তার আচার-আচরণের আপাত অসংলগ্নতা,

প্রদর্শনকামের মতো বিকৃত মনস্তত্ত্ব লেখক সংকেতে ও ইঙ্গিতে গভীর তাৎপর্যময় করে গল্পে পরিবেশন করেছেন। সমালোচক অরিন্দম গোস্বামী তাই বলেছেন:

> গভীর মনস্তাত্ত্বিকতায় দ্বন্দ্বমুখর এই গল্পে সুবোধ ঘোষ পরতে পরতে নারীর মনোগহনকে প্রকাশিত করেছেন। অন্যের কামনার ধন হিসেবে নিজেকে প্রকাশ করাতেই যে নারীজীবনের সার্থকতা একথা তিনি বলেননি কোথাও। কিন্তু গল্পের শেষে এই সত্য আমরা মর্মে মর্মে উপলব্ধি করি। কুরূপা রমণীর হীনন্মন্যতা, তার প্রেমের জন্য অকুণ্ঠ পিপাসা, বোধবুদ্ধিহীন আচরণ, ঈর্ষান্বিত প্রতিশোধ সমস্ত কিছুই এখানে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে গভীর সাংকেতিকতায়।[৩৭]

"সুন্দরম্"[৩৮] শীর্ষক গল্পটিতে ফ্রয়েডীয় মনোবিকলনের যথার্থ চিত্র লক্ষণীয়। আলোচ্য গল্পের মনোবিকলনজনিত সংকট মধ্যবিত্ত সন্তান সুকুমারের বিবাহকে অবলম্বন করে আবির্ভূত হয়েছে। সুকুমারের বিবাহ সংক্রান্ত সমস্যা এবং পাত্রী নির্বাচনের আপাত ব্যর্থতাই গল্পের মূল বিষয়বস্তু বলে প্রথমার্ধে মনে হলেও আখ্যানের কাহিনীকে জটিল করে তুলেছে ভিখারিনী তুলসীর আকস্মিক আগমন। গল্পের শুরুতে দেখি ময়না তদন্তের অভিজ্ঞ ডাক্তার কৈলাসবাবুর নিদারুণ সাংসারিক বৈভবের মাঝে পুত্র সুকুমার ব্যর্থ ব্রহ্মচর্য-সাধনায় রত। সমালোচকের মতে:

> সুকুমার চরিত্রটিকে মনোবিজ্ঞানের আলোয় প্রকাশ করেছেন লেখক। সে মনোরোগী। তার ব্রহ্মচর্য্য পালনের পদ্ধতিটি তার মনোরোগেরই প্রকাশ। তাই জীবনমুখী ও স্বাভাবিক নয়।[৩৯]

প্রাণায়াম আর যোগশাস্ত্রে অভ্যস্ত সুকুমারের এরূপ ধ্যানের জগৎ পিতা কৈলাসবাবুর ভাষায় প্রোটিনের অভাব আর অপরদিকে 'সুকুমার চোখ বুজলেই মুক্তির পিপাসায় ডাকছে–মুক্তি দে, মুক্তি দে।'[৪০] "মনোবিজ্ঞানের আবির্ভাব" প্রবন্ধে সুবোধ ঘোষ ইদগত কামনার অন্বেষণে একটি বাক্যে বলেছেন, 'মনের অতলজলের আবর্তে এক মজ্জমান কামনা সুন্দরী ডাকছে–আমায় উদ্ধার কর।'[৪১] সংসারবিমুখ সুকুমারের এরূপ মানসিকতার পরিবর্তন সাধনে তাই তৎপর ভগ্নিপতি কানাইবাবু তাকে নিচ রিপুরসের বর্ণনামূলক একটি উপন্যাস পড়িয়েছেন, ঘন ঘন সিনেমায় নিয়ে গিয়েছেন। ফলে সুকুমারের মন ক্রমশ বলে উঠেছে, 'কানাইবাবু, মানুষের মাঝে আমি বাঁচিবারে চাই।'[৪২] মনোবিজ্ঞানীরা মানুষের ব্যর্থ ইচ্ছার কামনাকে 'Trauma' নামে চিহ্নিত করেছেন, যা সুকুমার-চরিত্রে ব্রহ্মচর্য সাধনা। যৌনতা (Sex) প্রসঙ্গে ফ্রয়েডের অভিমত হলো মানুষের অন্তর্জগৎ জুড়ে যে কামপ্রবৃত্তি বিরাজ করছে তা অহম বা আত্মাশ্রয়ী নয়, এর জন্যে বাস্তব উদ্দীপকের প্রয়োজন হয়। এই বাস্তব উদ্দীপক প্রথমে সুকুমার চরিত্রে নিচ-রসের উপন্যাস পাঠ কিংবা সিনেমা দেখা এবং পরবর্তী সময়ে স্খলিতবসনা তুলসীর দেহজ আকর্ষণ সূত্রে গল্পে বর্ণিত হয়েছে। এরই প্রতিক্রিয়ায় গল্পে আমরা দেখি সুকুমারের তুলসীকে কেবল ভোগ করাই নয়—বিষ-মিশ্রিত পাউরুটি আহার করিয়ে তাকে হত্যা করার চিত্র। আসলে সুকুমারের কামাবেগ সার্থকতার সঙ্গে সঙ্গে তার চরিত্রে ইদ ও ইগোর দ্বন্দ্ব শুরু হয়ে যায়। তাই তার অহমসত্তা পরাভূত হয়ে সমাজগত ভয়ে আচরণগত অপচারে দৃষ্টি নিমেষ করতে বাধ্য হয়েছে। মনের গহনলোকে বিদ্যমান এ ধরনের প্রাণান্তকর ইচ্ছাকে মনঃসমীক্ষণের পরিভাষায় 'Sadism complex'[৪৩] বা ধর্ষকাম বলা হয় অর্থাৎ নিজের সুখ ও স্বার্থে অপরকে নিগ্রহ করার দুরন্ত আনন্দ। 'সমগ্র গল্পটি এই

কূটের শিকার হয়েছে মধ্যবিত্ত পরিবারের মেকি সৌন্দর্যতত্ত্বে বিশ্বাসী পাত্র-পাত্রীর মনোভাবের দ্বন্দ্বে।'[৪৪] তাই দেখা যায় পরিবারের সদস্যগণ সুকুমারের বিয়ের এক একটি সুন্দরী পাত্রী অপছন্দতেই তৃপ্তিলাভ করতে উৎসাহী ও তৎপর। অপরদিকে সুকুমার চরিত্রের অন্তরালে অবগাহন করে লেখক তার যৌনবিকারের চিত্র উন্মোচিত করেছেন যথাযথভাবে। বস্তুত তুলসীকে ঘিরে সুকুমারের যৌনাসক্তি ও তার যে বিকারগ্রস্ত মনের পরিচয় গল্পে চিত্রিত হয়েছে তা সংক্ষিপ্ত ও ইঙ্গিতবহ ভাষায় ব্যক্ত করতে সুবোধ ঘোষ শিল্পসার্থকতার স্বাক্ষর রেখেছেন।

মানুষের সর্বাপেক্ষা মৌলিক প্রবৃত্তি আত্মপ্রতিষ্ঠা লাভের ইচ্ছা। আত্মপ্রতিষ্ঠা লাভ করতে অসমর্থ হলে মানুষের ভেতর হীনতাবোধ দেখা দেয়। হীনতাবোধ থেকে বিভিন্ন মানসিক জট (Inferiority complex) উদ্ভূত হয় যাকে ব্যক্তির স্বাভাবিক ব্যক্তিত্ব বিকাশের প্রধান অন্তরায় রূপে চিহ্নিত করা যায়। ফ্রয়েডের ধারণা অনুযায়ী এ পৃথিবী প্রধানত দুটি ভাগে বিভক্ত: অন্তর্লোক বা মনোজগৎ, অন্যটি বহির্লোক বা প্রতিবেশ। এই অন্তর্লোক ও প্রতিবেশের মধ্যে সুচারু সম্পর্ক গড়ে তোলাই সমাজজীবনের অন্যতম প্রধান সমস্যা। আমাদের মানসলোকের নিরন্তর চাঞ্চল্য ও বিক্ষোভের একটি প্রধান কারণ হলো: বহির্জগৎ তথা প্রতিবেশের সঙ্গে অন্তর্জগতের সংঘর্ষ। জন্মমুহূর্ত থেকে শুরু করে মৃত্যু পর্যন্ত এই প্রতিবেশ আমাদের ঘিরে রয়েছে। অথচ বেশিরভাগ ক্ষেত্রে এই প্রতিবেশ কিংবা বাস্তবলোক আমাদের কাছে চরম বিরক্তিকর ও দুঃখদায়ক। অপ্রীতিকর প্রতিবেশে বিভিন্ন ব্যক্তির মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের মানসিক প্রতিক্রিয়া দেখা যায়। কেউ বা একে অবিচলচিত্তে গ্রহণ করেন, আবার কেউ কেউ বাস্তবকে এড়িয়ে যান নানা প্রতিক্রিয়ার সাহায্যে। ফ্রয়েড এই ক্রিয়াসমূহকে 'Escape Activity' বা পলায়নী কর্মবৃত্তি বলে আখ্যা দিয়েছেন। সমালোচক মানস রায়চৌধুরী তাঁর *লোকজীবন মনস্তত্ত্ব শিল্পসৃষ্টি* গ্রন্থের "পলায়নী মনোবৃত্তি" শীর্ষক প্রবন্ধে বলেছেন:

> শৈশবকালেই যে ব্যক্তি বাস্তবতাবোধে দীক্ষিত এবং বাস্তব পৃথিবীকে সহ্য করার মনস্তাত্ত্বিক প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে সচেতন, তিনি অনিচ্ছাসত্ত্বেও নিজেকে পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেন। অন্যদিকে যে ব্যক্তির মানসিক স্থিতি তেমন দৃঢ় নয়, তিনি পরিবেশের জটিলতায় বিপর্যস্ত হয়ে পলায়নের নানা পন্থা আবিষ্কার করেন।[৪৫]

বাস্তব জগতকে এড়িয়ে এরূপ মানসিক জটের শিকার হয়ে মানুষ নানাবিধ অপচারেও জড়িয়ে পড়ে। সুবোধ ঘোষের "গোত্রান্তর"[৪৬] (১৯৪০) গল্পের নায়ক মধ্যবিত্ত শ্রেণীর প্রতিনিধি সঞ্জয়ও পলায়নী কর্মবৃত্তি ধারণ করে তার অবদমিত যৌনাকাঙ্ক্ষা পূরণে উদ্যোগী হয়েছে। সঞ্জয় চরিত্রের এই জটিল ব্যক্তি পরিচয়কেই মনস্তাত্ত্বিক ও আর্থ-সামাজিক পরিপ্রেক্ষিতে বিবেচনা করে সুবোধ ঘোষ গল্পে উপস্থাপন করেছেন। অর্থনীতিতে এম.এ. পাস করেও সঞ্জয় কর্মহীন, তাই 'বিংশ শতাব্দীর বিপ্লবী ধনবিজ্ঞানের সূত্রগুলি তার জানা আছে।'[৪৭] যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও চার বছর ধরে চাকরির চেষ্টালাভে ব্যর্থ হয়ে সে হতাশ; এমনকি সাংসারিক বলয়ে এবং প্রেমের ব্যর্থতায়ও সে তিক্ত। তাই তার আত্মোপলব্ধি:

> সময় থাকতে সরে পড়া চাই। নইলে এই নিলামী মহলে তার সব মনুষ্যত্ব অতি সস্তায় বিষিয়ে যাবে। এই ভণ্ডহাস ভদ্র সংসারের ছলনাকে পেছনে রেখে চলে যেতে হবে। বোকার মত নিছক একটা গোত্রমোহের তাড়নায় সমস্ত জীবনের ইষ্ট এখানে সে বাঁধা রাখতে পারবে না। এই গৃহকূটের রহস্য সে ধরে ফেলেছে।[৪৮]

গৃহকূটের রহস্য অনুধাবন করতে সক্ষম হলেও তার চরিত্রে বিদ্যমান মানসকূটের সন্ধানে সে ছিল অসমর্থ। আর তাই গল্পে দেখি গোত্রান্তরিত হয়ে সে রতনলাল সুগার মিলে তিরিশ টাকা মাইনের চাকরি নিয়ে সেখানকার কুৎসিত, হাড়িয়ায় আসক্ত, বুকে প্লুরিসি নেমিয়ারের বোন রুক্মিণীকে ভোগ করার কদর্য উল্লাসে মত্ত হয়ে ওঠে। আদিবাসী বস্তিতে গোত্রান্তরের প্রাথমিক আনন্দ উচ্ছ্বাসে সঞ্জয় যেমন হাড়িয়ার আসরে বসতে পেরেছে, তেমনি রুক্মিণীর দেহ ভোগ করতেও তার মানসকিতায় বাধেনি বরং তার মনে হয়েছে– 'জ'লো দাম্পত্যের চেয়ে এ ঢের ভালো।'[৪৯] এখানে প্রতিকূল পরিবেশই সঞ্জয়কে বাধ্য করেছে যুক্তিহীন পাশবিক আচরণ করতে। তার এতদিনকার অবদমিত যৌনাকাঙ্ক্ষা তাই রুক্মিণীকে পেয়ে তা পূরণে সম্ভব হয়েছে। সমালোচকের মতে:

> অবদমনের ক্ষেত্রে আমরা এমন একটি অবাঞ্ছিত প্রবৃত্তির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট থাকি যার অস্তিত্ব স্বীকার করতে চাই না এবং আত্মমর্যাদার স্বার্থে ভুলে যাই যে, আমরা যেন তার অস্তিত্ব সম্বন্ধে মোটেই সচেতন নই। তথাপি অবদমিত প্রবৃত্তি একেবারে মন থেকে নির্মূল হয় না, বরং তা নির্জ্ঞান মনে থেকে অস্বাভাবিক জটিলতার সৃষ্টি করে।[৫০]

আসলে সঞ্জয়ের এরূপ যুক্তিহীন আচরণের মূলে আছে প্রক্ষোভ। সামাজিক কিংবা প্রাকৃতিক দুই রকমের কারণই প্রক্ষোভকে প্রভাবিত করে। প্রক্ষোভের প্রবলতম অভিব্যক্তিকে ইংরেজিতে বলা হয় 'Affect'। ফ্রয়েডের মতে, তীব্রতম আবেগ ভূমিকম্পের মতো আমাদের নাড়া দিয়ে যায়। কোনো কিছু আর তখন যুক্তি বুদ্ধির নিয়ন্ত্রণে থাকে না। সেই মুহূর্তে ব্যক্তি মানুষ হিতাহিতজ্ঞানশূন্য হয়ে অবৈধ, অসামাজিক যেকোনো কাজ করে বসতে পারে। আলোচ্য গল্পে সঞ্জয় যা কিছু করেছে সবই নিরাপত্তার কারণে এবং ব্যক্তিগত সুখ ও কামনা-বাসনা চরিতার্থ করার জন্য। তার আচরণ স্বাভাবিক দৃষ্টিতে আদিম ও অসৎ, কিন্তু এর সবই হলো অবদমিত প্রক্ষোভতাড়িত, সমাজ ও পরিপার্শ্বের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ-সঞ্জাত। এখানে সঞ্জয়-রুক্মিণীর অবচেতন মন পরস্পরের প্রতি লুব্ধ, তৃষিত ও উন্মুখ; কিন্তু সামাজিক বিধি-নিষেধ ও মনের অর্জিত সচেতন বিবেকাংশ উভয়ের মিলনের প্রতিবন্ধক। তাই গল্পের পরিশেষে সঞ্জয়ের যে মনোজাগতিক অব্যবস্থা ও বিপর্যয়, তাকে লিবিডো তাড়নার সঙ্গে সচেতন বিবেকাংশের দ্বন্দ্ব ছাড়া কোনোভাবে ব্যাখ্যা করা যায় না। সুতরাং, এ সত্য স্পষ্ট যে, "গোত্রান্তর" গল্পের সঞ্জয়-রুক্মিণীর ঘটনাংশ ফ্রয়েডীয় মনোবিকলনতত্ত্ব দ্বারা প্রভাবিত।

মানুষের মন কখনোই সরলরৈখিক নয়। বহু বঙ্কিম পথে তার বিচরণ ঘটে। তাই মানুষের চেতন সত্তা যদি বিলুপ্ত হয়, তাহলে বাস্তবজীবনে তার ভারসাম্য বিনষ্ট হতে বাধ্য। এরকম অবস্থায় তার চৈতন্য ফিরিয়ে আনতে চিকিৎসক রোগীর জীবনের কোনো উল্লেখযোগ্য ঘটনার আঘাত দিয়ে অথবা তার মূল ধরে নাড়া দিয়ে রোগীর পূর্বাবস্থা ফিরিয়ে আনেন। লুপ্ত

চৈতন্য উদ্ধারের বিজ্ঞানসম্মত চিকিৎসা পদ্ধতির নাম 'সাইকোথেরাপি'। সুবোধ ঘোষের 'শকথেরাপি'[৫১] তেমনই একটি গল্প। আলোচ্য গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র ওয়াটকিনস্ মূরের ছেলে বেসিল মূর মানসিকভাবে অপ্রকৃতিস্থ। তার এ অপ্রকৃতিস্থ আচরণ ছোটনাগপুরের বাঙালি মধ্যবিত্ত সমাজ গ্রহণ করতে পারেনি। তাই বেসিলকে দেখা যায় তার স্বশ্রেণী অপেক্ষা নিম্নআয়ের বিড়িওয়ালা, সবজি বিক্রেতা, কারখানার মিস্ত্রিদের সঙ্গে অন্তরঙ্গ সম্পর্ক। বিশেষত সবজি বিক্রেতা প্রাণকুমারের স্ত্রী চম্পা আর তার ছেলে কিসটোর সঙ্গে তার ভাব অধিক। চম্পা ও বেসিলের সম্পর্ক নিয়েও বিভিন্ন মুখরোচক গল্প তৈরি করে এলাকাবাসী। তবুও অপ্রকৃতিস্থ বেসিল চম্পাকে ভালোবাসে। তার মধ্যেই বেসিল দেখতে পেয়েছে একজন সত্যিকারের 'ইন্ডিয়ান লেডি'। এরূপ অপ্রকৃতিস্থ বেসিলের পরস্ত্রীর প্রতি এমন আচরণ ফ্রয়েডীয় লিবিডো বা যৌনচেতনারই নামান্তর। মানুষ মাত্রেই জৈব প্রবৃত্তির অধিকারী। প্রবৃত্তির অচরিতার্থতা থেকে সাধারণত এরূপ অপ্রকৃতিস্থতা তৈরি হয়। ফলে ব্যক্তি মানুষ অবসাদগ্রস্ত হয়ে পড়ে। গল্পে বেসিল মূর চম্পার সঙ্গে যৌনসম্পর্ক স্থাপনে আগ্রহী হয়ে উঠলেও সচেতন চম্পা তাতে সায় দেয়নি। গল্পকারের বর্ণনাংশ নিম্নরূপ:

> চম্পা জানে প্রাণকুমার আজ আসবে না। কোন বছরই হোলির দিনে সে আসে না। দুটো দিন সে যেন নিশ্চিহ্ন হয়ে কোথায় মিলিয়ে যায়। কিন্তু চম্পা আজ ভাবছে—বেসিল আজ যদি আসে! দাওয়ার ওপর মচমচ জুতোর আওয়াজ। এক মুঠো ফাগ নিয়ে বেসিল এসে দাঁড়াল।
>
> –চম্পা।
>
> ডাক শুনে ঘরের ভেতর শিউরে উঠল চম্পা। বেসিল আজ চম্পাকেই নাম ধরে ডাকছে, অন্যদিন ডাকে কেষ্টকে।
>
> –আজ হোলি হ্যায় চম্পা!
>
> বাইরে আসতে হলো চম্পাকে। বেসিল হাতের ফাগ নিয়ে লেপে দিল চম্পার মুখে। আঁচলে চোখমুখ মুছে একটু সুস্থির হয়ে চম্পা দাঁড়িয়ে রইল। নেশায় তরল চোখের তারা দুটো তুলে চম্পার দিকে তাকিয়ে বেসিল বলে— চম্পা !
>
> –কি বেসিল?
>
> –তোমায় আজ একটা কথা বলব।
>
> ভয় পেয়েছে চম্পা। কিন্তু পালিয়ে যেতেও অক্ষম, পা দুটো অচল অনড় হয়ে গেছে। একটু ভেবে নিয়ে চম্পা শেষে হাতজোড় করল। মিনতি করে বললো–না, বলো না।
>
> –উপায় নেই। আমি বলবই।
>
> –না, বলো না বেসিল।
>
> মাথাটা থেকে-থেকে ঝুঁকে পড়ছে সামনে। কপালটা একহাতে টিপে ধরে বেসিল তবু দাঁড়িয়ে আছে। চম্পা কপালের ঘাম আর চোখের কোণ দুটো আঁচলে মুছে নিয়ে যেন দম ছেড়ে নিল। বললো— আচ্ছা আর একদিন বলো।[৫২]

অবদমিত যৌনাকাঙ্ক্ষা পূরণে ব্যর্থ বেসিল তাই অবসাদগ্রস্ত হয়ে ওঠে। অথচ তার এই অপ্রকৃতিস্থ অবসাদগ্রস্ততা দূরীভূত হয়েছে গল্পের শেষাংশে কালাজ্বরে মৃত চম্পার চিতায় দগ্ধীভূত হবার দৃশ্যে। চম্পার মৃতদেহের ওপর নারকীয় অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে বেসিল প্রথম আক্রমণ করে পুরুতমশাইকে। আসলে চম্পার হৃদয়বিদারক মৃত্যু ও মৃত্যু পরবর্তী আচরণাদি এবং প্রবল শারীরিক আঘাত বেসিলের লুপ্ত চৈতন্য জাগিয়ে তুলেছে। এভাবেই হয়েছে শকথেরাপি। সমালোচকের মতে:

> গল্পের নামকরণের মধ্যেও মনঃসমীক্ষণের বিশেষ রীতিটিও উদঘাটিত। যদিও এখানে কোন তত্ত্ব বা সূত্রের আকারে লেখক কোন বক্তব্য উপস্থিত করেননি। ফলে যা তত্ত্বভারাক্রান্ত হয়ে উঠবার সম্ভাবনা ছিল তা অত্যন্ত শিল্পসুন্দর হয়ে উঠেছে। ঘটনার প্রবল আবর্ত থেকেই শোকাহত বেসিল আত্মপরিচয় ও আত্মচৈতন্য লাভে সক্ষম হয়েছে।[৫৩]

ফ্রয়েড ব্যক্তির সকল আকর্ষণের মূলে যে লিবিডোকেই একমাত্র কারণ বলে বিবেচনা করেছেন তার অতিরিক্ত প্রভাবে ব্যক্তিমনে বিভিন্ন ধরনের দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হয়। দ্বন্দ্ব এমন একটি অবস্থা বা পরিস্থিতি যা ব্যক্তির মধ্যে একই সময়ে একাধিক পরস্পর বিরোধী প্রতিক্রিয়া উদ্রেক করে। যেহেতু প্রতিক্রিয়াগুলো পরস্পরবিরোধী, সেহেতু ব্যক্তির পক্ষে একই সময়ে উক্ত প্রতিক্রিয়াগুলো সম্পন্ন করা সম্ভব নয়। সুতরাং, কোন প্রতিক্রিয়াটি করবে, সে বিষয়ে ব্যক্তিকে সিদ্ধান্ত নিতে হয়। এ সিদ্ধান্ত গ্রহণে ব্যর্থ হলেই দেখা দেয় বিভিন্ন দ্বন্দ্ববহুল মানসিকতা। মনোবিজ্ঞানীরা ব্যক্তির দ্বন্দ্বসমূহকে চারটি শ্রেণীতে ভাগ করে থাকেন: আকর্ষণ-আকর্ষণ দ্বন্দ্ব, বিকর্ষণ-বিকর্ষণ দ্বন্দ্ব, আকর্ষণ-বিকর্ষণ দ্বন্দ্ব এবং দ্বি-আকর্ষণ-বিকর্ষণ দ্বন্দ্ব। সুবোধ ঘোষের 'উচলে চড়িনু'[৫৪] (১৯৪১) গল্পে ব্যক্তির দ্বি-আকর্ষণ-বিকর্ষণ দ্বন্দ্বের চিত্র লক্ষণীয়। এ গল্পের নায়ক স্বাস্থ্যবান দীনেশ দত্ত কোম্পানির অভ্রখনির ওভারম্যান, পঁয়ত্রিশ টাকা বেতনে চাকরি করায় তার বিয়ের সম্বন্ধ আসে আর ভেঙে যায়। এমতাবস্থায় বাধ্য হয়েই তার জৈবপ্রবৃত্তি অসামাজিকতার চোরা-পথ অবলম্বন করে। গল্পে দেখি তার জৈবপ্রবৃত্তি পূরণে দুটি নারীর সপ্রতিভ উপস্থিতি যা তাকে দ্বি-আকর্ষণ-বিকর্ষণ দ্বন্দ্বে সমর্পণ করেছে:

> কোন ব্যক্তি যখন এমন দুটি লক্ষ্যের মাঝখানে উপস্থিত হয় যে দুটি লক্ষ্যের ধনাত্মক ও ঋণাত্মক আকর্ষণ ক্ষমতা আছে—এ অবস্থায় তখন দ্বৈত আকর্ষণ-বিকর্ষণ দ্বন্দ্ব উপস্থিত হয়। ব্যক্তিকে এমন দুটি লক্ষ্য বস্তুর মধ্যে একটিকে নির্বাচন করতে হবে যে দুটি লক্ষ্যেরই আকর্ষণীয় ও খারাপ দিক উভয়ই আছে। একটিকে নিলে আরেকটিকে বাদ দিতে হয় অথচ দুটিরই ভাল ও মন্দ দিক সমান জোরালো। সাধারণত এ অবস্থায় দ্বন্দ্বের মীমাংসা করা খুবই দুরূহ হয় এবং ব্যক্তির দ্বিধা ও দোদুল্যমানতা এত বেশী হয় যে ব্যক্তি অনেক সময়ই নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে।[৫৫]

একদিকে খনির মজুরনি বিলাসী, অপরদিকে ইরানী বেদের মেয়ে সারা— এই দুই নারীর আকর্ষণ-বিকর্ষণের দ্বন্দ্বে সৃষ্ট দীনেশের অস্বভাবী মনস্তত্ত্ব গল্পে উপস্থাপিত হয়েছে। আলোচ্য গল্পে অভ্রখনির অন্ধকার সুড়ঙ্গ পথের রূপ যেমন উন্মোচিত হয়েছে, তেমনি সেখানকার আদিবাসী জীবনের পরিচয়ও বেশ কিছুটা বর্ণিত হয়েছে। সমালোচক শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় দীনেশের জীবনে দুই নারীর এই দ্বৈত আকর্ষণ-বিকর্ষণের দ্বন্দ্বকে অসামঞ্জস্য বলে উল্লেখ করেছেন:

> লেখকের বিরুদ্ধে পাঠকের অভিযোগের প্রধান কারণ এই যে, বিলাসীকে কখন যাযাবরীর যোগ্য প্রতিদ্বন্দ্বিনীরূপে দেখান হয় নাই, দীনেশ কখনও তাহার প্রতি কোন সত্যকার টান অনুভব করে নাই। সে ভাগ্যের প্রতি গাত্রজ্বালা প্রশমনের জন্যই মাঝেমধ্যে এই অন্ত্যজপ্রেমকে বুকে টানিয়েছে—কিন্তু পাতালপুরীর হৃদয়দৌর্বল্য মর্ত্যের আলোকে লজ্জিত হইয়াছে। এই ভারসাম্যের অভাবে গল্পটির রস পূর্ণভাবে জমাট বাঁধে নাই।[৫৬]

গল্পটির শিল্পরস ক্ষুণ্ন হলেও নায়ক দীনেশের জীবনে দুই নারীর আকর্ষণ-বিকর্ষণ দ্বন্দ্ব অক্ষুণ্ন থেকেছে। তাই সে বিলাসীর সঙ্গে শারীরিক সম্পর্ক স্থাপনে আগ্রহী হলেও সমাজের কারণে

তা পারেনি। রুচিবান, শিক্ষিত দীনেশ তাই বিলাসীকে গ্রহণ করতে পারেনি। অন্যদিকে সারাকে কাছে পেয়ে তাকে ভোগ করতে দীনেশের এতটুকু সংকোচ লাগেনি। কারণ সারা যাযাবরী, পরিচিত গণ্ডির বাইরে তার অবস্থান। অতৃপ্ত সারা দীনেশকে তাই বলেছে:

> তুমি আমায় কিনে নাও। যতদিনের জন্যে ইচ্ছে কিনে নাও। যেদিন খুশি ছেড়ে দিও। কিছু টাকা দিলে মালিককে দিয়ে তোমার কাছে চলে আসি।[৫৭]

এখানে যাযাবর নারী সারার যে জৈবিক প্রবৃত্তির উতরোল আহ্বান তা ফ্রয়েডীয় মনোবিকলনাশ্রিত। তার অতৃপ্ত যৌনাকাঙ্ক্ষা তাকে এরূপ সংলাপ গ্রহণে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছে। বস্তুতপক্ষে দীনেশের জীবনে দুই নারীর এই দ্বৈত আকর্ষণ-বিকর্ষণ দ্বন্দ্বসূত্রে ব্যক্তির অবদমিত আদিম যৌনাকাঙ্ক্ষার পূর্ণাঙ্গ চিত্র গল্পে উপস্থাপিত হয়েছে। এখানে দীনেশ যা করেছে তা প্রেমের দ্বারা চালিত নয়, বরং মধ্যবিত্ত জীবনের বঞ্চনাজাত বিকৃত অভিমান ও অস্বভাবী মনস্তত্ত্ব থেকে সৃষ্ট জটিলতা প্রেরণা জুগিয়েছে।

ফ্রয়েডীয় অবচেতন তত্ত্ব থেকে উদ্ভূত মনোবিকলনের সার্থক প্রয়োগ ঘটেছে লেখকের 'একতীর্থা'[৫৮] শীর্ষক গল্পে। আলোচ্য গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র বীণা দিদিমণির অবদমিত যৌন কামনার ফলে সৃষ্ট বিভিন্ন অস্বভাবী আচরণ গল্পকার অতি সূক্ষ্মভাবে এতে তুলে এনেছেন। এ গল্পটি সম্বন্ধে শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন, 'এক বৃদ্ধা শিক্ষয়িত্রীর শিষ্য-বাৎসল্য ও সিনেমা-প্রীতির চমৎকার বর্ণনা'।[৫৯] কিন্তু প্রকৃতপক্ষে গল্পটিতে বৃদ্ধা নায়িকার শিষ্য-বাৎসল্য ও সিনেমাপ্রীতিই মুখ্য বিষয় হয়ে ওঠেনি, বরং 'অবদমিত কামনার ঘুরপথ পরিতৃপ্তি ঘটাতেই নায়িকার শিষ্য-বাৎসল্য ও সিনেমাপ্রীতির অবতারণা করেছেন লেখক।'[৬০] অকাল বৈধব্যের শিকার নিঃসন্তান স্কুল শিক্ষিকা বীণা দিদিমণি তার বঞ্চিত, অবহেলিত জীবনের সুখ-কামনা পূরণে নানাবিধ অস্বভাবী ক্রিয়ায় অবতীর্ণ হয়েছে যা ফ্রয়েডীয় মনোবিকলনধর্মী। "বাতিক ও সাইকো-এনালিসিস" শীর্ষক প্রবন্ধে সুবোধ ঘোষ উল্লেখ করেছেন:

> বাতিক কথাটা একটা সাধারণ নামকরণ মাত্র; এর অর্থের পরিধির ভেতর বহু বিভিন্ন উপসর্গের শ্রেণীবিভাগ আছে। সেই সব উপসর্গের বাহ্যিক প্রকাশ রূপে ও রীতিতে যতই পৃথক হোক না কেন, তাদের উৎপত্তির ইতিহাস এক মূলসূত্রে গ্রথিত আছে। এক কথায় বলতে পারা যায় : বাতিকের উদ্ভব দ্বন্দ্ব (Conflict) থেকে। কিসের দ্বন্দ্ব? উত্তর নানাভাবে দেওয়া যায়। (ক) ইগো বনাম ইদ, ইগো বনাম বাস্তব জগৎ, ইগো বনাম পরা-ইগো–মনের ভেতর এদের যে কোন দু'জনের দ্বৈরথ যুদ্ধে বাতিক অবস্থা অবশ্য সৃষ্টি হয়। (খ) অথবা মনের যে কোন দুটি ক্রিয়াশক্তির (Psychic forces) পারস্পরিক বিরোধে বাতিক অবস্থা তৈরী করতে পারে। কিম্বা; মোটামুটিভাবে বলা যায় (গ) অচেতন ও চেতন মনের দ্বন্দ্ব। যেভাবেই বলা যাক্, বাতিক রহস্যের মূল সত্যটা অবিকল থাকে—দমিত ইচ্ছাবৃত্তির আত্মস্ফূর্তির আবেগ। এর সঙ্গে ডাক্তার ফ্রয়েডের আর একটা মন্তব্য বা সিদ্ধান্ত স্মরণে রাখা উচিত। যাকে দমিত ইচ্ছাবৃত্তি বলা হচ্ছে, সেটা নিশ্চয় কামজীবনের কোন অভিজ্ঞতা থেকে প্রসূত। এই অভিজ্ঞতা আসলে বাধাজনিত অভিমান। আদি কামাবেগের অতৃপ্তি নিরোধ ও ব্যর্থতা থেকে অন্তশ্চেতনায় যে জটিল বিক্ষোভ সৃষ্টি হয়, সেটাই চেতন মনের আবহাওয়াকে বাতিকের ঝড়ে অশান্ত করে তোলে।[৬১]

আলোচ্য গল্পে আদ্যন্ত বীণা দিদিমণির আচরণ স্বাভাবিক নয়। তাই তার মনোজগতে একাধিক বাতিক প্রবণতা মুহুর্মুহু ক্রিয়াশীল হয়ে আত্মপ্রকাশ করেছে। গল্পকারের ভাষায়:

> বীণা দিদিমণি বেশ আছেন। সিনেমাতে ছবি দেখার বাতিকটা তাঁর নতুন। এর আগে গ্রামোফোন রেকর্ড শোনার শখ ছিল বীণা দিদিমণির। তার আগে পড়তেন উপন্যাস। তারও আগে শুধু চিঠি লিখতেন—চেনা, আধ-চেনা, একেবারে অচেনা, কোনো একটা সম্পর্ক আর প্রসঙ্গ পেলেই তাদের চিঠি লিখতেন। --- তারও আগে শুধু ব্রত করার বাতিকে পেয়েছিল বীণা দিদিমণিকে। এই সব পুরনো ইতিহাসের ঘটনা বলতে গেলে প্রায় চল্লিশ বছর আগের কথা এসে পড়ে। তখন সবে একটি বছর মাত্র হয়েছে—স্বামী হারিয়েছেন বীণা দিদিমণি।[৬২]

এই তথ্য পরিবেশন করে লেখক বীণা দিদিমণির অবদমিত মনের অসুস্থ বিকৃতি গল্পে পরিবেশন করেছেন যথাযথভাবে। একাকী, অবলম্বনহীন এ নারী তার চার ছাত্রী গৌরী, লীলা, শান্তি আর অর্চনাকে নিয়ে সিনেমা দেখতে গেলে কোনো অস্বস্তিকর দৃশ্যের অবতারণা হলে তাদেরকে সতর্ক করে দেন। পরবর্তীকালে প্রথম তিন ছাত্রীর বিয়ে হয়ে গেলে তাদের দাম্পত্যজীবনের চিঠিপত্র জোর করেই পড়তেন তিনি। এখানে বীণা দিদিমণির এরূপ আচরণের মূলে রয়েছে তার অবদমিত যৌনাকাঙ্ক্ষা থেকে সৃষ্ট জটিলতার পূর্ণাঙ্গ প্রকাশ। কেবল তা-ই নয়, বিধবা ছাত্রী অর্চনার অবদমিত যৌনাকাঙ্ক্ষা বীণা দিদি বুঝতে পেরে রূপালী পর্দায় পরিবেশিত যৌনদৃশ্য দেখতে পূর্ব নিষেধাজ্ঞা তিনি প্রত্যাহার করেছেন:

> বীণা দিদিমণি একটু নড়ে বসলেন। অর্চনার দিকে তাকালেন। অর্চনা নিমেষের মধ্যে চোখ নামিয়ে ফেললো। দিদিমণি আর একবার ছটফট করে উঠলেন। তারপর আস্তে আস্তে ডাকলেন—অর্চনা? শুনছো? চোখ নামাতে হবে না। মাথা ওঠাও। ছবি দেখ।[৬৩]

না পাওয়া দাম্পত্যজীবনের অবদমিত যৌনাকাঙ্ক্ষার স্বাদ উপভোগ করতেই বিধবা অর্চনাকে অবাঞ্ছিত দৃশ্য দেখার অনুমতি দানের নামে প্রকারান্তরে তাকে যৌনজীবনে যাওয়ার ছাড়পত্র দিয়েছেন বীণা দিদি। এখানে বীণা দিদির যে মনস্তাত্ত্বিক আচরণ প্রকাশিত, তা ফ্রয়েডের অবচেতন তত্ত্বকেই স্মরণ করিয়ে দেয়। ফ্রয়েড বিশ্বাসযোগ্য দৃষ্টান্ত দিয়ে দেখিয়েছেন, মানুষের বেশিরভাগ কাজ মনস্তাত্ত্বিক শক্তি দ্বারা তাড়িত হয়ে করা। যেমন, একটি বরফ খণ্ডের বেশিরভাগ পানিতে ডুবে থাকে, মানুষের মনও তেমনি অবচেতনে একইভাবে সক্রিয় থাকে। মানুষের কাজের বেশিরভাগ অংশ হচ্ছে এই অবচেতনের ফল, তাঁর মতে, মানুষের প্রত্যেকটি মানবিক আচরণই যৌনতা দ্বারা তাড়িত হয়ে করা। অবদমিত কামনা বাসনা এর সঙ্গে যুক্ত। গল্পে বীণা দিদিমণির মনস্তাত্ত্বিক আচরণসূত্রে ফ্রয়েডের উক্ত অবচেতন তত্ত্ব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।

সুবোধ ঘোষ সামাজিক বিন্যাস ও স্তরভেদের ফলে সৃষ্ট মানুষের মনোব্যাধির বিস্তার ও সংক্রমণের জটিলতা তাঁর "কাঞ্চন সংসর্গাৎ"[৬৪] (১৯৪৪) শীর্ষক গল্পে তুলে ধরেছেন। এ গল্পে দারিদ্র্যের সঙ্গে যুদ্ধ করে বিহারের রামগড়ের অধিবাসী অটলনাথ চৌধুরী ক্রমশ ধনকুবের 'বাণিজ্যবীর'-এ উত্তীর্ণ হয়ে ওঠেন। স্ত্রী মণিমালার গার্হস্থ্য দায়িত্ব সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে উপার্জনের উন্মাদ আকুতিতে কৃচ্ছসাধন, পরিশ্রম ও পাটোয়ারি বুদ্ধির দাপটে ক্রমে একজন অভিজ্ঞ দালাল-ব্যবসায়ী হয়ে উঠেছিলেন এককালের ছাতুখেকো গরীব অটলনাথ। 'বিশ শতকের আধুনিকোত্তর মুরারি শীল'[৬৫] হিসেবে বিবেচিত এ ব্যক্তির দারিদ্র্য থেকে সৃষ্ট মানসিক বিভ্রম তাকে জটিল এক মনোরোগীতে পরিণত করেছে। সমালোচক বলেছেন:

> সামাজিক বিন্যাস ও স্তরভেদ (নিম্ন বনাম উচ্চ) মনোব্যাধির বিস্তার ও সংক্রমণের সঙ্গে বিশেষভাবে সম্পৃক্ত। সমাজের নিচু মহলেই বেশি মনোব্যাধি। অর্থনৈতিক দুরবস্থার সঙ্গেও মনোব্যাধির বিশেষ যোগ।[৬৬]

আলোচ্য গল্পে অর্থনৈতিক অসচ্ছলতা থেকে উদ্ভূত অটলনাথের মনোজগতে যে বিকৃতির উল্লেখ, তা উপস্থাপনসূত্রে সুবোধ ঘোষ শিল্পসচেতনতার স্বাক্ষর রেখেছেন। বন্ধুর ছেলে কান্তিকুমারকে নিজের আয়ত্তের মুঠিতে এনে অটল তাই যাবতীয় অপকর্ম তাকে দিয়ে সাধন করলেও প্রকারান্তরে তার মনোবিকৃতি ধীরে ধীরে কান্তি-প্রেমিকা জয়ার আকর্ষণসূত্রে গল্পে প্রকট হয়েছে। মনোবিজ্ঞানী ফিনের মতে:

> বিত্তহীনতার কালচার মূলত এক মনস্তাত্ত্বিক সমস্যা। এই তথাকথিত পরিমণ্ডলে যে মানুষ বাস করে, সে অনুভব করে বৃহত্তর সমাজের বিবিধ সুখস্বাচ্ছন্দ্য ও প্রাতিষ্ঠানিক বৈভবের অংশীদার সে নয়। এক বিচ্ছিন্নতার অনুভূতি ও বোধ, উদ্দেশ্যহীনতার, শিকড়হারা অসূয়া ও সিনিসিজম এবং উদাসীনতা তার নিত্যসঙ্গী।[৬৭]

স্ত্রীর মৃত্যুর পর অটলনাথ কান্তিকুমারের প্রেমিকা জয়ার প্রতি যৌন লালসায় মত্ত হয়ে ওঠার নেপথ্যে ক্রিয়াশীল তার বিত্তহীন অবস্থানে সতত বিচরণশীল ব্যক্তিক অন্তঃসারশূন্যতা ও বিচ্ছিন্নতাজাত উপলব্ধি। জয়ার সমস্ত আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্যের বিনিময়ে তাকে কিনে নেয় অটলনাথ। এর প্রতিক্রিয়ায় অটলনাথ যে যৌন লালসায় জয়াকে ভোগ করতে উদ্যত হয় তা ফ্রয়েডীয় মনোবিকলনের পর্যায়ভুক্ত:

> আহত জানোয়ারের মত আচমকা হিংস্র মূর্তি ধরে একটা লাফ দিয়ে ছাতাটা হাতে নিয়ে উঠে দাঁড়ালো কান্তিকুমার। সামনের সোফার উপর পড়ে এক বৃদ্ধ অজগর যেন কুণ্ডলী পাকিয়ে লালসায় কাতরাচ্ছে। কিন্তু আবার সেই সতত সৎপথে চলা, কৃতজ্ঞতায় বাঁধা, পরোপকারে ডগমগ ও পুরস্কার-প্রীত একটি অতিভদ্রের পরবশ আত্মা ঘাড় গুঁজে চেয়ারের ওপর আবার একেবারে সুস্থির হয়ে বসে।[৬৮]

স্বার্থপর, কুটিল ও আত্মসর্বস্ব অটলনাথকে কেন্দ্র করে তার বন্ধুপুত্র কান্তিকুমারের মনোজগতে যে প্রতিহিংসাপরায়ণতা জেগে উঠেছে তাতে ফ্রয়েডীয় মনস্তত্ত্বই কাজ করেছে বলে আপাতদৃষ্টিতে মনে হতে পারে। কেননা ফ্রয়েড মানুষকে হিংস্র বন্যপ্রাণীর সদৃশ মনে করেছেন এবং মানুষের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে কোনো আশার কথা বলতে না পারার জন্য দুঃখবোধ করেছেন।[৬৯] অটলনাথকে কান্তির হত্যার প্রচেষ্টার মধ্যে ফ্রয়েডীয় থ্যানাটসকেই স্মরণ করায়। এই থ্যানাটাসই পরঘাতী। অপরদিকে অটলনাথের মধ্যে যে লিবিডোর প্রকাশ তা আত্মরক্ষামূলক। নিজের একাকীত্ব দূরীকরণে জয়াকে ভোগ করে তাই তিনি আত্মরক্ষা করতে তৎপর হয়েছেন। ফ্রয়েড লিবিডোকে সম্পূর্ণ জৈবধর্মী বলেছেন, সাধারণত যৌন আকর্ষণের মধ্যেই এই প্রকার লিবিডো নিজেকে প্রকাশ করে থাকে। আসলে অটলনাথের হৃদয়হীনতা বা নিষ্ঠুরতাই তাকে এরূপ বিকৃতিতে উৎসাহী করে তুলেছে। সমালোচক সাবিত্রী নন্দ চক্রবর্তী বলেছেন:

> মধ্যবিত্ত মানুষের নৈতিক সংকটের ভয়াবহ রূপ কাঞ্চন সংসর্গাৎ গল্পটি। শঠ ধনী পিশাচ অটলনাথের কাছে মনুষ্যত্বের চরম অবমাননা হয়েছে, কান্তিকুমার ও তার প্রেমাস্পদের কাছে নিজের অধিকারের জোর হারিয়ে ফেলেছে অর্থের অভাবে, সে অন্যায়ের প্রতিবাদ করার শক্তিটুকুও হারিয়ে ফেলেছে। এই দুর্বলতাই তার নৈতিক সংকট ডেকে এনেছে।[৭০]

প্রকৃতপক্ষে উচ্চ ও মধ্যবিত্তের মনস্তত্ত্বের মৌলিক ব্যবধানগুলিকে এমন সুচারু তীক্ষ্ণতায় উপস্থাপন করার কৃতিত্বে সুবোধ ঘোষ তাঁর অসামান্য দূরদর্শিতার স্বাক্ষর রেখেছেন।

জতুগৃহ গল্পগ্রন্থের অপর গল্প "চতুর্ভুজ ক্লাব" (১৯৫১)-এ সুবোধ ঘোষ নর-নারীর সম্পর্ক প্রকাশের ক্ষেত্রে ফ্রয়েডীয় মনোবিকলনের চিত্র অঙ্কন করেছেন। মানুষের মনের প্রত্যয়গামী ব্যবহারিক প্রমোদবিধায়ক ইচ্ছাশক্তির অস্তিত্ব নির্ভর করে অজ্ঞাতজ্ঞান এবং জ্ঞাত অজ্ঞানতা—উভয়ের দ্বন্দ্বের ওপর। ফ্রয়েড মানুষের চারিত্রিক ও ব্যবহারিক প্রমোদগুলোকে তাই দুটি ভাগে ভাগ করেছেন: (১) ভ্রমাত্মক কর্ম; এবং (২) বিলক্ষণ কর্ম। পূর্বোক্ত যে সকল গল্প বিশ্লেষিত হয়েছে, সেগুলো অজ্ঞাত-জ্ঞানজাত ভ্রমাত্মক কর্মের; কিন্তু আলোচ্য গল্পে সুবোধ ঘোষ জ্ঞাত-অজ্ঞানতাজাত বিলক্ষণ কর্মের পরিণতি বর্ণনা করেছেন। 'শারদীয় আনন্দ বাজার' পত্রিকায় প্রকাশিত এ গল্পে এক নারীকে কেন্দ্র করে চতুর্ভুজ ক্লাবের চার পুরুষ সদস্যের অবদমিত যৌনাকাঙ্ক্ষা লেখক সুনিপুণভাবে চিত্রিত করেছেন। শুরুতেই এ গল্পের কথক আমাদের জানিয়ে দিয়েছেন, 'গল্পটাকে আমাদের চেংড়া বয়সের নিছক একটা গল্প মনে করবেন না মশাই। ওটা যে আসলে মানুষজাতির চেংড়া বয়সের গল্প, অন্তত এটুকু আপনার বোঝা উচিত।'[৭১] বিনু, দীপু, নরু এবং গল্পকথক ভবানী এই চতুর্ভুজ ক্লাবের চার কিশোর সদস্য। এর মধ্যে বিনু একটু বেশি বয়সের এবং পরিপক্ব চেতনার অধিকারী। তাদের এই ক্লাবের বিনু ব্যতীত প্রত্যেকের এক একটি ভালোবাসার জিনিস আছে। গল্পকথক ভবানীর গ্রামোফোন, দীপুর সাইকেল এবং নরুর ক্যামেরায় চারজনের সমান অধিকার। গল্পের সমগ্র পরিবেশ জুড়ে এই চার বন্ধুর উচ্ছ্বাস সমান অংশে চিত্রিত হয়েছে। কিন্তু বিনু যেদিন টুকু বৌকে তার একমাত্র অন্তরের সামগ্রী হিসেবে চতুর্ভুজ ক্লাবে নিয়ে এসেছে, সেদিন ক্লাবের নিয়ম অনুযায়ী সকলে তাদের নিজের ভেবে টুকু বৌকে ব্যবহার করতে গিয়ে মারাত্মক ভুল করেছে। কেবল তাই নয় টুকু বৌ তাদের নিকট ক্লাবের প্রধান আকর্ষণ রূপে পরিগণিত হয়েছে। গল্পকথকের ভাষায়, 'টুকু বৌকে নিয়ে আমরা চারজন যেন পৃথিবী থেকে পালিয়ে একটা নীল আকাশের দেশে এসে পড়েছি।'[৭২] এখানে চারজন সদস্যের এরূপ মনোভঙ্গি তাদের অবচেতনে ক্রিয়াশীল যৌনানুভব থেকে সৃষ্টি হয়েছে। সমালোচক সমীরণ চট্টোপাধ্যায় বলেছেন:

> মনোবিশ্লেষণে সকল গূঢ়ৈষাই কামজ এবং প্রায় সকলগুলি শৈশবে সৃষ্ট বলিয়া ধরা হয় ; কিন্তু সকল মনোবিদ ইহা স্বীকার করেন না। তবে অধিকাংশ গূঢ়ৈষাই যে কামজ তাহা নিশ্চিত এবং বহু রোগের কারণ যে শৈশবে সৃষ্ট গূঢ়ৈষা, ইহাও সত্য। যেদিক দিয়াই দেখা যাউক সকল গূঢ়ৈষাই যে কম বেশি সক্রিয়, নির্জ্ঞান যে সক্রিয় তাহা সকল মনোবাদীরাই স্বীকার করেন।[৭৩]

অবচেতনে বিচরণকারী লিবিডো তাই সক্রিয় হয়ে উঠেছে তাদের এরূপ মনোভঙ্গি প্রকাশে। গল্পে তাই দেখি বিনু, কথক চরিত্র, দীপু ও নরু যথাক্রমে টুকু বৌকে চিমটি কেটে সুখ উপভোগ করেছে তার পিঠ, হাত, পায়ের পাতা এবং ঘাড়ের ওপর। ফ্রয়েড এরূপ অপচারী ব্যক্তিদের আচরণ পরীক্ষা করে প্রমাণ করেছেন যে:

> কামাবেগ তুষ্ট করার জন্য সর্ব্বদা জননাঙ্গ ব্যবহারের প্রয়োজন না হতে পারে। অন্যতর যে কোন একটি ইন্দ্রিয় রতিসুখের সাড়া যোগাতে পারে এবং অপচারী মানুষের তাতেই তৃপ্তি চরম হয়ে ওঠে।[৭৪]

কেবল ইন্দ্রিয় আকর্ষণের দ্বারা এই চারজন তাদের অবদমিত যৌনাকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করেনি, টুকু বৌ যেদিন চারজনের জন্যে খিচুড়ি রান্না করেছে, সেদিন বিনু ব্যতীত সকলে একে একে টুকুর সম্মুখে গিয়ে তাদের মনের অব্যক্ত কথা বলেছে:

> বড় ইচ্ছে করছে টুকু বৌ, আজ শুধু আমি আর তুমি দু'জনে এঘরে বসে একসঙ্গে খিচুড়ি খাই। ওদের সবাইকে খেতে দিও দাওয়ার পর। এখানে শুধু তুমি আর আমি, আর কেউ নয়।[৭৫]

গল্পে টুকু বৌ-এর খিচুড়ি-পোড়ার গন্ধ আছে। খিচুড়ি রান্নাটিও এক্ষেত্রে তাৎপর্যপূর্ণ। পোড়াগন্ধটির পাশাপাশি গল্পকার বিনু চরিত্রটিকে, টুকু বৌ-এর যথার্থ স্বামী-সত্তাকে চিত্রিত করেছেন। তার চরিত্রে মানসকূট নেই। গল্পের প্রধান নারীচরিত্র হিসেবে টুকু বৌ নিজেকে দুঃখ-কষ্টে জর্জরিত করে এক ধরনের তৃপ্তিকামী অভিমানাত্মক আচরণ প্রকাশ করেছে যা ফ্রয়েডীয় পরিভাষায় 'আত্মনিগ্রহের রুচি' বা 'Masochism' বলা যেতে পারে। এরই সফলতম অভিব্যক্তি দেখি নিম্নোক্ত সংলাপে:

> ইচ্ছে করছে এখন চারজনের কাঁধে চেপে শ্মশানে চলে যাই। তোমরা চারজনে মিলে আমাকে ছাই করে দিয়ে হাত ধুয়ে ঘরে ফিরে আসবে, ব্যস্। এর চেয়ে বেশি সুখ চাই না।[৭৬]

মানুষের সরাসরি জৈব প্রবৃত্তি আর প্রেমের দ্বন্দ্ব নিয়ে সুবোধ ঘোষ রচনা করেছেন অসাধারণ মনোবিকলনধর্মী গল্প 'বৈদেহী' (১৯৫৩)। বস্তুত এ গল্পে জৈব তাড়না আর প্রেম যে সম্পূর্ণ পৃথক তা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। আলোচ্য গল্পে বিবাহিত বিকাশের স্থূলকাম জীবনে প্রেমের কোনো স্থান নেই, কারণ সে ভিন্ন নারী সংসর্গে আসক্ত। স্ত্রী মল্লিকার প্রতি তাই তার ঘৃণা আর বিদ্বেষ তাকে জটিল করে তুলেছে। সমালোচক মানস রায় চৌধুরী এ প্রসঙ্গে বলেছেন:

> কোনো নারীর প্রতি একজন পুরুষের ভালোবাসার সঙ্গে ঘৃণা ও বিদ্বেষের নানা কারণ থাকতে পারে। প্রথমত আমাদের সমাজে প্রেমে ও বিবাহে একনিষ্ঠ থাকাটাই আইনসিদ্ধ হলেও মানসিক জগতে মানুষ এখনো বহুকামী। তাই প্রত্যেকটি পুরুষ চায় স্ত্রী আমার প্রতি আসক্ত থাকুক, কিন্তু আমি পুরুষ, কাজেই অল্পস্বল্প বিবাহোত্তর প্রেম আমার ন্যায়সংগতভাবে প্রাপ্য।[৭৭]

অনেক ক্ষেত্রে মানুষ নিজের এই বিদ্বেষপূর্ণ মনোভাব বাইরে প্রকাশ না করে তা অবদমন করতে চায়। অন্য যেকোনো অবদমনের মতোই বিদ্বেষের ন্যায় প্রবল শক্তিকে অবদমিত করলে ফল শুভ হয় না। আলোচ্য গল্পের নায়ক বিকাশও তাই স্ত্রী মল্লিকার প্রতি বিদ্বেষপূর্ণ মনোভাব সরাসরি প্রকাশ করতে না পারায় তার ভেতর উদবেগ ও উৎকণ্ঠার সৃষ্টি হয়েছে। প্রেম আর জৈব প্রবৃত্তির দ্বন্দ্ব তাকে ক্রমাগত অসুস্থ, বিকৃত চরিত্রের অধিকারী করে তুলেছে। তাই রাত দশটা হলেই বিকাশের নগ্নকাম সরীসৃপের মতো মল্লিকার প্রেমের দীপ্ত চেতনাকে অন্ধকারময় করে দুঃসহ করে তুলেছে। টেলিফোনে বিকৃত ক্ষুধাপূরণের আহ্বান তাই বিকাশকে বাধ্য করেছে গভীর অন্ধকারে বাড়ির বাইরে যেতে। বিকাশ ও মল্লিকার কথোপকথনে তাদের মানসিক উত্থান-পতনের চিত্র গল্পে উঠে এসেছে এভাবে:

> বিকাশ বলে–তোমার আর এখানে দাঁড়িয়ে থাকার কোন অর্থ হয় না। যদি বুঝতাম যে ক্ষমা চাইতে এসেছো তবে না হয় ---।
> মল্লিকা–ক্ষমা ?
> বিকাশ–হ্যাঁ।
> মল্লিকা বলে–তোমার কাছে ক্ষমা চাইব, এটা কি আর এমন কঠিন কাজ?

বিকাশ–তবে চলো আমার ঘরে।
অভিমানীর কণ্ঠস্বর নয়, নিতান্ত এক প্রয়োজনের আর নিছক এক ক্ষুধার কণ্ঠস্বর। দুঃসহ।
দপ্ করে জ্বলে ওঠে মল্লিকারও কণ্ঠস্বর– ছিঃ।
গম্ভীর হয় বিকাশ–এর মানে?
মল্লিকা–কেন যাব তোমার ঘরে ? টেলিফোনে তোমার একটা নেমন্তন্ন এসেছে বলে ভয় পেয়ে?
আমি টেলিফোন নই, কলিংবেলও নই, আমি মানুষ।[৭৮]

মল্লিকার এই আত্মসচেতনতা আর তার দেওয়া আঘাতের প্রবল অভিঘাতই বিকাশকে ধীরে ধীরে অন্ধকার গুহায়িত জীবন থেকে আলোর দিকে ধাবিত করেছে। নিষিদ্ধ অতল প্রবৃত্তিলোক থেকে মুক্তি পেয়ে বিকাশের মধ্যে জন্ম নিয়েছে নববিকশিত এক প্রণয়ী। জৈব প্রবৃত্তি আর প্রেমের দ্বন্দ্বে শেষ পর্যন্ত তাই জয়ী হয়েছে প্রেমের।

'সামগ্রিক জীবন যৌনজীবনকে নিয়ন্ত্রিত করে, যৌন জীবন সমগ্র জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করে না'[৭৯] —কিন্তু যখন কোনো ব্যক্তি কেবল যৌনজীবন দ্বারা সমগ্র জীবনের ছক তৈরি করে তখন ভারসাম্যচ্যুত সে জীবন ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয় অবধারিতভাবেই। সুবোধ ঘোষের "শরীরিণী" (১৯৫৫) গল্পের নায়ক ভাস্কর্য শিল্পী শোভন সেন যৌন বিকারগ্রস্ত। প্রেম ও কামঘটিত যৌন প্রবৃত্তি সংক্রান্ত বিশৃঙ্খল চরিত্রের অধিকারী একজন বায়ু রোগী। তাই নগ্ন নারীকে মডেল করে মূর্তি নির্মাণ তার সেই অবদমিত যৌনাকাঙ্ক্ষা থেকে সৃষ্ট বায়ুরোগেরই নামান্তর। গল্পে দেখি পছন্দ মতো মডেল না পেয়ে শেষে বিজ্ঞাপন দিয়ে শোভন সেন নায়িকা নীতা মিত্রকে মডেল হিসেবে নির্বাচিত করেন। অপর দিকে দরিদ্র পরিবারে দুপয়সা সাহায্য করবার জন্য তার এ পথে আসা। নীতাকে পেয়ে শোভন সেনের চোখের খুশি আর হাতের তুলি উল্লাসে কাজ করতে থাকে। কিন্তু একসময় ক্লান্ত হয়ে ওঠে নীতা। অনুধাবন করতে পারে শোভন সেনের লুব্ধক দৃষ্টি। যৌনসর্বস্ব হয়ে ওঠে শোভন সেনের মনস্তত্ত্ব। একদিন একটি বিশেষ মুহূর্তে নীতা শোভনকে কফি বানিয়ে তার হাতে পেয়ালা তুলে দিলে শোভন তার অবদমিত যৌন প্রবৃত্তির চরিতার্থতা প্রকাশ করে:

শোভন সেন ডাকেন–নীতা!
নীতা–বলুন।
শোভন সেন– কাল আবার আসবে তো?
নীতা– হ্যাঁ।
শোভন সেন হাসেন– কফি তৈরি করবার জন্য?
নীতাও হাসে– হ্যাঁ।
শোভন সেন– এ কাজ কতদিন ভাল লাগবে?
নীতা– আপনি যতদিন বলবেন, ততদিন।
শোভন সেন–যদি বলি রোজই, চিরকাল করো।
নীতার দু'চোখে বাগানের সব লতাপাতার ছায়ার দোলানি যেন ঝড়ের মত এসে লাগে। বুকের ভিতর টিপটিপ করে আছাড় খায় নিঃশ্বাসগুলি। নিজের কান দুটোকে যেন বিশ্বাস করা যায় না।
শুনতে ভুল হয়নি তো ?
শোভন সেন বলেন–বলো নীতা।
নীতা বলে–চিরকাল করবো।[৮০]

আবেগে আপ্লুত হয়ে নীতা এমন প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করলেও পরবর্তী সময়ে সে এ প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেছে। বেহায়া শরীর প্রদর্শনের চুক্তি শেষ না হতেই মডেলের কাজ ছেড়ে দিয়ে সে বিয়ে করে অন্যত্র। চুক্তিভঙ্গের ক্ষমা চাইতে এসে নীতা পুনরায় শোভনের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে। 'বিয়ের আগে ও পরে নীতার এই মানসিক পরিবর্তনও সম্পূর্ণতই মনস্তত্ত্বসম্মত।'[৮১] অন্যদিকে নীতাবিহীন স্টুডিয়োর দিকে তাকিয়ে শোভনের মনে হয় 'নিষ্ঠুর এক দাবির গরাদ ভেঙ্গে'[৮২] পালিয়ে গেছে নীতা মিত্র। আসলে শিল্পের জগতের বাসিন্দা হলেও শোভন সেনের সামগ্রিক জীবনযাপনে যৌনতা তথা লিবিডোই বড় হয়ে দেখা দিয়েছে। তাই নীতার অনুপস্থিতি তাকে জটিল এক মানসিক রোগীতে পরিণত করেছে।

সুবোধ ঘোষ লিবিডো-তাড়িত মানুষের কামপ্রবৃত্তি চরিতার্থ দ্যোতক "আসক্তি ও আসঙ্গ" প্রবন্ধে বলেছেন, 'কাম প্রবৃত্তির পূর্ণ প্রকাশ দেখা যায় যৌনাসঙ্গে।'[৮৩] এর অতৃপ্তিজনিত মানুষের মনের বিকার-জাত আচরণের অপচার দেখা দিতে পারে। এরই সার্থক ও পূর্ণাঙ্গ নিদর্শন "মনোলোভা"[৮৪] গল্পটি। গল্পে দুই বিপরীত শ্রেণীর দম্পতির অবদমিত যৌনাকাঙ্ক্ষা বর্ণিত হয়েছে। 'একটি পরিবার হলো ভ্রান্ত এটিকেট আর মরালে সজ্জিত ঐশ্বর্য সমেত মৃগেন বিশ্বাস আর মিতা বিশ্বাসের দাম্পত্য আর অন্যটি এদেরই ট্যাক্সি ড্রাইভার ও তার স্ত্রী—নরেশ ও সুধা।'[৮৫] আর্থ-সামাজিক পটভূমিতে রচিত গল্পটিতে দাম্পত্য সম্পর্কের ক্ষয়ের ছবি অঙ্কিত হলেও এতে লেখক চরিত্রসমূহের মনোবিকলনের দিক অনুন্মোচিত রাখেননি। তাই উচ্চমধ্যবিত্ত শ্রেণীর প্রতিনিধি মৃগেন আর মিতার মনোবিকলন গল্পে সুস্পষ্টভাবেই বর্ণিত হয়েছে। নিয়মনিষ্ঠ দাম্পত্যজীবনে তাদের প্রতিটি আচরণ নির্দিষ্ট ; ফলে তারা বাতিকগ্রস্ত। গল্পকার উল্লেখ করেছেন:

> সকাল ঠিক আটটার সময় একবার ড্রইংরুমের ভিতরে মৃগেন বিশ্বাস ঠিক দেখতে পায় মিতা বিশ্বাসকে। সকাল ছ'টা থেকে আটটার মধ্যেই যে যার প্রসাধনের কাজ সেরে ফেলে। ঠিক ন'টা পর্যন্ত মিতার হাতে হাত রেখে বসে থাকে মৃগেন। মিতা ঠিক দু'বার হাসে। মৃগেন যখন বলে—ভাল ঘুম হয়েছিল তো মিতা, তখন একবার। আর একবার, ঠিক ন'টার সময় চেয়ার ছেড়ে যখন উঠে দাঁড়ায় মৃগেন, তখন মিতার মুখে ঝিক করে হাসি ফুটে ওঠে। মিতা বলে—তোমার ঘুম হয়েছিল তো ?[৮৬]

শুধু তাই নয়, লেখক বিবৃতি দিয়ে রেখেছেন যে, সপ্তাহের মধ্যে মাত্র শনিবার রাত আটটায় আহার পর্ব শেষ করে রাত দশটা পর্যন্ত তারা মিলিত হয় দুজনে, তারপর যে যার কাছ থেকে বিদায় নেয়। এরূপ বাতিকের উদ্ভব হয় চেতন-অবচেতনের দ্বন্দ্ব থেকে দমিত ইচ্ছাবৃত্তির আত্মস্ফূর্তির আবেগ থেকে। তাই তারা নরেশ ও সুধার প্রতি একে অপরে আকর্ষণ অনুভব করেছে। তাদের এরূপ আকর্ষণ অনুভবের নেপথ্যে দাম্পত্যের অন্তঃসার-শূন্যতাই সক্রিয় হয়ে উঠেছে। তাই তাদের দাম্পত্য ভোগে নিগ্রহামোদ (Sadism) নেই। অন্যদিকে নরেশ ও সুধা উভয়েই তার চরম শিকার হয়ে গল্পে চিত্রিত হয়েছে। ফ্রয়েড বলেছেন, 'এক্ষেত্রে নিগ্রহ করেন যিনি এবং নিগৃহীত হন যিনি—উভয়েই সমান সুখ ভোগের অংশীদার।'[৮৭] মৃগেন বিশ্বাস আর মিতা বিশ্বাস গোপনে সুধা আর নরেশের রতি দৃশ্য দেখে সম্মোহিত হয়েছে। মিতা বিশ্বাস লক্ষ্য করেছে:

> সুধার একটা হাতকে এক হাত দিয়ে মুচড়ে নিয়ে ধরে রেখেছে নরেশ। হেলে পড়েছে সুধার ছিপছিপে চেহারাটা। তবু আধ-কুঁজো হয়ে পিঠ বাঁকা করে মুখ ফিরিয়ে ছটফট করছে সুধা। বারবার ফসকে যাচ্ছে নরেশের হাত, কিছুতেই সুধার টোল-খাওয়া থুতনিটা ধরতে পারছে না। চোখ বড় করে, ভ্রূকুটি করে আর দাঁতে দাঁত চিবিয়ে নরেশ বলছে—তোমার সব দুষ্টুমি আমি আজ এক কামড়ে খেয়েই ফেলবো।[৮৮]

কেবল মিতাই নয়, মৃগেনও অলক্ষ্যে লক্ষ করেছে কেমন করে নরেশের স্ত্রী সুধা তার সুন্দর অঙ্গকান্তি, যৌবনের উচ্ছলতা নিয়ে তাকে প্ররোচিত করে:

> ভোরবেলায় আমার ঘুম ভাঙিয়েছিলে কেন বলো? নরেশ বলে–বেশ করেছি।
>
> সুধা বলে–প্রতিশোধ নেব।
>
> নরেশ–কি ?
>
> সুধা–আমিও তোমাকে আজ সারা রাত ঘুমাতে দেবো না।
>
> নরেশ–সাধ্যি কি তোমার ? আমি ঘুমিয়ে পড়লাম বলে। নরেশ সত্যিই চোখ বন্ধ করে। মরিয়া হয়ে নরেশের পিঠে চিমটি কাটে সুধা, নাকের উপর একটা টোকা দিয়ে সরে পড়ে। আবার তখনি ফিরে এসে আচঁলের কোণ পাকিয়ে নরেশের কানে সুড়সুড়ি দেয়। নরেশ ছটফট করে, কিন্তু নরেশের নকল ঘুম ভাঙে না। কোমড়ে আঁচল জড়ায় সুধা। তারপর সেই দুই ছিপছিপে হাতে নরেশের গলা জড়িয়ে ধরে। তামাকের পাইপের উত্তাপ হাতের মধ্যেই চেপে রেখে ধীরে ধীরে সরে যায় মৃগেন।[৮৯]

আসলে মৃগেনের সম্ভোগে অতৃপ্তিজনিত মানসিক অবদমন তাকে এরূপ আচরণ প্রকাশে বাধ্য করেছে।

সুবোধ ঘোষ লিবিডোতাড়িত মানুষের অস্বাভাবিক মনস্তত্ত্ব চিত্রণে বেশ সার্থকতার স্বাক্ষর রেখেছেন। এ ধারার একটি গল্প "কথামালা"।[৯০] রাইচরণ মল্লিকের কন্যা বিনীতা মল্লিক আলোচ্য গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র, বস্তুত সে-ই গল্পের কথামালা। কথা আর সুন্দর ব্যবহারে এ নারী ধ্রুবজ্যোতিদের পরিবারে একান্ত আপনজন হয়ে উঠেছে। কিন্তু বিনীতার মূললক্ষ্য যে ধ্রুবজ্যোতি, তা এ বাড়ির সকলে প্রথমে অনুধাবন করতে পারেনি। বিনীতার অবদমিত মনোরাজ্যে ধ্রুবজ্যোতির একচ্ছত্র অধিষ্ঠান; তাই সে প্রতিবার ধ্রুবর বিয়ের জন্য আসা প্রস্তাব কৌশলে ভেঙে দিয়েছে। এর নেপথ্যে রয়েছে বিনীতার অবচেতনে বিরাজমান ধ্রুবজ্যোতিকে পাওয়ার তীব্র আকাঙ্ক্ষা। তাই লিবিডোতাড়িত বিনীতা ধ্রুবজ্যোতিকে বিভিন্নভাবে আকৃষ্ট করার চেষ্টা করেছে। গল্পের পরিণামী অংশে দেখি বিনীতার বুভুক্ষ নারীহৃদয় ধ্রুবজ্যোতির লিবিডোতাড়িত আহ্বানে তাকে স্তব্ধ, মূক করে দিয়েছে। কথা দিয়ে যে সকলের হৃদয় হরণ করেছিল, সে-ই আজ ধ্রুবজ্যোতির এরূপ আহ্বানে বাকরুদ্ধ হয়ে উঠেছে:

> বিনীতার একেবারে চোখের কাছে এসে শক্ত হয়ে দাঁড়ায় ধ্রুবজ্যোতি সেন। চায়ের পেয়ালা হাতে নিয়ে বাইরের দরজার পর্দা ঠেলবার আগে হঠাৎ আশ্চর্য হয়ে থমকে দাঁড়িয়ে পড়েন মেজবউদি। একি! কথামালা যে এখনও আছে, এখনও এই ঘরের ভিতর বসে আবোল-তাবোল কথা ছড়াচ্ছে।
>
> –না না না, আপনি সত্যিই ঠকবেন। পৃথিবীর এত ভালো মেয়ে থাকতে আপনি কেন ভুল করে --- মিছিমিছি --- আপনার মতো মানুষ কেন --- আ ঃ।
>
> নীরব হয়ে গেল কেন কথামালা ? কথা বলে না কেন বিনীতা ? দরজার পর্দা আস্তে সরিয়ে ঘরের ভিতরে উঁকি দিতেই চমকে ওঠেন আর সরে আসেন মেজবউদি। ঠিকই তো ! কথা বলবে কেমন করে মেয়েটা? ওভাবে মুখ বন্ধ করে দিলে কোন মেয়েই কথা বলতে পারে না।[৯১]

ফ্রয়েডের মতে লিবিডোর প্রকাশ ভালোবাসা বা আকর্ষণে। এখানে ধ্রুবজ্যোতির আচরণ সেই লিবিডো তাড়িত ভালোবাসা থেকে উদ্ভূত হয়ে আত্মপ্রকাশ করেছে।

আমাদের যাবতীয় ইচ্ছা ও উদ্যমের মূলে যে সক্রিয় যৌন প্রবৃত্তি, সেই যৌন আকাঙ্ক্ষার ফলেই সৃষ্টি হয় মানসিক বিকার। কাঙ্ক্ষিত সময়ে কামনার মানুষটিকে না পেলে ব্যক্তি নানাবিধ অপচারে জড়িয়ে যেতে পারে। ফলে দেখা দেয় হিংসা, বিদ্বেষ, অন্তর্দ্বন্দ্ব আর বিবিধ স্নায়বিক উত্তেজনা। এরকম একটি ঘটনা আর বিষয় উপজীব্য করে সুবোধ ঘোষ রচনা করেছেন "ঠাণ্ডা যুদ্ধের অবসান" শীর্ষক গল্প। কলেজ পড়ুয়া এক তরুণী রিক্সা আরোহিণীকে কেন্দ্র করে দুই তরুণ রিক্সাচালকের পারস্পরিক লড়াই আর স্নায়বিক উত্তেজনা গল্পটিকে আকর্ষণীয় করে তুলেছে। রায়ের হাট স্টেশনের দুই রিক্সাচালক নিতাই আর রামচরণের মধ্যে মাস ছয়েক পূর্বেও যে অন্তরঙ্গতা ছিল তা হঠাৎই চিড় ধরে যায় জনৈক কলেজ ছাত্রীকে কেন্দ্র করে। প্রতিবেশী চালকদের দৃষ্টিতে যারা রাম-লক্ষ্মণ নামে বিবেচিত, সেই নিতাই ও রামচরণ তাদের জনৈক আরোহিণীকে হস্তগত করার প্রাণান্তকর প্রচেষ্টায় রত। গল্পে তাই উঠে এসেছে ছাত্রীটিকে রিক্সা করে কলেজ পর্যন্ত পৌঁছে দেওয়ার জন্য নিতাই আর রামচরণের মধ্যে শুরু হওয়া এক ঠাণ্ডা যুদ্ধের লড়াই। কেবল নিতাই আর রামচরণ নয়, তাদের রিক্সা দুটিও যেন মুখোমুখি আক্রোশের ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে থাকে সর্বক্ষণ। আসলে অবচেতনে বিদ্যমান নিতাই ও রামচরণের মনোজাগতিক যে অব্যবস্থা ও বিপর্যয়, তারই ফলে এরূপ বিকৃত, অসুস্থ প্রতিযোগিতায় তারা অবতীর্ণ হয়েছে। যদিও এই প্রতিযোগিতায় কেউই জয়ী হয়নি। কারণ মাসাধিক অ-দর্শনের পর উভয়ই দেখতে পায় সেই কলেজ ছাত্রীটি স্টেশনের ফটক পার হয়ে এসেছে এক অন্য সাজে। সিঁথিতে সিঁদুর, কানে কান পাশা, সঙ্গে একজন সুবেশ ভদ্রলোক। এক রিক্সা আরোহিণীকে কেন্দ্র করে দুই তরুণ রিক্সাচালকের এরূপ বিকৃত মনোলোকের বিচিত্র রহস্য উদঘাটনে সুবোধ ঘোষ অর্জন করেছেন এক অতুল্য সিদ্ধি।

মানুষের মনোজগতের জটিল অতল প্রবৃত্তিলোক, সেখানকার দ্বন্দ্ব-সংঘাত, মথিত হয়ে ওঠা প্রবৃত্তির তাড়না ও দুর্দমনীয় বিক্ষোভ, সংরাগ, কুণ্ডলায়িত আবেগের স্বতঃস্ফূর্ত বহিঃপ্রকাশ সুবোধ ঘোষের আলোচ্য গল্পসমূহে এক বিশিষ্ট ও স্বকীয় মাত্রা এনে দিয়েছে। আধুনিক মধ্যবিত্তের জটিল মনের রহস্য উদঘাটনে মনস্তত্ত্বকে নানাভাবে প্রয়োগ করেছেন সুবোধ ঘোষ। কেননা 'দুর্বোধ্য, দুর্জ্ঞেয়, রহস্যময় মনের জটিলতাই মনস্তত্ত্বমূলক গল্পের উপাদান।'[৯২] তাই সুবোধ ঘোষের এ ধারার গল্পে মনোবিকলনের পূর্ণাঙ্গ চিত্র উপস্থাপিত হয়েছে সার্থকভাবে। তাছাড়া গল্পের চরিত্রগুলোও অস্বভাবী আচরণ ও লিবিডো আক্রান্ত জটিলতায় ঘূর্ণমান।

তথ্যনির্দেশ ও টীকা

১. নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, *সাহিত্যে ছোটগল্প*, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, প্রথম 'মিত্র ও ঘোষ' সংস্করণ, শ্রাবণ ১৪০৫, পৃ. ২০৯

২. নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, *বাংলা গল্প-বিচিত্রা*, প্রকাশ ভবন, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, পঞ্চম মুদ্রণ, আশ্বিন ১৪১০, পৃ. ৬০

৩. ফ্রয়েডের প্রথম গ্রন্থ *Aphasia* প্রকাশিত হয় ১৮৯১ সালে। এরপর প্রকাশিত হতে থাকে তাঁর বেশ কিছু গ্রন্থ, যেমন : *The Interpretation of Dreams (১৯০০), Three Essays on the Theory of Sexuality (১৯০৫), Jokes and Their Relation to the Unconcious (১৯০৫), Character and Anal Erotism (১৯০৮), Contribution to the Psychology of Love (১৯০১), Totem and Taboo (১৯১৩), Psychopathology of Everyday Life (১৯১৩), The Repression (১৯১৫), The Unconcious (১৯১৫), Metapsychology (১৯১৫), A General Introduction to Psycho-Analysis (১৯২০), Group Psychology and the Analysis of the Ego (১৯২১), Introductory Lectures on Psycho-Analysis (১৯১৫-১৭), The Ego and the Id (১৯২৩)*

৪. অচ্যুত গোস্বামী, *বাংলা উপন্যাসের ধারা*, পাঠভবন, কলকাতা, ১৯৬৮, পৃ. ৩৫৯

৫. সুনীলকুমার সরকার, *ফ্রয়েড*, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, কলকাতা, তৃতীয় প্রকাশ, মার্চ ১৯৯০, পৃ. ১৫

৬. সুবোধ ঘোষের শৈশব-কৈশোর এবং তরুণ জীবনের অধিকাংশ সময় অতিবাহিত হয়েছে বিহারের হাজারিবাগে। এই হাজারিবাগেই তাঁর জন্ম ১৯০৯ খ্রিষ্টাব্দের ১৪ সেপ্টেম্বর। বাবা সতীশচন্দ্র ঘোষ, সরকারি জেলখানার সামান্য কর্মচারী। মা কনকলতা দেবী গৃহিণী। পিতা মাতার পাঁচ পুত্র ও দুই কন্যার মধ্যে তিনি ছিলেন দ্বিতীয়। হাজারিবাগ জেলা স্কুলের ছাত্র ছিলেন তিনি। এখান থেকেই বিজ্ঞান বিভাগ থেকে তিনি ম্যাট্রিক পাস করেন। পরবর্তী সময়ে হাজারিবাগের সেন্ট-কলম্বাস কলেজে বিজ্ঞান শাখায় ভর্তি হলেও চরম দারিদ্র্যের কারণে তাঁকে কলেজের পড়াশোনা ছেড়ে দিতে হয়েছিল।

৭. শিবশংকর পাল, *সুবোধ ঘোষের ছোটগল্পে মানবিক মূল্যবোধ*, সুবর্ণা প্রকাশনী, কলকাতা, ১৯৯৯, পৃ. ৬৬

৮. পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৭

৯. কল্যাণ মণ্ডল, "সুবোধ ঘোষের জীবন-পরিচয়" শীর্ষক প্রবন্ধ, *কোরক সাহিত্য পত্রিকা*, প্রাক্ শারদ সংখ্যা, ১৪১৫, পৃ. ৩৯৯

১০. মুকুলরাণী ঘোষ, "স্মৃতির সৌরভ" শীর্ষক প্রবন্ধ, *ভরা থাক সুবোধ ঘোষ স্মৃতি-তর্পণ*, সুবোধ ঘোষ স্মৃতি সংসদ, কলকাতা, ১৯৯১, পৃ. ৮৩

১১. বসন্ত লস্কর, "সিগমুণ্ড ফ্রয়েড-সুবোধ ঘোষ" শীর্ষক প্রবন্ধ, উত্তম পুরকাইত সম্পাদিত সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক ষান্মাসিক পত্রিকা *উজাগর, শতবর্ষে সুবোধ ঘোষ সংখ্যা*, ১৪১৫, পৃ. ২১০

১২. অমল শঙ্কর রায়, *মনীষা ও মনঃসমীক্ষণ*, পুস্তক বিপণি, কলিকাতা, প্রথম প্রকাশ, ফেব্রুয়ারি ১৯৮৪, পৃ. ৬

১৩. বসন্ত লস্কর, পূর্বোক্ত, পৃ. ২১১

১৪. নিতাই বসু (সম্পা), *সুবোধ ঘোষ: প্রবন্ধাবলী*, সাহিত্যলোক, কলিকাতা, প্রথম প্রকাশ, ২০০০, পৃ. ১৭৩

১৫. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৭৬

১৬. সৈয়দ আজিজুল হক, *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছোটগল্প সমাজচেতনা ও জীবনের রূপায়ণ*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ, ১৯৯৮, পৃ. ১৩২

১৭. নিতাই বসু (সম্পা), পূর্বোক্ত, পৃ. ১৭৬

১৮. তপন মণ্ডল, *গল্পকার সুবোধ ঘোষ: জীবনদৃষ্টি ও নির্মাণশিল্প*, জ্ঞান বিচিত্রা প্রকাশনী, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, জুলাই ২০০৭, পৃ. ৫৯

১৯. শিবশংকর পাল, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৮৫

২০. লেখকের প্রথম গল্প "অযান্ত্রিক" 'আনন্দবাজার পত্রিকা'র বার্ষিক দোল সংখ্যায় ১৯৪০ সালে প্রকাশিত হয়।

২১. সুবোধ ঘোষ, "অযান্ত্রিক", *গল্পসমগ্র-১*, আনন্দ প্রকাশনী, কলকাতা, প্রথম আনন্দ সংস্করণ, জানুয়ারি, ১৯৯৪, পৃ. ৪৫১

২২. Sigmund Freud, *Three Essays on the theory of Sexuality*, in Standard Edition of the Complete Psychological works of Sigmund Freud, Vol. vii, 1981, Hogarth Press New York, p. 147-148

২৩. অরিন্দম গোস্বামী, *সুবোধ ঘোষ কথাসাহিত্য*, পুস্তক বিপণি, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, আগস্ট ২০০১, পৃ. ৯৯

২৪. সুবোধ ঘোষ, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৫২

২৫. বীরেন্দ্র দত্ত, *বাংলা ছোটগল্প: প্রসঙ্গ ও প্রকরণ*, পুস্তক বিপণি, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, আগস্ট ১৯৮৫, পৃ. ৪৭৫

২৬. জগদীশ ভট্টাচার্য (সম্পা), *সুবোধ ঘোষের শ্রেষ্ঠ গল্প*, প্রকাশ ভবন, কলকাতা, ১৪০৪, পৃ. ২

২৭. ঋত্বিক ঘটক, "কেন অযান্ত্রিক করি' শীর্ষক প্রবন্ধ, *ভরা থাক সুবোধ ঘোষ স্মৃতি তর্পণ*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৩

২৮. 'দেশ' পত্রিকার নবম বর্ষ ৫০ সংখ্যার ৩১ অক্টোবর ১৯৪২ সালে "গরল অমিয় ভেল" গল্পটি প্রকাশিত হয়।

২৯. সুদীপ কুমার চক্রবর্তী, *ছোটগল্পের সুবোধ ঘোষ*, প্রকাশভবন, কলিকাতা, প্রকাশকাল উল্লেখ নেই, পৃ. ৬৬

৩০. বীরেন্দ্র দত্ত, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৯৯-৫০০

৩১. সুবোধ ঘোষ, "গরল অমিয় ভেল", *গল্প সমগ্র-২*, আনন্দ প্রকাশনী, কলকাতা, প্রথম আনন্দ সংস্করণ, এপ্রিল, ১৯৯৪, পৃ. ১৫২

৩২. তপন মণ্ডল, পূর্বোক্ত, পৃ. ৬২

৩৩. মঞ্জুর আহমদ, *অস্বভাবী মনোবিজ্ঞান*, জ্ঞানকোষ প্রকাশনী, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ, ২০০১, পৃ. ১৯১

৩৪. সুবোধ ঘোষ, "গরল অমিয় ভেল", পূর্বোক্ত, পৃ. ১৬০

৩৫. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৬১

৩৬. সুদীপ কুমার চক্রবর্তী, পূর্বোক্ত, পৃ, ৬৫-৬৬

৩৭. অরিন্দম গোস্বামী, পূর্বোক্ত, পৃ. ১০৪-১০৫

৩৮. "সুন্দরম্" গল্পটি ১৯৪১ সালে বার্ষিক 'আনন্দবাজার পত্রিকা'য় প্রকাশিত হয়। পরবর্তীকালে এটি লেখকের প্রথম গল্পগ্রন্থ *ফসিল*-এ অন্তর্ভুক্ত হয়।

৩৯. সুদীপ কুমার চক্রবর্তী, পূর্বোক্ত, পৃ, ৫১

৪০. সুবোধ ঘোষ, "সুন্দরম্", *গল্প সমগ্র*-২, আনন্দ প্রকাশনী, কলকাতা, প্রথম আনন্দ সংস্করণ, এপ্রিল, ১৯৯৪, পৃ. ১৩৭
৪১. নিতাই বসু (সম্পা), পূর্বোক্ত, পৃ. ১৮০
৪২. সুবোধ ঘোষ, "সুন্দরম্", পূর্বোক্ত, পৃ. ১৩৮
৪৩. Sadism : According to Freud, the love-hate ambivalence manifested in the feelings and actions of friends and loves all come from the libido drive and the cruelty of the sadist who obtains sexual satisfaction only when subjecting his lovemate to torture could also, so it seemed at first, be merely a distoration of the libido. (*Contemporary School of Psychology*, Robert s. Woodworth)
৪৪. তপন মণ্ডল, পূর্বোক্ত, পৃ. ৬০
৪৫. মানস রায়চৌধুরী, *লোকজীবন মনস্তত্ত্ব শিল্পসৃষ্টি*, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, ফেব্রুয়ারি, ২০০১, পৃ. ৬৫
৪৬. "গোত্রান্তর" গল্পটি ১৯৪০ সালে প্রকাশিত হয়
৪৭. সুবোধ ঘোষ, "গোত্রান্তর", *গল্প সমগ্র*-২, পৃ. ১১৫
৪৮. পূর্বোক্ত, পৃ. ১১৬
৪৯. পূর্বোক্ত, পৃ. ১১৯
৫০. মধুমিতা বন্দ্যোপাধ্যায়, *মানিকের ছোটগল্পে মনস্তত্ত্ব*, অলকা প্রিন্টার্স, কোলকাতা, প্রথম প্রকাশ, শ্রাবণ, ১৪০৮, পৃ. ৭৭
৫১. ১৯৪০ সালে 'আনন্দবাজার পত্রিকা'য় "শক থেরাপি" গল্প প্রকাশিত হয়
৫২. সুবোধ ঘোষ, "শক থেরাপি", *গল্প সমগ্র*-১, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪১১
৫৩. শিবশংকর পাল, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৮৮
৫৪. লেখকের দ্বিতীয় গল্পগ্রন্থ *পরশুরামের কুঠার*-এ অন্তর্ভুক্ত "উচলে চড়িনু" গল্পটি ১৯৪১ সালে প্রকাশিত হয়।
৫৫. নীহাররঞ্জন সরকার, *মনোবিজ্ঞান ও জীবন*, জ্ঞানকোষ প্রকাশনী, ঢাকা ১৯৭৩, পৃ. ৩২৭
৫৬. শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, *বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা*, মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা, সপ্তম পুনর্মুদ্রণ সংস্করণ, ১৯৮৪, পৃ. ৬৪৯
৫৭. সুবোধ ঘোষ, 'উচলে চড়িনু', *গল্প সমগ্র*-৩, আনন্দ প্রকাশনী, কলকাতা, প্রথম আনন্দ সংস্কারণ, জুন, ১৯৯৪, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৪৬
৫৮. "একতীর্থা" গল্পটি লেখকের তৃতীয় গল্প সংকলন *শুক্লাভিসার*-এ অন্তর্ভুক্ত হয়
৫৯. শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৫২
৬০. শিবশংকর পাল, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৮৬
৬১. নিতাই বসু (সম্পা), পূর্বোক্ত, পৃ. ১৮২-১৮৩
৬২. সুবোধ ঘোষ, "একতীর্থা", *গল্প সমগ্র*-১, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৭১
৬৩. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৭৫
৬৪. ১৯৪৪ সালে 'আনন্দবাজার পত্রিকা'য় প্রকাশিত "কাঞ্চন সংসর্গাৎ" গল্পটি লেখকের চতুর্থ গল্প সংকলন *জতুগৃহ*-তে অন্তর্ভুক্ত হয়।
৬৫. সুমনস্বরাট ঘোষ, "কাঞ্চন সংসর্গাৎ: হিতোপদেশের পুনর্নির্মাণ" শীর্ষক প্রবন্ধ, উত্তম পুরকাইত সম্পাদিত সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক ষান্মাসিক পত্রিকা *উজাগর, শতবর্ষে সুবোধ ঘোষ সংখ্যা* ১৪১৫, পৃ. ১৩৪

৬৬. মানস রায়চৌধুরী, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৪৬
৬৭. সমীরণ চট্টোপাধ্যায়, *মনস্তত্ত্বের গোড়ার কথা*, বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, কলিকাতা, ১৩৫৮, পৃ. ৬৬
৬৮. সুবোধ ঘোষ, "কাঞ্চন সংসর্গাৎ", *গল্প সমগ্র-১*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৫
৬৯. Men are not gentle, friendly creatures, wishing for love, who simply defend themselves if they are attacked but a powerful measure of desire for aggressiveness has to be reckoned as part of their instinctual endowments. (Civilization and Discontents, 1930)
৭০. সাবিত্রী নন্দ চক্রবর্তী, *আধুনিক বাংলা ছোটগল্প : মূল্যবোধের সংকট*, পুস্তক বিপণি, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, জুন, ২০০৪, পৃ. ৮৩
৭১. সুবোধ ঘোষ, 'চতুর্ভুজ ক্লাব,' *গল্প সমগ্র-১*, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৮২
৭২. পূর্বোক্ত, পৃ. ২৯১
৭৩. সমীরণ চট্টোপাধ্যায়, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৩
৭৪. নিতাই বসু (সম্পা), পূর্বোক্ত, পৃ. ১৮২-১৮৩
৭৫. সুবোধ ঘোষ, 'চতুর্ভুজ ক্লাব', পূর্বোক্ত, পৃ. ২৯৫
৭৬. পূর্বোক্ত, পৃ. ২৯১
৭৭. মানস রায়চৌধুরী, পূর্বোক্ত, পৃ. ৭০
৭৮. সুবোধ ঘোষ, "বৈদেহী", *গল্প সমগ্র-১*, পূর্বোক্ত, পৃ. ১২৫
৭৯. ধীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, *পাভলভ পরিচিতি*, কলকাতা, পরিমার্জিত অখণ্ড সংস্করণ, জানুয়ারি, ২০০০, পৃ. ৩৩২
৮০. সুবোধ ঘোষ, "শরীরিণী", *গল্প সমগ্র-১*, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৪৭
৮১. অরিন্দম গোস্বামী, পূর্বোক্ত, পৃ. ১০৯
৮২. সুবোধ ঘোষ, "শরীরিণী", পূর্বোক্ত, পৃ. ২৪৭
৮৩. নিতাই বসু (সম্পা), পূর্বোক্ত, পৃ. ২১২
৮৪. "মনোলোভা" গল্পটি *থির বিজুরী* গল্পগ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত হয়
৮৫. তপন মণ্ডল, পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৫-৬৬
৮৬. সুবোধ ঘোষ, "মনোলোভা", *গল্প সমগ্র-১*, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৬৪-১৬৫
৮৭. সুনীলকুমার সরকার, *ফ্রয়েড*, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৭
৮৮. সুবোধ ঘোষ, "মনোলোভা", পূর্বোক্ত, পৃ. ১৬৭
৮৯. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৬৮
৯০. "কথামালা" গল্পটি লেখকের *কুসুমেষু* গল্পগ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত হয়
৯১. সুবোধ ঘোষ, "কথামালা", পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৭৬
৯২. শিবশংকর পাল, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৮৪

বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি পত্রিকা, দ্বাত্রিংশ খণ্ড, শীত সংখ্যা, পৌষ ১৪২১/ডিসেম্বর ২০১৪

ঢাকার ব্যাংক ব্যবস্থা ১৯২১-১৯৭১

চাঁদ সুলতানা কাওছার*

সারসংক্ষেপ

আধুনিক যুগে ব্যাংক ছাড়া একটি দেশের অর্থনীতিকে কল্পনা করা যায় না। আলোচ্য প্রবন্ধে মূলত ২০ শতকের ঢাকা শহরের ব্যাংক ব্যবস্থা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। কেননা অনেক গবেষক ঢাকার বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করলেও ঢাকা শহরের ব্যাংক ব্যবস্থা নিয়ে তেমন কোনো উল্লেখযোগ্য আলোচনা করেননি। বেশিরভাগ ব্যাংক কলকাতায় গড়ে উঠেছিল। ফলে সবকিছু কলকাতা থেকে নিয়ন্ত্রিত হতো। আবার যে কটি ব্যাংক ঢাকায় ছিল তা কলকাতার ব্যাংকের শাখা অফিস হিসেবে কার্যকর ছিল। সেখান থেকে শাখা অফিসের মাধ্যমে ব্যাংক ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রিত হতো। অবশ্য ভারতীয় ব্যাংক ছাড়াও কিছু বিদেশী ব্যাংক ছিল। তবে এসব ব্যাংক সম্পর্কে যথেষ্ট পরিমাণে তথ্য পাওয়া যায়নি। ১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগের পরেও পূর্ব পাকিস্তানভিত্তিক কোনো ব্যাংক গড়ে ওঠেনি। পাকিস্তান আমলের মাঝামাঝি সময়ে বাঙালি মালিকানাধীন দুটি ব্যাংক গড়ে উঠলেও বেশির ভাগই পশ্চিম পাকিস্তানী মালিকানাধীন ছিল। এসব ব্যাংকের প্রধান কার্যালয় পশ্চিম পাকিস্তান বা করাচিতে অবস্থিত ছিল। সেখান থেকে কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের অধীনে শাখা অফিসের মাধ্যমে ব্যাংক ব্যবসা পরিচালিত হতো। পাকিস্তান আমলেও বাঙালিরা ব্যাংক ব্যবসায় কেন অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে পারেনি, ব্যাংকের বিভিন্ন পরিসংখ্যান, ব্যাংকের শাখা ঢাকার কোথায় কোথায় অবস্থিত চিহ্নিতকরণ, আমানত, মূলধনের পরিমাণ, ঢাকার অর্থনীতিতে এসব ব্যাংক কতটুকু ভূমিকা রাখত ইত্যাদি বিষয় তুলে ধরা হয়েছে। এছাড়া বাণিজ্যিক ব্যাংক ছাড়াও কিছু আর্থিক প্রতিষ্ঠান ছিল যার মাধ্যমে এই অঞ্চলের জনগণকে আর্থিক সহায়তা দেওয়া হতো। কী পরিমাণ দেওয়া হতো, কতটুকু এই অঞ্চলের জন্য বরাদ্দ ছিল তা তুলে ধরাও এই প্রবন্ধের মূল উদ্দেশ্য। এক্ষেত্রে বিভিন্ন সরকারি প্রতিবেদন, পরিসংখ্যান বিভাগ, জেলা গেজেটিয়ার, বিভিন্ন পত্রিকা থেকে তথ্য নেওয়া হয়েছে। এছাড়া ব্যাংক সম্পর্কিত বিভিন্ন গ্রন্থের সহায়তা নেওয়া হয়েছে।

আধুনিক ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান মানুষের বহু বছরের সাধনার ফল। যুগ যুগব্যাপী বহু পরীক্ষা-নিরীক্ষা বিচার বিশ্লেষণ ও যাচাই-বাছাইয়ের মাধ্যমে ব্যাংক অর্থনীতির কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়েছে। উৎপাদন বৃদ্ধি, কর্মসংস্থান, জাতীয় আয় বৃদ্ধি, আমদানি-রপ্তানি, দারিদ্র্য দূরীকরণ, সামাজিক উন্নয়ন ও জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন থেকে শুরু করে অর্থনীতির এমন কোনো ক্ষেত্র নেই যার কথা ব্যাংক ছাড়া কল্পনা করা যায়। ব্যাংক বস্তুত মানুষের আর্থিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও কারিগরি উন্নতির একটি বড় অস্ত্র হিসেবে পরিগণিত হয়েছে। এই অর্থে বলা যায় আধুনিক ব্যাংক ব্যবসা ফলিত অর্থনীতির ও বাণিজ্যের ক্ষেত্রে মানবসভ্যতার একটি বড় আবিষ্কার।[১]

---

* প্রভাষক (ইতিহাস), এসএসএইচএল, বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়, বোর্ড বাজার, গাজীপুর

জ্ঞান-বিজ্ঞান জগতের বিস্ময়কর আবিষ্কারগুলো যেমন মানুষের জীবন বদলে দিয়েছে, তেমনি আধুনিক ব্যাংকও মানুষের জীবনে গুণগত পরিবর্তন এনে দিয়েছে। বলা বাহুল্য ব্যাংক ব্যবসার এই বিবর্তন প্রক্রিয়ায় বাঙালিও অংশীদার। আধুনিক ব্যাংকের অংশীদার হতে গিয়ে বাঙালিকেও এক দীর্ঘপথ অতিক্রম করতে হয়েছে। অন্যান্য ব্যবসার মতো ব্যাংক ব্যবসাও আলোচ্য সময় থেকে বিশেষ করে পাকিস্তান আমলে ভালভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়। এর আগে ব্যাংক তেমন সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল না।

ইউরোপের ব্যাংক ব্যবসার সমসাময়িককালে বাংলা অঞ্চলে ঢাকায় ব্যাংক ব্যবসা কী অবস্থায় ছিল তা জানতে হলে ভারতীয় ব্যাংক ব্যবসার ইতিহাসের আশ্রয় নিতে হবে। কারণ বাঙালির ব্যাংক ব্যবসার ইতিহাস ভারতীয় ব্যাংকিং ইতিহাসের সাথে জড়িত। ভারতীয় ইতিহাসে দেখা যায় যে, ব্যাংক ব্যবসা এই অঞ্চলে অপরিচিত কোনো ব্যবসা নয় বরং বিশ্বের অন্যান্য অঞ্চলের মতো অতি প্রাচীনকাল থেকেই ভারতেও ব্যাংক ব্যবসা প্রচলিত ছিল। পর্যাপ্ত সাক্ষ্য প্রমাণের ভিত্তিতে প্রাচীন ভারতের ব্যাংক ব্যবসা সম্পর্কে ধারণা লাভ করা যায়।

মধ্যযুগে বাংলা অঞ্চলে ব্যাংক ব্যবসা করত বাঙালি হিন্দুসমাজের সুবর্ণবণিক সম্প্রদায়। এই সুবর্ণবণিকরাই বাঙালি ব্যাংক ব্যবসায়ীদের পূর্বপুরুষ। যখন থেকে বাংলার কৌমসমাজ পেশা ও কর্মভিত্তিক কাঠামোতে সংগঠিত হতে শুরু করে তখন থেকেই সুবর্ণবণিকদের সোনার ব্যবসা এবং সেই সূত্রে ব্যাংক ব্যবসা শুরু। তারাও শুধু স্বর্ণরৌপ্য, অলংকারাদি, মূল্যবান জিনিসপত্র ও টাকাপয়সার নিরাপদ রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্বই নিত না, প্রয়োজনবোধে ঋণও প্রদান করত। দেশীয় কৃষিজীবী ব্যবসায়ী ও রাজন্যবর্গকে তারা টাকা পয়সা দিয়ে প্রয়োজনের দিনে সাহায্য করত। মুদ্রা বিনিময়, একস্থান থেকে অন্যস্থানে নিরাপদে মূল্যবান জিনিসপত্র ও টাকা পয়সা স্থানান্তরের কাজও তারা করত। নিরাপত্তার জন্য তারা লোহার সিন্ধুক রাখত এবং স্বর্ণরৌপ্য স্থানান্তরের জন্য তাদের সাংগঠনিক ব্যবস্থা ছিল। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাদের অবস্থান হতো ব্যবসা কেন্দ্রে, অথবা প্রশাসনিক কেন্দ্রে। ব্যাংক ব্যবসায় তারা বিত্তবৈভবে ঐশ্বর্যশালী হয়ে ওঠে। তখনকার দিনের সমাজে তাদের ধনসম্পত্তি ছিল রীতিমতো ঈর্ষার বস্তু এবং সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর লোক বিশেষত উচ্চবর্ণের লোকেরা তাদের এই প্রতিপত্তি মেনে নিতে রাজি ছিল না।

ফলে ধনসম্পদ এবং অর্থজগৎ সম্বন্ধে বাঙালি হিন্দুদের ধারণায় যে স্ববিরোধিতা দেখা যায় তাতে লুক্কায়িত দুই শ্রেণীর লোকের ক্ষমতা দ্বন্দ্ব ও মতামত। এর একদিকে আছে ব্রাহ্মণ্য সমাজের দৃষ্টিভঙ্গি এবং অন্যদিকে রয়েছে ব্যবসায়ী বা বৈশ্য সমাজের দৃষ্টিভঙ্গি। ব্রাহ্মণ্য সমাজ মনে করে যজ্ঞকর্মেই মুক্তি। তাই তাদের কাছে ক্ষত্রিয়ের সভ্যতা নির্মাণের শক্তি, বৈশ্যের সম্প্রসারণ শক্তি অথবা শূদ্রের সাম্য শক্তির কোনো মূল্য নেই। বস্তুত ব্রাহ্মণ্য সমাজ এই তিন শ্রেনির ভয়ে থাকত। তাই বলা হয়, 'টাকা মাটি, মাটি টাকা',-এর দ্বারা ব্রাহ্মণ্য সমাজ প্রধানত টাকার শক্তিকে বিনাশ করতে চায়; যাতে তার ক্ষমতা নিষ্কণ্টক হয়। অপরদিকে বৈশ্যের কাছে টাকা বা সম্প্রসারণ শক্তি অর্থাৎ বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মীই মুখ্য। বাকি শক্তি তার কাছে গৌণ। তাই অর্থোপার্জনের ক্ষেত্রে তার লোভ সীমাহীন। এই ধরনের

অবস্থানে সাধারণভাবে ব্রাহ্মণ তার সাথে ক্ষত্রিয়কে পেতে চায়। অপরদিকে ক্ষত্রিয় চায় ব্রাহ্মণ ও বৈশ্য উভয়কে। রাজা আদিশূর পুত্র বল্লাল সেনের সঙ্গে এক পর্যায়ে সুবর্ণবণিকদের দ্বন্দ্ব শুরু হয়। তখন বল্লাল সেন (১১৫৮-১১৭৯) প্রতিশোধ নিতে সুবর্ণবণিকদের গোহত্যা ও সোনা চুরির দোষে দোষী সাব্যস্ত করে তাদেরকে বৈশ্যত্ব থেকে খারিজ করেন।

জেমস ওয়াইজ উল্লেখ করেন যে, বল্লাল সেনের শত্রু হওয়ার জন্য তাদের এই দুরবস্থা। বল্লাল সেন আদেশ করেছিলেন শত্রুর সঙ্গে বসে খেতে। এখানে আরো উল্লেখ করতে হয় যে, তিনি তার গ্রন্থে উল্লেখ করেন সোনার, সোনার বণিক, সুবর্ণবণিক এই জাত এত বেশি বিভক্ত হয়েছে এবং এদের মধ্যে পার্থক্য এত কম যে, কে কোন শাখার সোনার তা নির্ণয় করা দুরূহ কাজ। তিনি আরো উল্লেখ করেন যে, সোনাররা হিন্দুস্তানি বেনিয়া। বাংলায় বসবাস করার কারণে জাতিচ্যুত হয়েছে। হিন্দুদের জাত সংস্কারকালে তাদের নিচু জাতের স্তরে নামিয়ে দেয়া হয়।[২]

বঙ্গদেশে সোনার বণিকদের সংখ্যা ৬০ হাজার ৩ শত ৬৬ জন। এর এক পঞ্চমাংশ অর্থাৎ ১২ হাজার ৭৩৫ জন বাস করে বর্ধমান। চব্বিশ পরগনায় বাস করত ৮,১৯৫ জন, হুগলিতে ৮,০৯৭ জন এবং ঢাকায় মাত্র ২৯২ জন।[৩]

আবার জেমস ওয়াইজ সুবর্ণকর ও সুবর্ণ বণিকদের আলাদা বলে উল্লেখ করেন। সুবর্ণকর হলো স্বর্ণকার আর সুবর্ণবণিক হলো পোদ্দার। বঙ্গদেশের মধ্যে যারা স্বর্ণকার তাদের বলা হয় স্যাঁকরা। অন্যদের সঙ্গে বৈবাহিক সম্পর্ক করলে এদের জাত যায়। ঢাকা শহরে (উনিশ শতক) চল্লিশটি ঘর আছে। এদের মধ্যে পঁচিশটি ঘর শহরে আর বাকি ১৫ ঘর গ্রামে। এদের আবার শাখা-প্রশাখা আছে[৪]:

বঙ্গশাখার গোত্র ৩টি: বাশ্যপ, গৌতম, বৈশ্য। এদের পদবি:

সেন	–	লাহা
ধর	–	চন্দ
দত্ত	–	পাল
বড়াল	–	সিনহা
মৌলিক	–	আড্ডি

এভাবে দেখা যায় যে, সুবর্ণবণিকরা বিভিন্ন শাখায়, বিভিন্ন গোত্র ও বিভিন্ন পদবিতে বিভক্ত ছিল।

নিমাই চাঁদ শীল (সুবর্ণবণিক সম্প্রদায়ের কৃতীপুরুষ) উল্লেখ করেন যে, এরপর বল্লাল সেনের সময় থেকে ১৪০০ সাল পর্যন্ত সুবর্ণবণিকদের জাতিকুল ধর্ম মেনে চলা ছাড়া আর কোনো উপায় ছিল না।[৫]

পঞ্চদশ-ষষ্ঠদশ শতাব্দীর সময়ে সুবর্ণবণিকরা কিছুটা বেরিয়ে আসার সুযোগ পায়। এই সময় বিদেশি বণিকদের আনাগোনা শুরু হয়। এই সময়ে তাদেরকে ব্যাংক ব্যবসায় দেখতে পাওয়া যায়— আড্ডি, ধর, সাহা. শীল, মল্লিক, দে, দত্ত ও পাইক ইত্যাদি পদবী সম্বলিত

যা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। এই ব্যক্তিগণ তখনকার সময়ে ব্যাংক ব্যবসায় জড়িত ছিল বলে উল্লেখ পাওয়া যায়। আর. এম. দেবনাথও একই মত সমর্থন করেছেন। অর্থাৎ তারা অধিকাংশই সুবর্ণবণিক ছিলেন।[৬]

পরবর্তীকালে ইংরেজ বণিকদের আগমনে এই সুযোগ আরও সম্প্রসারিত হয়। ফলে সুবর্ণবণিকরা ইতোমধ্যে কলকাতা, হুগলি ও চুঁচুড়া ইত্যাদি নদীবন্দর ও ব্যবসা কেন্দ্রগুলোতে ছিল সুপ্রতিষ্ঠিত।

পশ্চিমবঙ্গে সুবর্ণবণিকদের অধিকতর উপস্থিতি ইংরেজ আমলে তাদের অনুকূলে কাজ করে। এই সময়ের প্রথমদিকে কলকাতার বেশ কয়েকজন সফল সুবর্ণবণিক ব্যবসায়ীর আবির্ভাব-এর প্রমাণ। এর মধ্যে মতিলাল শীল (১৭৯২-১৮৫৪), নকুড় ধর ও কলকাতার কলেজ স্ট্রিটের মল্লিক পরিবার উল্লেখযোগ্য। এদের পদচারণায় কলকাতার সাধারণ ব্যবসা-বাণিজ্য ব্যাংক ব্যবসারও বাণিজ্যিক পুঁজিতে নতুন সম্ভাবনার সৃষ্টি হয়।

অপরদিকে ঢাকার পোদ্দাররাই (সুবর্ণবণিক, সাহা, বসাক ব্যবসায়ী) ছিল সনাতনীভাবে টাকা বিনিয়োগকারী কিন্তু উনিশ শতকে তারা তাদের কারবার অর্থ-লগ্নীতে রূপান্তরিত করে। তখন থেকে এরাই শহরের সকল কারিগর বা নির্মাণকারীদের মূলধন সরবরাহ করতে থাকে।[৭]

তবে প্রাক-ব্রিটিশ পর্বে বাংলার বিখ্যাত যে একটি অবাঙালি ব্যাংকার পরিবার ছিল তার আলোচনা না করলে ঢাকার ব্যাংক ব্যবসার আলোচনা অসম্পূর্ণ থেকে যায়— সেটি হচ্ছে জগৎশেঠ পরিবার।

জগৎশেঠ পরিবার প্রথমাবস্থায় ঋণ যোগান অথবা সুদের ব্যবসার মাধ্যমে ধনবান হয়। ঋণ যোগান ব্যবসার এক পর্যায়ে তারা নিয়োজিত হন মুদ্রা বিনিময় ও হুণ্ডি-ব্যবসায়। প্রধানত মুদ্রা বিনিময় ব্যবসাতেই তাদের ভাগ্য ফেরে। মুদ্রা বিনিময়ে তারা এমন সুনাম অর্জন করে যে, তাদেরকে তখনকার দিনে এ অঞ্চলের সবচেয়ে বড় মানিচেঞ্জার বলা হতো। মানিচেঞ্জ ব্যবসাতে নিচের স্তরে নিয়োজিত ছিল শ্রফ নামীয় ব্যবসায়ীরা। এই অঞ্চলের সকল শ্রফরাই ছিল জগৎশেঠদের নিয়ন্ত্রাণাধীন। তাদের সাহায্য সমর্থন ও সহযোগিতা ছাড়া কোনো শ্রফের পক্ষেই মুদ্রা বিনিময় ব্যবসায় নিয়োজিত থাকা সম্ভবপর ছিল না। বিনিময় ব্যবসা ও ঋণ যোগান ব্যবসার জন্য তাদের নেটওয়ার্ক ছিল সারা ভারতে। কার্যালয় ছিল দিল্লি, ঢাকা, মুর্শিদাবাদ, চুঁচুড়া, কলকাতা, হুগলি ও পাটনায়। শাখাগুলো চলত নিম্নলিখিত নামে —

১. মুর্শিদাবাদ (প্রধান অফিস)-মানিক চাঁদজি, আনন্দ চাঁদজি
২. ঢাকা - শেঠ মানিক চাঁদ, জগৎশেঠ ফতেহ চাঁদজি
৩. পাটনা– মানিক চাঁদজি, দয়া চাঁদজি
৪. চুঁচুড়া – ফতেহ চাঁদ, আনন্দ চাঁদজি

শুধু মুদ্রা বিনিময়, হুণ্ডি ও অর্থযোগানেই তারা ব্যাপৃত ছিল না, বিদেশ থেকে আসা সোনা রূপার একচেটিয়া ক্রেতাও ছিল জগৎশেঠ পরিবার। ব্যবসাতে ধনবান হয়ে এক পর্যায়ে বস্তুত তারা সরকারি ব্যাংকে পরিণত হয়। সরকারের সকল রাজস্ব তাদের কোষাগারে জমা

হতো। তারা প্রয়োজনে এই টাকা তুলে নিতেন। আবার প্রয়োজন পড়লে নবাবরা জগৎশেঠদের কাছ থেকে ধারও নিতেন। নবাবদের প্রেরিতব্য টাকাও তারা দিল্লিতে পাঠানোর ব্যবস্থা করতেন। সরকারের কোষাগার হিসেবে কাজ করার পাশাপাশি তারা ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ও কোম্পানির কর্মচারীদের নিজস্ব ব্যবসাতেও ঋণ যোগান দিতেন। একটি হিসাবে দেখা যায় ১৭১৮-৩০ সালের দিকে ইংরেজরা জগৎশেঠদের একমাত্র মুর্শিদাবাদ কুঠি থেকেই বাৎসরিক গড়ে ৪ লক্ষ মুদ্রা ধার নিত।

বস্তুত তারা পূর্বভারতে সকল বাণিজ্যিক ঋণের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে ওঠেন। নবাবদের সহযোগিতায় তারা এই অঞ্চলে এক অপ্রতিদ্বন্দ্বী ব্যাংকিং প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়। ঢাকা শহরেও এই সময় তাদের ব্যাংক ছিল, যা আমলিগোলার বাসিন্দা নাজির হোসেন বলেন, মুঘল আমলের আমির ওমরাহরা এ অঞ্চল ছেড়ে গেলে কিছু হিন্দু ব্যবসায়ী এখানে বসবাস শুরু করে। বাংলার বিখ্যাত ব্যাংকার জগৎশেঠের ব্যাংক ছিল (অন্তত ১৮৪০ সাল পর্যন্ত) আমলিগোলার পূর্বে। ব্যাংকের পাশে ছিল একটি মঠ ও একটি পুকুর। তিনি আরো উল্লেখ করেন, এই শতকের (বিশ) গোড়ার দিকে তাঁদের ছেলেবেলায় তারা শুনেছেন ব্যাংক ভবন অঞ্চলটি পরিচিত ছিল শেঠের ঘাট নামে।[৮]

সুতরাং মুঘল ও প্রাক ব্রিটিশ আমলে তারা ঢাকার অন্যতম ব্যাংক ব্যবসায়ী ছিলেন। যদিও আধুনিক ব্যাংক বলতে যা বোঝাত তা ঐ সময় তখনও গড়ে ওঠেনি। তথাপি তারা ভারতের অন্যান্য অঞ্চলে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখলেও ঢাকার ক্ষেত্রে তাদের ভূমিকা ছিল না। তাছাড়া তাদের ঢাকার ব্যাংক ব্যবসার উপর কোনো উল্লেখযোগ্য তথ্য পাওয়া যায়নি।

জগৎশেঠ পরিবারের পর ব্যাংক ব্যবসায় আস্তে আস্তে সামনে চলে আসে শ্রফ ও পোদ্দার পদবীর অবাঙালি বণিক ও বাঙালি বণিকগণ। উনিশ শতকের প্রথম দিকে বড় বড় ব্যাংকাররা ঢাকা থেকে তাদের কারবার গুটিয়ে ফেলে। ১৮৩০ সাল মাত্র ৩২টি ছোট ধরনের শ্রফ ছিল।[৯] এই সময় ব্যবসা-বাণিজ্যে বিনিয়োগ করার মতো মূলধন ঢাকায় খুব সামান্য ছিল।

যে সকল পোদ্দার ও মহাজন ১৮৪০-এর দশকে ঢাকায় তাদের কারবার চালিয়ে যাচ্ছিল তারা মোটেও কোনো বড় ধরনের ব্যাংকার বা অর্থ বিনিয়োগকারী ছিল না। কেননা টেলর উল্লেখ করেন যে, ঢাকার পোদ্দারদের কারবার বর্তমানে কলকাতা, পাটনা, মুর্শিদাবাদ বেনারস, সিলেট এবং মির্জাপুরে কেবল হুণ্ডি ব্যবসার মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। এছাড়া কলকাতা থেকে হ্যান্ডনোটের উপর ভিত্তি করে স্থানীয় নীলকরদের তারা টাকা ধার দিত। বাড়ি, ঘর, জমি, গহনা, সোনা-রূপার জিনিসপত্র ইত্যাদি বন্ধক রেখেও তারা স্থানীয়দের টাকা ধার দিত। এদের মধ্যে কেউ কেউ কলকাতা থেকে বিলেতি সুতা কিনে এনে স্থানীয় তাঁতিদের কাছে বিক্রি করত। শরীফ উদ্দিন আহমেদ আরো উল্লেখ করেন যে, "পোদ্দাররাই উনিশ শতকে ঢাকার প্রধান ব্যাংকার হয়ে ওঠেন এবং স্থানীয় বড় বড় ব্যবসায়ীদের চাহিদা মাফিক তাদের মূলধন যোগান দেন। ক্ষুদে কড়ির ব্যবসায়ী থেকে লক্ষপতি বনে যাওয়া ঢাকার ফরাসগঞ্জের দাস পরিবারের ব্যবসায়িক সফলতা ছিল উনিশ শতকে ঢাকার সবচেয়ে সফল

বাণিজ্যিক কাহিনী। মজার ব্যাপার এদের উত্থান কিন্তু ঢাকার মন্দার যুগেই, উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের অর্থনৈতিক পুনরুজ্জীবনের সময়ে নয়।"[১০]

ফরাসগঞ্জের এই দাস পরিবারের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন মথুরানাথ পোদ্দার। মথুরানাথের মূল ব্যবসা ছিল বাজার করতে আসা লোকদের টাকা ভাঙিয়ে দেওয়া—যা দিয়ে তারা কেনাকাটা করত। পরবর্তীতে তিনি মুদ্রা ভাঙানোর ব্যবসা পুরোপুরি ছেড়ে দিয়ে লগ্নী আর হুণ্ডির কারবারে নামেন। এছাড়া হ্যান্ডনোট ভাঙানোর কাজও শুরু করেন। এই নতুন কর্মকাণ্ডের দরুন তিনি সনাতনীভাবে একজন ব্যাংকার হয়ে ওঠেন।

মথুরা নাথের মৃত্যুর পর তার দুই পুত্র স্বরূপচন্দ্র দাস এবং মধুসূদন দাস তাদের পৈত্রিক ব্যবসা চালিয়ে যেতে থাকেন। তাদের নেতৃত্বে পারিবারিক ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান 'স্বরূপ চন্দ্র মধুসূদন পোদ্দার হাউজ' ঢাকার সবচেয়ে বড় স্থানীয় ব্যাংকিং প্রতিষ্ঠান হিসেবে বেড়ে ওঠে।

১৮৪৬ সালে ঢাকার কিছু ইউরোপীয় নীলকর ব্যবসায়ী ও ভূ-স্বামী কয়েকজন ব্রিটিশ উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মকর্তা এবং কয়েকজন দেশীয় জমিদার যৌথ সংঘ স্থাপন করে একটি ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করে— যার নাম দেয়া হয় 'ঢাকা ব্যাংক' (The Dacca Bank)। এটিই ছিল ঢাকার সর্বপ্রথম আধুনিক ব্যাংক আর স্থানীয় সনাতনী লগ্নীকারীদের প্রথম প্রতিযোগী। ১৮৫৬ সালের জুন মাসে ঢাকা ব্যাংক গুটিয়ে ফেলা হলে ব্যাংকের বেশ কিছু শেয়ার হোল্ডার যারা ঢাকায় থাকতেন তারা বিপর্যয় কাটিয়ে পুরানো ব্যাংকেরই কাগজপত্র কিনে নিয়ে একই নামে আরেকটি ব্যাংক খোলার পরিকল্পনা করে। এরপরই ১৮৬২ সালে ব্যাংক অব বেঙ্গলের শাখা ঢাকায় স্থাপিত হয়। এই ব্যাংক মূলত ঢাকা ব্যাংককে কিনে নেয়।

উনিশ শতকে ঢাকায় একটি পূর্ণাঙ্গ ব্যাংক গড়ে উঠলেও তা শেষ পর্যন্ত টিকে থাকেনি এবং পরবর্তীকালে এটি ব্যাংক অব বেঙ্গলের শাখা খোলার মাধ্যমে ব্যাংকিং সেক্টরে এক নতুন প্রতিযোগিতা শুরু হয়। এই ব্যাংকের মাধ্যমে পূর্ববাংলা তথা ঢাকার ব্যবসা-বাণিজ্য বা অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড পরিচালিত হতো।

বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ অবিভক্ত বাংলা তথা ভারতীয় ব্যাংকিং-এর ক্ষেত্রে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এই সময়ে যেমন একের পর এক কয়েকটি রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বড় ঘটনা ঘটে, তেমনি পাশাপাশি ঘটে নতুন নতুন ব্যাংকের জন্ম ও বিলুপ্তি। আধুনিক ব্যাংক প্রতিষ্ঠার এই জোয়ার থেকে সাবেক পূর্ববাংলাও পিছিয়ে ছিল না। পূর্ববাংলার উদ্যোক্তারা এগিয়ে আসেন। দেখা যায় বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে বাঙালির উদ্যোগে অবিভক্ত বাংলায় বেশ কয়েকটি আধুনিক ব্যাংক গড়ে ওঠে। প্রধান প্রধান এই ব্যাংকগুলো হচ্ছে: (১) কুমিল্লা ব্যাংকিং কর্পোরেশন (১৯১৪); (২) নিউ স্ট্যান্ডার্ড ব্যাংক; (৩) কুমিল্লা ইউনিয়ন ব্যাংক (১৯২২); (৪) পাইওনিয়ার ব্যাংক (১৯২২); (৫) বেঙ্গল সেন্ট্রাল ব্যাংক (১৯১৮); (৬) হুগলি ব্যাংক (১৯৩২); (৭) নাথ ব্যাংক (১৯৩২); (৮) ইসলামাবাদ টাউন ব্যাংক অব চিটাগাং; (৯) কমরেড ব্যাংক; এবং (১০) ইন্ডিয়ান ক্রিসেন্ট ব্যাংক।

বাণিজ্যিক ব্যাংকের পাশাপাশি দেশভাগের পূর্বে (১৯৪৭) বাঙালির উদ্যোগে একটি শিল্প ব্যাংকও প্রতিষ্ঠিত হয়। 'ইউনাইটেড ইন্ডাস্ট্রিয়াল ব্যাংক' নামে ঢাকা জেলার ভাগ্যকুলের

ব্যবসায়ী বংশের যদুনাথ রায় ১৯৪০ সালে একটি ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করেন। এ ব্যাংকের প্রথম পরিচালনা বোর্ডে ছিলেন যদুনাথ রায়ের আত্মীয় প্রিয়নাথ রায় এবং কুমার রমেন্দ্রনাথ রায়, কলকাতার প্রসিদ্ধ লাহা পরিবারের ড. সত্যচরণ লাহা ও বিখ্যাত বীমা ব্যবসায়ী অবিনাশচন্দ্র সেন। বাঙালির উদ্যোগে এই সময় (দেশভাগের পূর্বে) আরো কয়েকটি ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয়। এগুলির কোনোটিই ঢাকায় প্রতিষ্ঠিত হয়নি। ঢাকায় এসব ব্যাংকের শাখা ছিল কিনা তাও জানা যায়নি। ব্যাংকগুলো হলো: (১) ব্যাংকারস ইউনিয়ন ব্যাংক; (২) প্রবর্তক ব্যাংক; (৩) ব্যাংক অব বাকুড়া; ও (৪) মেট্রোপলিটন ব্যাংক।[১১] আর এম. দেবনাথ উল্লেখ করেন যে, এগুলোর তথ্য থেকে প্রতীয়মান হয় যে, ব্যাংকগুলো ১৯৪৭ সালের পূর্বেই প্রতিষ্ঠিত হয়।

আবার ১৯৩০-এর দশকে ঢাকায় ত্রিপুরা ব্যাংকের শাখা গঠনের উদ্যোগ নেওয়া হয় যা *ঢাকা প্রকাশে* উল্লেখ করা হয়:

> ত্রিপুরা রাজ্যে ব্যাংকিং কার্য দিন দিনই প্রসার লাভ করিতেছে। স্থানীয় 'দি এসোসিয়েটেড ব্যাংক ত্রিপুরা লি.' গত ৯ জুলাই কৈলাসহরের বিভাগ অন্তর্গত কমলপুর নামক স্থানে একটি সাব অফিস খুলিয়াছেন। এই অনুষ্ঠানে কৈলাসহরের দ্বিতীয় বিভাগীয় কার্যকারক শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রলাল গাঙ্গুলী, বি. এল. মহাশয় সভাপতিত্ব করেন। তিনি রাজ্য মধ্যে ব্যাংকিং-এর প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা প্রদান করেন। স্থানীয় ব্যবসায়ীবর্গের বিশেষত বনজ বস্তু ব্যবসায়িকবর্গের পক্ষে এই ব্যাংকের অফিসটি কত সাহায্যকারী হইবে তাহাও তিনি বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেন। স্থানীয় বহু লোক এবং চা-বাগানের সত্ত্বাধিকারিগণ এই অনুষ্ঠানে যোগদান করেন এবং কৈলাসহর ব্যাংকের এজেন্ট ভার এস. এন. ঘোষ মহাশয় বিশেষ যত্ন সহকারে সকলকে আপ্যায়ন করেন এবং জলযোগে পরিতুষ্ট করেন। এই ব্যাংকের অপরাপর অফিস নিম্নলিখিত স্থানে আছে, ঢাকা, শ্রীমঙ্গল, সমসের নগর, কৈলাসহর, আগরতলা, ভানুগঞ্জ গঙ্গাসাগর।[১২]

১৯৩৫ সালে ঢাকায় ফেডারেল ব্যাংকের কার্যালয় প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নেওয়া হয়। এই কার্যালয় প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে *ঢাকা প্রকাশে* উল্লেখ করা হয়: "গত ২৭শে নভেম্বর বুধবার ঢাকা ফেডারেল ব্যাংক লিমিটেড-এর কার্যালয় প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে ৩নং জনসন রোডে স্থানীয় বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি আমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। আমরা আশা করি পরিচালকগণের কর্তব্যনিষ্ঠায় ফেডারেল ব্যাংক জনসাধারণের প্রীতি সম্পাদনে সমর্থ হইবে।"[১৩]

১৯৪৩ সালে ঢাকায় আরো একটি ব্যাংকের শাখা খোলা হয়। তাহলো 'বিক্রমপুর ব্যাংক'। এই ব্যাংক সম্পর্কে *ঢাকা প্রকাশে* উল্লেখ করা হয়:

> মুন্সীগঞ্জের খ্যাতনামা উকিল শ্রীযুক্ত অম্বিকাচরণ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র ভট্টাচার্য মহাশয়দ্বয়ের উদ্যোগেও তত্রব্য সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিবর্গের সহানুভূতিতে তথায় ব্যবসায়ে অর্থবিনিয়োগের সুবিধানকল্পে দুই বৎসর পূর্বে বিক্রমপুর ব্যাংক নামে যে প্রতিষ্ঠান গঠিত হইয়াছে, গত বুধবার অপরাহ্ন ৬টার সময় ঢাকেশ্বরী কটন মিলের সুযোগ্য ম্যানেজিং ডিরেক্টর শ্রীযুক্ত সূর্যকুমার বসু মহোদয়, সমবেত বিক্রমপুরবাসিগণের অনুমোদনমতে, এ শহরের কোর্ট হাউজ স্ট্রিটস্থ ২৫ নং ভবনে, সেই ব্যাংকের ঢাকা-শাখার উদ্বোধন-কার্য সম্পাদন করিয়াছেন। সভারম্ভে ব্যাংকের ম্যানেজিং ডিরেক্টররূপে অম্বিকাবাবু সভাপতি ও সম্মিলিত সভ্যগণকে সাদর সম্ভাষণ জ্ঞাপন করিয়াছেন। তাহাতে জানা যায় কতিপয় বৎসর পূর্বে অম্বিকাবাবু ও সতীশ বাবুর যত্নে মুন্সীগঞ্জে এক লোন অফিস বা মহাজনী ব্যবসায় স্থাপিত এবং ক্রমে উহার এরূপ উন্নতি সাধিত হইয়াছিল

> যে, কর্তৃপক্ষ শতকরা ৫০ টাকা পর্যন্ত ডিভিডেন্ড বা লভ্যাংশ বিতরণ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, কিন্তু পরে আইনের কঠোর বিধানের অনুরূপ কার্যপরিচালন সুবিধাজনক না হওয়াতে দুই বৎসরের কিছু অধিককাল যাবত ঐ লোন অফিস ব্যাংকে পরিবর্তিত ও বিক্রমপুর ব্যাংক নামে অভিহিত হইয়াছে...।[১৪]

দেশভাগের আগে বাঙালির ব্যাংক ব্যবসা জমে উঠলেও ব্যাংক প্রতিষ্ঠার এই পর্ব শুরু হয় স্বদেশী আন্দোলনের (১৯০৬) সূত্র ধরে। স্বদেশী আন্দোলনের ডাক ছিল স্বদেশী পণ্য বর্জন ও স্বদেশী সবকিছু গ্রহণ। এর ফলে শুধু ব্যাংক নয়, গড়ে ওঠে প্রচুর সংখ্যক দেশীয় শিল্প। কিন্তু নানা কারণে বিঘ্নিত হয়। প্রথম বিঘ্নটি ঘটে কোম্পানি আইন থেকে। তাই কোম্পানি পরিচালনার সমস্যা নিরসনে ১৯১৩ সালে 'কোম্পানিজ এ্যাক্ট' পুনর্বিন্যাসিত করা হয়। এতে বেশ কিছু সমস্যার সমাধান হয়। কিন্তু ১৯১৪-১৯ সাল ব্যাপী সংঘটিত প্রথম বিশ্বযুদ্ধ সবকিছু তছনছ করে দেয়। তারপর ১৯২৯-৩০ সালের দিকে দেখা দেয় অর্থনৈতিক মন্দা। মন্দার পর ব্যাংকিং সমস্যা সামাল দিতে ১৯৩৫ সালে গঠিত হয় ভারতীয় কেন্দ্রীয় ব্যাংক। চার বছর পর শুরু হয় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ (১৯৩৯-৪৫)। বিশ্বযুদ্ধ শেষ হতে না হতেই ১৯৪৬ সালে সংঘটিত হয় ভয়াবহ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা। ১৯৪৭ সালে ঘটে দেশভাগ। একের পর এক ধরনের দুর্যোগের কারণে প্রচুর সংখ্যক ব্যাংক বন্ধ হয়। ড. আর এম. দেবনাথ উল্লেখ করেন যে, ১৯১৩-১৭ সালের মধ্যে অবিভক্ত ভারতে ৭৮টি ব্যাংক বন্ধ হয়। এরপর ১৯২২-৩২ সালের মধ্যে বন্ধ হয় ৩৭৩টি ব্যাংক। ১৯৩৭-৪৮ সালের মধ্যে বন্ধ হয় ৬২০টি।[১৫] তবে এসব ব্যাংকের বেশির ভাগই ছিল ঢাকার বাইরে।

ব্যাংক বন্ধের উপরুক্ত কারণগুলো ছাড়াও অন্যান্য যেসব কারণ ছিল তা হলো: কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নিয়ন্ত্রণের অভাব, উপযুক্ত আইন কাঠামোর অনুপস্থিতি, সরকারি নিয়ন্ত্রণের অনুপস্থিতি, ব্যাংকগুলোর অল্প মূলধনভিত্তি, অসীম দায়সংবলিত ব্যাংক ব্যবস্থা, বিনিয়োগের ক্ষেত্রাভাব, ফটকাবাজীতে টাকা বিনিয়োগ, সমন্বিত নীতিমালার অভাব এবং ব্যাংকের মালিক ও কর্মচারীদের অসততা, জালিয়াতি ও টাকা আত্মসাৎ ইত্যাদি।

সুতরাং, স্বাধীনতার পূর্বে ঢাকায় কোনো বাণিজ্যিক ব্যাংক ছিল না। 'দি ইম্পেরিয়াল ব্যাংক অব ইন্ডিয়া' বা পরবর্তীতে সেই ব্যাংক, 'ব্যাংক অব ইন্ডিয়া' নাম ধারণ করে ট্রেজারি এবং সরকারি অন্যান্য কার্য পরিচালনা করত। ঋণদানকারী কোম্পানি 'দি ইউনিয়ন ব্যাংক' এই জাতীয় অন্যান্য কলকাতা ব্যাংকের শাখা ছিল। যারা মূল্যবান স্বর্ণালংকার অথবা জমি-জমা সম্পত্তির বিপরীতে ঋণ প্রদান করত। ঢাকার ব্যবসা-বাণিজ্য অভ্যন্তরীণ হওয়াতে কোনো বাণিজ্যিক ব্যাংক পরিচিত ছিল না এবং দরকারও ছিল না। নারায়ণগঞ্জ, মিরকাদিম, কমলাঘাট, নরসিংদী, বাবুরহাট, ঝিটকা, ধামরাই, এবং জেলার প্রত্যন্ত অঞ্চলে অন্যান্য মোকাম ছিল মুখ্য ব্যবসা কেন্দ্র এবং ঢাকার বাণিজ্য কলকাতার সঙ্গে সম্পৃক্ত ছিল।

যাহোক দেশভাগের পর পূর্বাঞ্চলকে তার নিজের পায়ে দাঁড়ানোর প্রয়োজন ছিল। ব্যাংকের ছিল নিজস্ব আমদানি রপ্তানি ব্যবসার ভার। কলকাতার প্রতিষ্ঠান ও ব্যাংকগুলো কাজ বন্ধ করে দিলে কোনো সাহায্য পাওয়া যায়নি। কাজেই বড় রকমের শূন্যতা পূরণ করার প্রয়োজন দেখা দেয়। কিন্তু হাতে সময় ছিল কম। বলা বাহুল্য, যে শূন্যতা সৃষ্টি হয় তা বাঙালি মুসলমান পূরণ করতে পারেনি। এর অনেক কারণ ছিল:

> প্রথমত, সমতল সমাজ হওয়ায় বাঙালি মুসলমান সমাজে ব্যবসায়ী বলে কোনো সম্প্রদায় ছিল না। অধিকন্তু ছিল ব্যবসায়িক কর্মকাণ্ডে অভিজ্ঞতার অভাব। এ কারণে দেখা যায় পুরো ব্রিটিশ আমলে (১৭৫৭-১৯৪৭) ব্যবসা-বাণিজ্যের জগতে বাঙালি মুসলমান প্রায় অনুপস্থিত। তারা নিয়োজিত ছিল মূলত কৃষিকাজে। এমতাবস্থায় পাকিস্তান সৃষ্টির পর নতুন সম্ভাবনা দেখা দিলেও তারা এ সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে পারেনি। শিক্ষার অভাব, চাকরি সূত্রে প্রাপ্ত অভিজ্ঞতার অনুপস্থিতি, পুঁজির অভাব, কৃষি থেকে উদ্বৃত্ত সংগ্রহে অপরাগতা ও প্রশাসনিক অভিজ্ঞতার অভাব ইত্যাদি এর প্রধান কারণ।[১৬]

এ অবস্থায় ভারতবর্ষ যখন পাকিস্তান ও ভারত নামে দুটো দেশে রূপান্তরিত হয়, তখন বাঙালি মুসলমান সম্পূর্ণ অপ্রস্তুত অবস্থায় পড়ে। এই সুযোগে শূন্যতা পূরণে এগিয়ে আসে ভারত থেকে শরণার্থী হিসেবে আগত অবাঙালি মুসলমান। তারাই পাকিস্তান আমলে ব্যবসা ও শিল্পে পূর্ব পাকিস্তান তথা সারা পাকিস্তানে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে।

পাকিস্তান আমলের বাণিজ্যিক ব্যাংককে দুটো ভাগে ভাগ করা যায়: (১) তফসিলি বা scheduled banks, (২) অ-তফসিলি (Non scheduled banks)। একটি রিপোর্টে তফসিলি ব্যাংকের সংজ্ঞা দেওয়া হয় এভাবে: A scheduled bank is a bank having paid up capital and reserve of Rs. 5 lakhs or more and declared to be a scheduled bank under section 37(3)(a) of the state Bank of Pakistan Act, 1956.[১৭]

স্বাধীনতার পূর্বে অবিভক্ত ভারতের তফসিলি ব্যাংক ও অ-তফসিলি ব্যাংকের শাখা সংখ্যা সমান ছিল। পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত এলাকায় অ-তফসিলি ব্যাংকের শাখার সংখ্যা তফসিলি বা সিডিউল ব্যাংকের শাখার চেয়ে বেশি ছিল। ব্যাংক ব্যবসার ক্ষেত্রে অ-তফসিলি ব্যাংকের মাধ্যমে যে ঋণ ডিপজিট প্রদান করা হতো তার পরিমাণ ছিল সামান্য। সংখ্যা দেখে সহজে বোঝা যায় যে, অ-তফসিলি ব্যাংকের গুরুত্ব ক্রমশ হ্রাস পায় এবং এগুলোর সংখ্যা ১৯৪৭ সালে ৭০৪টি থেকে ক্রমশ হ্রাস পেয়ে ১৯৬৩ সালের দিকে ৪৯ টিতে দাঁড়ায়।[১৮]

অন্যদিকে পাকিস্তানি আমলে তফসিলি ব্যাংকের গুরুত্ব বৃদ্ধি পায়। স্বাধীনতার সময়ে ২টি ব্যাংকের বিপরীতে ১৯৬৩ সালের দিকে তাদের সংখ্যা দাঁড়ায় ১৫।[১৯]

একটি রিপোর্টে ১৯৬৩ সালের ব্যাংকের অগ্রগতি সম্পর্কে জানা যায় যে, ১৯৬২ সালের শেষের দিকে ৩৫টি ব্যাংকের বিপরীতে ১৯৬৩ সালের শেষের দিকে তফসিলি ব্যাংকের সংখ্যা দাঁড়ায় ৩৬। এই সময় আরো কয়েকটি নতুন ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয়। The Standard Bank Ltd.; The Commerce Bank Ltd.; and The Standard Co-operative Bank সম্পর্কে বলা হয় যে, The Standard Co-operative Bank Ltd. which was scheduled on August 25, 1962 was descheduled with effect from July 8, 1963.[২০]

অন্যদিকে তফসিলি ব্যাংকের শাখার সংখ্যা ক্রমশ বাড়তে থাকে। ১৯৬২ সালে-এর সংখ্যা ৮৩১টি থেকে ১৯৬৩ সালে ১১৩০টি দাঁড়ায়। এই ১১৩০টি শাখার মধ্যে ৩৬২টি পূর্ব পাকিস্তানে এবং ৭৬৮টি পশ্চিম পাকিস্তানে অবস্থিত। যেখানে ১৯৬২ সালে ছিল যথাক্রমে পূর্ব পাকিস্তানে ২৫৩টি এবং পশ্চিম পাকিস্তানে ৫৭৮টি।

তফসিলি ব্যাংকের মূলধনের পরিমাণ সম্পর্কে উল্লেখ করা হয়: "The paid up capital and reserves of Pakistani scheduled bank showed marked increase from Rs. 20.85 crores and Rs. 8 crores at the end of 1962 to Rs. 22.73 crores and Rs. 8.56 crores resepectively at the end of 1963."[২১]

১৯৪৭ সালে পাকিস্তান সৃষ্টির প্রাক্কালে দেশে আধুনিক ব্যাংক ছিল মাত্র একটি। এর নাম অস্ট্রেলেশিয়া ব্যাংক। এই ব্যাংকটি ছিল পাকিস্তান ভিত্তিক। দেশভাগের পর প্রথম ব্যাংক ছিল স্টেট ব্যাংক অব পাকিস্তান এবং পরবর্তী ব্যাংক ছিল ন্যাশনাল ব্যাংক অব পাকিস্তান।

রিজার্ভ ব্যাংক অফ ইন্ডিয়ার উত্তরাধিকারসূত্রে স্টেট ব্যাংক অব পাকিস্তানের কার্যালয় করাচিতে স্থাপিত হয় ১৯৪৭ সালের ১৫ আগস্ট। ১৬৬ জন কর্মচারী এবং নিম্নবর্ণিত বিভাগ নিয়ে স্টেট ব্যাংক অব পাকিস্তান গঠিত হয়। এগুলো:

১. ইস্যু বিভাগ (Issue Department);
২. ডিপজিট একাউন্ট বিভাগ (Deposit Accounts Department); এবং
৩. এক্সচেইঞ্জ কনট্রোল বিভাগ (Exchange Control Department)।

পাকিস্তানের উভয় অংশে তথা পূর্ব ও পশ্চিম অংশে ব্যাংকের কেন্দ্রীয় দপ্তরের নয়টি অফিস ছিল। এর মধ্যে তিনটি পূর্ব পাকিস্তানে এবং ৬টি পশ্চিম পাকিস্তানে। কেন্দ্রীয় পরিদপ্তরের অধীনে ব্যাংকের কার্যক্রম পরিচালিত হতো।

১৯৪৮ সালের জানুয়ারী মাসে করাচিতে পাবলিক ডেট অফিস (Public Debt Office) স্থাপন করা হয়। ১৯৪৮ সালের এপ্রিলে করাচিতে 'The Public Accounts Department' খোলা হয়।[২২]

উপরে উল্লিখিত বিভাগ ছাড়াও অন্যান্য বিভাগ স্থাপন করা হয়। সুতরাং, স্টেট ব্যাংক অব পাকিস্তান নিম্ন বর্ণিত বিভাগ নিয়ে গঠিত ছিল:[২৩]

1. Chief Accounts Department
2. Secretary's Department
3. Establishment Department
4. Inspection Department.

Inspection Department আবার ৩টি ভাগে বিভক্ত ছিল:

a. Inspection Division
b. Organisation and Methods Division
c. Audit Division.

এই বিভাগের কাজ অনেক ব্যাপক ছিল যা State Bank of Pakistan -এ উল্লেখ করা হয় এভাবে:

a. Supervision and control of commercial banks with a view to developing a sound and healthy banking system.
b. Execution of Credit Control Policies so far as they concern credit institutions particularly commercial banks.

c. Promotion of banking and credit facilities in the country.
d. Dealing with loan applications from banks and requests of Government for grant of counter finance facilities to banks to meet Government's special requirements.

উল্লেখ্য এই বিভাগ (Banking Control Department) উপরের দায়িত্ব নিম্নলিখিত বিধিবদ্ধ আইনের মাধ্যমে সম্পাদন করত:[২৪]

a. State Bank of Pakistan Act, 1956.
b. Banking Companies (Control) Act, 1948.
c. Banking Companies (Restriction of Branches) Act, 1946.
d. Banking Companies (Inspection) Ordinance, 1946.
e. Capital Issues (Continuance of control) Act, 1947.
f. Part XA of the Companies Act, 1913.
g. Banking Companies (Control) Rules, 1949.
h. State Bank of Pakistan Scheduled Banks Regulations.

আরো যে সব বিভাগগুলো ছিল:[২৫]

i) Exchange Control Department
ii) Agricultural Credit Department
iii) Department of Statistics
iv) Research Department.
v) Engineering Department.

এখন দেখা যাক ঢাকায় স্টেট ব্যাংক অব পাকিস্তানের কার্যক্রম কী ছিল: স্বাধীনতার পূর্বে পাকিস্তানে 'রিজার্ভ ব্যাংক অব ইন্ডিয়ার' কোনো শাখা ছিল না। কলকাতা রিজার্ভ ব্যাংক অব ইন্ডিয়ার মাধ্যমে এই অঞ্চলে সকল কেন্দ্রীয় কার্যক্রম পরিচালিত হতো। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পরে তৎকালীন সরকার ঢাকায় কেন্দ্রীয় ব্যাংকের তথা ব্যাংক অব ইন্ডিয়ার ১টি শাখা খোলার জন্য অনুরোধ করে। কিন্তু আবাসন, দক্ষ জনবল ও সংগঠনের তীব্র সমস্যা ছিল। এক সময় এই সমস্যা কাটিয়ে ওঠা সম্ভব হয়। ১৯৪৮ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে একটি শাখা উদ্বোধন করা হয়।

মাত্র দুটি বিভাগ নিয়ে পূর্ব পাকিস্তানে-এর কার্যক্রম শুরু হয়। বিভাগ দুটি হলো: 'দ্যা ডিপজিট একাউন্টস ডিপার্টমেন্ট' (The Deposits Accounts Department), দ্যা 'এক্সচেইঞ্জ কন্ট্রোল ডিপার্টমেন্ট' (The Exchange Control Department)।

এরপরই Public Debt Office স্থাপন করা হয়। তারপর The Issue Department এবং সবশেষে ১৯৪৮ সালে অক্টোবর মাসে The Public Account Department স্থাপন করে ব্যাংকিং-এর ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম সম্পূর্ণ করে। পূর্ব পাকিস্তানে ব্যাংক ব্যবস্থার সংস্কার এবং ব্যাংক ব্যবস্থায় উন্নয়নের জন্য ১৯৪৯ সালে ঢাকায় ব্যাংকিং কন্ট্রোল ডিপার্টমেন্ট (Banking Control Department) চালু হয়। পূর্ব পাকিস্তানে অর্থনৈতিক সমস্যার পর্যবেক্ষণের জন্য রিসার্চ এন্ড এগ্রিকালচারাল ক্রেডিট সেকশন (Research and Agricultural Credit Section) চালু করা হয়। ফলে পূর্ব পাকিস্তানে কৃষি ঋণ কার্যক্রম

পরিচালনা এবং এর বৃদ্ধির জন্য ১৯৬১ সালের জানুয়ারিতে ঢাকায় "দ্যা এগ্রিকালচারাল ডিপার্টমেন্ট (The Agricultural Department) স্থাপন করা হয়।

এছাড়া পূর্ব পাকিস্তান তথা ঢাকায় স্টেট ব্যাংক অব পাকিস্তানের কার্যক্রম সম্পর্কে আরো বলা হয়:[২৬]

> In order to eliminate delays involved in referring certain matters for decision to the Central Directorate of the Bank at Karachi and also to study economic problems of East Pakistan on the spot and suggest remedies, a Deputy Governor has been stationed at Dacca.

দেশে বাণিজ্যিক ব্যবসার উন্নয়নে ১৯৪৯ সালের নভেম্বরে 'ন্যাশনাল ব্যাংক অব পাকিস্তান' প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রতিষ্ঠাকালীন সময় এর মূলধনের পরিমাণ ছিল ৬০ মিলিয়ন রুপি। যার মধ্যে ২৫ মিলিয়ন রুপি কেন্দ্রীয় সরকার প্রদান করে। ব্যাংকটি তার সকল কার্যক্রমের পরিবেশ সফলভাবে স্থাপন করে। ১৯৫০ সালে ব্যাংকের ডিপজিটের পরিমাণ ছিল ৬৪.৪ মিলিয়ন রুপি, ১৯৫১ সালে ২০০.৮ মিলিয়ন রুপি এবং ১৯৫২ সালে ২৮৬.০ মিলিয়ন রুপি এবং ১৯৫৩ সালে ৩৪০.৩ মিলিয়ন রুপি বৃদ্ধি পায়। ১৯৫০-এর দশকে এ ব্যাংকের তিনটি বিদেশি শাখাসহ (জেদ্দা, কলকাতা এবং লন্ডন) ৬০টি শাখা ছিল।[২৭]

ন্যাশনাল ব্যাংক প্রতিষ্ঠার পর থেকে ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নতির জন্য স্বল্প মেয়াদি ঋণ সরবরাহ করা হতো। এছাড়া এই ব্যাংক দেশের অর্থকরী ফসল (পাট, সুতা) বাজারজাতকরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করত। এই বিষয়ে ১৯৬০-এর দশকের একটি রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়:

> The National Bank of Pakistan emerged as the saviour of the cotton trade when it was under the grip of crisis during 1950-51. The magnitute of the work done by the Bank can be Judged from the fact that during this period more than 75 per cent of the cotton finance of the country was provided by it. Today it is still the largest financier of Jute and Cotton in the country.[২৮]

১৯৫০ সালের ৪৭.৭ মিলিয়ন রুপি এবং ১৯৫১ সালের ২০৮.৯ মিলিয়ন রুপির তুলনায় ১৯৫২ সালে সবচেয়ে বেশি অগ্রিম প্রদান করা হয়। O. G. L. বাতিল করা সত্ত্বেও এই ব্যাংক আমদানিকৃত দ্রব্যের বিপরীতে সুবিধাজনক অন্য বস্তুর জন্য অগ্রিম প্রদান করে। ১৯৫৩ সালে যার পরিমাণ ছিল ২৪৪.৪ মিলিয়ন রুপি[২৯] [Despite the cancellation of the O.G.L. resulting in an appreciable fall in the demand for accommodation against imported goods, advances, granted by the Bank in 1953 amounted to Rs. 244.4 million]

১৯৫০-এর দশকে অর্থনৈতিক পর্যবেক্ষণে আরো উল্লেখ করা হয়:

> The Bank also finalized the Agency Agreement with the State Bank of Pakistan early this year and is now operating 20 currency chests and 5 sub-chests, thus making remittance facilities under the State Bank's Scheme available to the public.[৩০]

১৯৬২ সালের রিপোর্টে দেখা যায় যে, ঢাকা শহরে ন্যাশনাল ব্যাংক অব পাকিস্তানের ৪টি শাখা, ৫টি প্রধান অফিস (Principal Office) এবং ২টি উপ-শাখা (Sub-Branch) ছিল। এগুলো হলো:

সারণি-১

ন্যাশনাল ব্যাংক অব পাকিস্তান

ক্র.নং	প্রধান অফিস	শাখা	উপ-শাখা
১.	এয়ারপোর্ট, ঢাকা	আজিমপুর, ঢাকা	ক্যান্টমেন্ট, ঢাকা
২.	মিউনিসিপ্যালিটি, ঢাকা	চকবাজার, ঢাকা	মৌলভীবাজার, ঢাকা
৩.	পি.আই.ডি.সি, ঢাকা	পরীবাগ, ঢাকা	-
৪.	নিউ মার্কেট, ঢাকা	রমনা, ঢাকা	-
৫.	ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়	-	-

উৎস: *Banking Statistics of Pakistan* 1961-62, State Bank of Pakistan, pp. 115-122.

এছাড়া পাকিস্তান সৃষ্টির পর ১৯৪১ সালে বোম্বেতে প্রতিষ্ঠিত 'হাবিব ব্যাংক' তার প্রধান কার্যালয় পাকিস্তানের রাজধানী করাচিতে স্থানান্তরিত করে। তারপর ১৯৪৮ সালে আরো দুটো ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয়। উক্ত সালের সেপ্টেম্বরে প্রতিষ্ঠিত হয় 'মুসলিম কমার্শিয়াল ব্যাংক' এবং অক্টোবরে প্রতিষ্ঠিত হয় 'ব্যাংক অব ভাওয়ালপুর'।

১৯৬২ সালের রিপোর্টে দেখা যায় যে, হাবিব ব্যাংক ও মুসলিম কমার্শিয়াল ব্যাংকের শাখা ঢাকায় ছিল। ঢাকা শহরের যেসব জায়গায় এই দুটো ব্যাংকের শাখা ছিল:

হাবিব ব্যাংক লিঃ

ক. নবাবপুর রোড, ঢাকা;
খ. তেজগাঁও, ঢাকা;
গ. মৌলভীবাজার, ঢাকা;
ঘ. সদরঘাট, ঢাকা; এবং
ঙ. রমনা, ঢাকা

মুসলিম কর্মাশিয়াল ব্যাংক লিঃ

ক. মিটফোর্ট রোড, ঢাকা
খ. জনসন রোড, ঢাকা
গ. নিউমার্কেট, ঢাকা
ঘ. রমনা, ঢাকা*

এদিকে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার ১২ বছর পরেও পূর্ব পাকিস্তানভিত্তিক কোনো আধুনিক ব্যাংক গড়ে না ওঠায় অসন্তোষের সৃষ্টি হয়। ইতোমধ্যে ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন জোরদার

* উৎস: *Banking Statistics of Pakistan* 1961-62, Department Statistics, State of Pakistan, pp. 115-122.

হয়। ভাষার প্রতি বৈষম্যের পর অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বাঙালিদের উপেক্ষা করা হয়। এর প্রতিফলন ঘটে রাজনীতিতে। ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে শাসক দল মুসলিম লীগের ভরাডুবি হয়। এ প্রেক্ষাপটে আইয়ুব খানের সামরিক শাসন আসে ১৯৫৮ সালে। ইত্যবসরে সরকারি মহলে ধারণা সৃষ্টি হয় যে, পুঁজির অভাবে পূর্ব পাকিস্তানি উদ্যোক্তারা ব্যাংক গঠনে এগিয়ে আসতে পারছে না। তাই সিদ্ধান্ত হয় সরকারি উদ্যোগে এখানে শিল্প ও ব্যাংক ইত্যাদি সৃষ্টি করা। বলা হয় পুঁজি দিয়ে উদ্যোক্তা সৃষ্টি করা সম্ভব। এই প্রেক্ষাপটে পাকিস্তান আমলের মাঝামাঝি সময়ে (১৯৫৯) ব্যাংক ব্যবসায় বাঙালির আবির্ভাব হয়। প্রতিষ্ঠিত হয় 'ইস্টার্ন মার্কেন্টাইল ব্যাংক'। উল্লেখ্য ইস্টার্ন মার্কেন্টাইল ব্যাংক পুরোপুরি বাঙালি মালিকানাধীন ছিল না। এটি ছিল বাঙালি-অবাঙালির যৌথ উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত ব্যাংক। চট্টগ্রামে প্রধান কার্যালয় স্থাপন করে ব্যাংকটির যাত্রা শুরু হয় ১৯৫৯ সালের ১১ মে। পূর্ব পাকিস্তানে এটিই তফসিলি ব্যাংক। এই ব্যাংকের মূলধনে 'স্টেট ব্যাংক অব পাকিস্তান' অংশগ্রহণ করে। সরকারি সহযোগিতায় প্রতিষ্ঠিত 'ইস্টার্ন মার্কেন্টাইল ব্যাংক'-এর উদ্যোক্তাদের মধ্যে ছিলেন: (১) গ্রাহামস ট্রেডিং কোম্পানি (পাকিস্তান) লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও. আর. নিজাম; (২) এ. কে. খান এন্ড কোম্পানি লিমিটেডের পক্ষে শিল্পপতি এম. আর. সিদ্দিকী; (৩) চা ব্যবসায়ী খান বাহাদুর মুজিবুর রহমান; (৪) ব্যবসায়ী মির্জা মোহাম্মদ আলী ইস্পাহানী; (৫) বগুড়া কটন স্পিনিং কোম্পানি লিমিটেডের অংশীদার এবং ম্যানেজিং এজেন্ট ও শিল্পপতি হাবিবুর রহমান; এবং (৬) পাবনার ইস্ট পাকিস্তান ড্রাগস এন্ড কেমিক্যাল (এডরুক ল্যাবরেটরি)-এর ব্যবস্থাপনা অংশীদার এ. এইচ. খান। ব্যাংকটির অনুমোদিত মূলধন ছিল পঞ্চাশ লক্ষ টাকা, যা দশ টাকা মূল্যের পাঁচ লক্ষ শেয়ারে বিভক্ত ছিল। ছয়জন উদ্যোক্তার প্রত্যেকেই মূলধন হিসেবে দশ হাজার টাকা করে প্রদান করেন। সূচনা পর্বে ব্যাংকটিকে পঁচিশ লক্ষ টাকা মূলধন ইস্যু করার অনুমতি প্রদান করা হয়। ১৯৭০ সালে ইস্টার্ন মার্কেন্টাইল ব্যাংকের পরিশোধিত মূলধন ত্রিশলক্ষ পঁচিশ হাজার টাকায় উন্নীত হয়। ব্যাংকের পরিচালনা বোর্ডে সাতজন পরিচালক ছিলেন: (১) সাবেতুন রহমান; (২) ড. নঈমুর রহমান; (৩) এ. এফ. এম. নূরুল মতিন; (৪) আব্দুস সালাম; (৫) আলহাজ্ব মাজহারুল হক চৌধুরী; (৬) এস. এম. হোসেইন; এবং (৭) মঞ্জুরুর রহমান।

১৯৭০ সালে মার্কেন্টাইল ব্যাংকের শাখা সংখ্যা ১০৫টি এবং মোট আমানত ছিল ৩২ কোটি ৭০ লক্ষ টাকা।[৩১] উল্লেখ্য এই ব্যাংকের দুটি শাখা ঢাকা শহরে ছিল।

১৯৬০-এর দশকের গোড়াতে পশ্চিম পাকিস্তানে অনেক ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয়। এর মধ্যে একটি ব্যাংক ছিল ব্যতিক্রমধর্মী। এটি হচ্ছে 'ইউনাইটেড ব্যাংক লিমিটেড'। হাবিব ব্যাংক থেকে বেরিয়ে এসে আগা হাসান আবেদী নামীয় এক আগা খানি ব্যবসায়ী এটি প্রতিষ্ঠা করেন। পূর্ব পাকিস্তানি আমলা, রাজনৈতিক নেতা, ভূ-স্বামী ও প্রভাব প্রতিপত্তিশালী লোকদের সন্তান-সন্ততি ও পোষ্যদের তাঁর ব্যাংকে নিয়োগ দিয়ে তিনি পূর্ব পাকিস্তানে তাঁর ব্যাংকের কার্যাবলি কেন্দ্রীভূত করেন। শাখা স্থাপন করেন গ্রাম-গ্রামান্তরে। ঢাকা শহরে এই ব্যাংকের ৪টি শাখা ছিল:

১. ইমামগঞ্জ, ঢাকা;
২. রমনা, ঢাকা;

৩. নবাব রোড, ঢাকা; এবং
৪. সদরঘাট, ঢাকা*

এদিকে প্রতিযোগিতায় বাধ্য হয়ে হাবিব ব্যাংক ও মুসলিম কমার্শিয়াল ব্যাংক ইত্যাদিও গ্রামাঞ্চলে শাখা খুলতে শুরু করে। কিন্তু এতেও বাঙালির অসন্তোষ দূর হয়নি। বলা হয় পাকিস্তানভিত্তিক এসব ব্যাংকে বাঙালিকে 'ব্যবস্থাপক' 'মহাব্যবস্থাপক' ইত্যাদি করা হয় না, ব্যবস্থাপনা পরিচালক তো দূরের কথা, বাঙালিকে ব্যবহার করা হয় শুধু আমানত সংগ্রহের কাজে। আমানত সংগ্রহ করে তা পশ্চিম পাকিস্তানে পাঠানো হয়। বাঙালি অফিসারকে ক্রেডিট ও ফরেন একচেঞ্জ বিভাগের কাজ শেখানো হয় না। ধূমায়িত এই অসন্তোষের মাঝেই বাঙালি নিজস্ব একটি ব্যাংকের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে। এই প্রেক্ষাপটে সম্পূর্ণ বাঙালি মালিকানায় ১৯৬৫ সালের ২৮ জানুয়ারি গঠিত হয় ইস্টার্ন ব্যাংকিং কর্পোরেশন। এই ব্যাংকে সরকার অথবা 'স্টেট ব্যাংক অব পাকিস্তানের' কোনো পুঁজি ছিল না। ঢাকায় প্রধান কার্যালয় স্থাপন করে ইস্টার্ন ব্যাংকিং কর্পোরেশন ১৯৬৫ সালের জুন মাসের ২২ তারিখ 'তফসিলি ব্যাংক' হিসেবে কাজ শুরু করে। প্রাথমিক অবস্থায় এই ব্যাংকের পরিশোধিত মূলধন ছিল ১৪ লক্ষ ২১ হাজার টাকা। ইস্টার্ন ব্যাংকিং কর্পোরেশন, নাথ ব্যাংক, এর শাখাসমূহ ও এদের সম্পদ এবং দায়-দায়িত্ব অধিগ্রহণ করে। ব্যাংকের প্রধান প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন: (১) ব্যবসায়ী জহুরুল ইসলাম; (২) প্রাক্তন চীফ ইঞ্জিনিয়ার আব্দুল জব্বার; এবং (৩) ক্যাপ্টেন জগদীশ দেবনাথ। প্রথম চেয়ারম্যান হন নুরুল আমীন। যিনি পূর্ব পাকিস্তানের মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন।

স্বাধীনতার ঠিক পূর্ব মুহূর্তে এ ব্যাংকের পরিচালনা বোর্ডে ছিলেন: (১) এন. হামিদুল্লাহ (বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রাক্তন গভর্নর); (২) দৈনিক সংবাদের সম্পাদক ও চা ব্যবসায়ী আহমুদুল কবীর; (৩) নুরুল আমীন; (৪) মুক্তিযুদ্ধে শহীদ ব্যবসায়ী সাঈদুল হাসান; (৫) ব্যবসায়ী কাজী মেজবাহ উদ্দিন; এবং (৬) ময়মনসিংহের গফরগাঁও-এর ক্যাপ্টেন জগদীশ দেবনাথ।

স্বাধীনতার পূর্বে 'ইস্টার্ন ব্যাংকিং কর্পোরেশনের' আদায়কৃত মূলধন ও সংরক্ষিত তহবিলের পরিমাণ দাঁড়ায় ৭৬ লক্ষ টাকা। এ সময়ে ব্যাংকের মোট আমানতের পরিমাণ ছিল ২৮ কোটি টাকা এবং সর্বমোট শাখা সংখ্যা ছিল ১৪৯৩। এখানে উল্লেখ্য যে, ইস্টার্ন ব্যাংকিং কর্পোরেশন ও ইস্টার্ন মার্কেন্টাইল ব্যাংক দুটো মূলত ছিল পূর্ব পাকিস্তানকেন্দ্রিক। অন্যান্য পাকিস্তানী ব্যাংকের তুলনায় এই ব্যাংক দুটো আকারে ও সম্পদে ছোট ছিল।

পাকিস্তান কৃষি ব্যাংক (Agricultural Bank of Pakistan) ১৯৫৯ সালের ৯ সেপ্টেম্বর প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ১৯৫৯ সালের জানুয়ারিতে পূর্ব পাকিস্তানে ঋণ বা লোন কার্যক্রম আরম্ভ করে এবং পশ্চিম পাকিস্তানে একই বছরের এপ্রিলে শুরু হয়। প্রথম বছর ২১০০ জন কৃষকের জন্য ৯ মিলিয়ন রুপি ঋণ অনুমোদন করে।[৩২]

---

* উৎস: *Banking Statistics of Pakistan* 1961-62, pp. 115-122.

এভাবে ১৯৬০ সালের মার্চ মাসের শেষের দিকে দেখা যায় যে, ১২ বছরের কম সময়ে পাকিস্তানের সিডিউল (Schedule) ভিত্তিক ব্যাংকের সংখ্যা ২৫ থেকে ৩৩৭-এ বৃদ্ধি পায়। ১৯৫৯ সালের ডিসেম্বরের শেষের দিকে ব্যাংকের অগ্রগতি সম্পর্কে নিম্নবর্ণিত তালিকা থেকে স্পষ্ট বোঝা যাবে:

সারণি-২

১ জুলাই ১৯৪৮ সালের তফসিলি ব্যাংকের সংখ্যা	ব্যাংক অফিসের সংখ্যা			ডিসেম্বর, ১৯৫৯ সালের তফসিলি ব্যাংকের সংখ্যা	ব্যাংক অফিসের সংখ্যা		
	পশ্চিম পাকিস্তান	পূর্ব পাকিস্তান	মোট		পশ্চিম পাকিস্তান	পূর্ব পাকিস্তান	মোট
পাকিস্তান ব্যাংক-২	২৩	২	২৫	১০	২৫৩	৭১	৩২৪
ইন্ডিয়ান ব্যাংক-২৯	৪৫	১০৬	১৫১	১০	১০	২৭	৩৭
এক্সচেইঞ্জ ব্যাংক-৭	১৬	৩	১৯	৯	২৩	১২	৩৫
মোট- ৩৮	৮৪	১১১	১৯৫	২৯	২৮৬	১১০	৩৯৬

উৎস: *Pakistan Trade,* October 1960, p. 146.

উপরের তালিকায় দেখতে পাওয়া যাচ্ছে যে, পাকিস্তানের সিডিউল ব্যাংকের সংখ্যা ১৯৪৮ সালে যেখানে ২টি ছিল, ১০ বছর পর তা বৃদ্ধি পেয়ে হয় ১০টি। আরো দেখা যায় যে, পাকিস্তানের এসব তফসিলি ব্যাংকের অফিসের সংখ্যা পূর্ব পাকিস্তানের চেয়ে পশ্চিম পাকিস্তানে বেশি ছিল। অপর দিকে ১৯৪৮ সালে ভারতীয় ব্যাংক বা Indian Bank-এর তফসিলি বা Scheduled ব্যাংকের সংখ্যা ছিল ২৯। কিন্তু ১০ বছর পর তথা ১৯৫৯ সালে কমে ১০টি হয়। এছাড়া এসব ভারতীয় ব্যাংকের অফিসের সংখ্যা পশ্চিম পাকিস্তানের চেয়ে পূর্ব পাকিস্তানে বেশি ছিল। আবার ১৯৪৮ সালে Exchange Bank-এর সংখ্যা ছিল ৭টি, ১০ বছর পর এই ব্যাংকের সংখ্যা হয় ৯টি। পূর্ব পাকিস্তানের চেয়ে পশ্চিম পাকিস্তানে এই ব্যাংকের অফিসের সংখ্যা বেশি ছিল। সুতরাং, বলা যায়, এই সময় (পাকিস্তানী আমলে) পাকিস্তানী ও ভারতীয় ব্যাংকের আধিপত্য ছিল। বাঙালির নিজস্ব মালিকানাধীন ব্যাংকের সংখ্যা ছিল না বললেই চলে। তবে ১৯৫৯ সালে গঠিত ইস্টার্ন মার্কেন্টাইল ব্যাংক ছিল বাঙালি-অবাঙালির যৌথ উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত ব্যাংক।

পাকিস্তান শিল্প উন্নয়ন ব্যাংক (Industrial Development Bank of Pakistan)

শিল্পের উন্নয়ন পাকিস্তান শিল্পায়ন নীতির একটি বড় উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্য কার্যকর করতে আইডিবিপি একটি বড় ভূমিকা রাখে। অনুন্নত অঞ্চলের মাঝারি ও ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের মধ্য থেকে নতুন প্রতিযোগিদের একটি সংখ্যাকে এই উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য আইডিবিপি সাহায্য করত। এই ব্যাংকের প্রাথমিক উদ্দেশ্য অনুসারে এর লক্ষ্য ছিল ঋণের ব্যাপ্তি এবং মালিকানার ভিত্তি এমনভাবে স্থাপন করা যাতে একটি মাঝারি শ্রেণীর শিল্প উদ্যোক্তা সৃষ্টির

প্রক্রিয়া তৈরি হয়। যে সকল ব্যক্তিগত প্রকল্পের সাধারণ উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধির সম্ভাবনা আছে তাদেরকে অর্থায়ন করতে এই ব্যাংক ছিল অঙ্গীকারাবদ্ধ। সুতরাং, স্বতন্ত্র প্রকল্পের উৎপাদনশীলতায় বিনিয়োগের জন্য প্রতিটি ইউনিটকে বিবেচনায় আনা হয়। শিল্প বিনিয়োগ সময়সূচিতে প্রতিফলিত দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার আওতায় শিল্পের উপর জোর দেওয়া হয়। যার মূল উদ্দেশ্য ছিল: ক. পাকিস্তানের উৎপাদনের উদ্বৃত্ত উপাদান ব্যবহার করা; এবং খ. বৈদেশিক বিনিময় অর্জন/সঞ্চয়ে সাহায্য করা।[৩৩]

এই ব্যাংক নতুন শিল্পকারখানা প্রতিষ্ঠা এবং বিদ্যমান ইউনিটের আধুনিকায়নের জন্য অর্থ প্রদান করে। স্বতন্ত্র হিসেবে পূর্বগামী থেকে P.I.F.C.O; (Pakistan Industrial Finance Corporation), I.D.B.P (Industrial Development Bank of Pakistan) সীমাবদ্ধ দায়যুক্ত ব্যবসা প্রতিষ্ঠানক্ষেত্রে (লিমিটেড কোম্পানিজ) ধারের স্তর ১০ লক্ষ রুপি হ্রাস করা হয় এবং অন্যান্য ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে ৫ লক্ষ রুপি হ্রাস করা হয়।[৩৪] এখানে আরো বলা হয় যে, "This ceiling, however did not apply to jute, cotton, inland water transport, mining and such other industries as might be specified by the Government of Pakistan from time to time."[৩৫]

এক পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, আমদানিকৃত যন্ত্রপাতির মূল্য, অভ্যন্তরীণ মূল্য এবং উৎপাদনের অন্যান্য উপাদানের প্রকৃতমূল্য অকল্পনীয়ভাবে বৃদ্ধি পেয়েছিল। ফলে সীমাবদ্ধ দায়যুক্ত ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে (লিমিটেড কোম্পানিজ) বৈদেশিক বিনিময় ১৫ লক্ষ থেকে ২৫ লক্ষে বৃদ্ধি পায় এবং অন্যান্য ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের জন্য ৫ লক্ষ থেকে ১০ লক্ষে বৃদ্ধি পায়।[৩৬]

বিনিয়োগ কার্যক্রমে আইডিবিপি-এর ভূমিকা

পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, আইডিবিপি পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের উভয় অংশের জন্য ২৯.৪৫ কোটি রুপি (দেশীয় রুপি ও বৈদেশিক মুদ্রায়) অনুমোদন করে। এর মধ্যে ১৬.৪৯ কোটি রুপি পূর্ব পাকিস্তানের জন্য অনুমোদন করে এবং অবশিষ্টাংশ পশ্চিম পাকিস্তানে পাঠানো হয়।[৩৭] মোট ঋণের ৬.৯৬ কোটি রুপি দেশীয় মুদ্রায় মঞ্জুর করা হয়।

এই সময় (১৯৬৩-৬৪) ব্যাংকের নীতি অনুসারে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের প্রয়োজনীয় ঋণের চাহিদা পূরণ করতে ক্ষুদ্র ঋণ প্রদান করা হয়। ব্যাংকের ঋণ বা ধার দেওয়ার পরিমাণ ১০ লক্ষ থেকে ২৫ লক্ষ রুপিতে বৃদ্ধি পায়। এছাড়া মাঝারি বিনিয়োগকারীদের উৎসাহিত করতে ব্যাংকের কার্যক্রম অনেক নমনীয় ছিল।

এদিকে আগাম ঋণের ক্ষেত্রে এই ব্যাংক বিভিন্ন ধরনের শিল্প ও অঞ্চলের মধ্যে ঋণ ও বিনিয়োগ বণ্টনের নীতি অনুসারে পথপ্রদর্শক হিসেবে কাজ করত। তবে এরূপ নীতি দীর্ঘমেয়াদী বিনিয়োগে না ন্যূনতম ঝুঁকি গ্রহণ করে, না কোনো শিল্পের উন্নয়নের দিকে নজর দেয়, যা পাকিস্তানের মতো উন্নয়নশীল দেশের দীর্ঘমেয়াদী অর্থনৈতিক বিকাশের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ ছিল।

মঞ্জুরীকৃত ঋণের ক্ষেত্রে এই ব্যাংক বিদ্যমান এবং নতুন ইউনিটের মধ্যে বণ্টনের ভারসাম্য তথা সমবণ্টনের চেষ্টা করত। নতুন ইউনিট (শিল্প) স্থাপন করতে প্রায় ৫৮% ঋণ অনুমোদন করে। পূর্ব পাকিস্তানের নতুন শিল্পকারখানা স্থাপনের জন্য ৪২৬টি ঋণের মধ্যে ৩০৬টি ঋণ (প্রায় ৭৯%) এবং ২১% বিদ্যমান পুরাতন শিল্পকারখানার আধুনিকায়নের জন্য অনুমোদন করে।[৩৮] পূর্ব পাকিস্তানের নতুন শিল্পের জন্য ঋণের অনুপাতের সত্যতা প্রতিপাদন করা হয় ঐ প্রদেশের মূলধন গঠনের স্বল্পতা এবং শিল্পের অভাবের মাধ্যমে।

অপরদিকে পশ্চিম পাকিস্তানের ঋণের অধিকাংশ (সংখ্যাগরিষ্ঠ) অংশ তথা ৫৯% বিদ্যমান শিল্পের বিস্তার, আধুনিকীকরণ, ভারসাম্য বজায় রাখার জন্য অনুমোদন করা হয়। এক্ষেত্রে কার্যকর উন্নয়ন পরিকল্পনা এবং ব্যাংক ব্যবসায় কার্যকর বিনিয়োগের মূলনীতির মাধ্যমে ঋণের অনুপাতের সত্যতা প্রতিপাদন করা হয়।[৩৯]

ঋণ ছাড়াও এই ব্যাংকের যেসব কার্যক্রম ছিল সেই সম্পর্কে ১৯৬০-এর দশকের এই রিপোর্টে বলা হয়:

> The Bank has sanctioned on its own account, it was also called upon to administer foreign currency loans to different projects on behalf of the Government. Loans totalling Rs. 4.17 crores in foreign exchange derived from Japanese, Yugoslav and German credits, and relating to two large projects have been administered on behalf of the Government.[৪০]

নিম্নে ব্যাংকের মূলধন গঠনের উৎস দেখানো হলো:

সারণি-৩

রুপির উৎস

(৩১ মার্চ, ১৯৬৪)

ক্র.নং	উৎস	রুপি
১.	মূলধনের পরিমাণ	৩০০,০০,০০০
২.	মজুদ	৪৫,৬৫,০০০
৩.	সরকারি ঋণ	৬,১৪০০,০০০
৪.	ঋণের মাত্রা– ১. সরকারি জামানতের বিপরীতে স্টেট ব্যাংক অব পাকিস্তান থেকে গৃহীত ঋণ।	৫০০,০০,০০০
	২. সরকারি প্রতিভাব্যের বিপরীতে স্টেট ব্যাংক অব পাকিস্তান থেকে গৃহীত ঋণ।	২৯,০০,০০০
	৩. স্টেট ব্যাংক অব পাকিস্তান থেকে বিল পুনর্বন্টনের সুবিধা	১০০,০০,০০০
	৪. সরকারি জামানতের বিপরীতে ন্যাশনাল ব্যাংক অব পাকিস্তান থেকে গৃহীত ঋণ।	২,২৫,০০,০০০
	মোট রুপি	**১৮,১৩,৬৫,০০০**

ক্র.নং	চাহিদা	রুপি
১.	বকেয়া ঋণ	১৫,৯৫,৬০,০০০
২.	বিনিয়োগ	৪৭,৭৬,০০০
৩.	নির্ধারিত সম্পত্তি	৫,৫৮,০০০
		১৬,৪৮,৯৪,০০০
	অনুমোদিত ঋনের প্রদত্ত অর্থের পরিমাণ	৫,৭৬,৩০,০০০
	মোট রুপি	**২২,২৫,৩০,০০০**

উৎস: *Economic Survey of Pakistan* 1963-64, p. 161

ঘাটতি: ৪,১১,৫৯,০০০

উপরের টেবিলে ব্যাংকের রুপির উৎস দেখানো হয়েছে এবং সাক্ষ্য প্রমাণের ভিত্তিতে দেখা যায় যে, ৪.১২ কোটি রুপির ঘাটতি ছিল এবং প্রায় ২২.২৫ কোটি রুপি ব্যাংক প্রদান করতে অঙ্গীকারাবদ্ধ হয়।

১৯৬৩ সালের ৩০ শে জুন থেকে ১৯৬৪ সালের ৩১ মার্চ ঘাটতি বৃদ্ধি পেয়ে হয় ০.৫৮ কোটি রুপি থেকে ৪.১২ কোটি রুপি।[৪১]

অবশেষে বিভিন্ন পর্যবেক্ষণে দেখা যায় যে, ব্যাংক মোট ঋণের ১৯৫.৩০ মিলিয়ন ডলারের মধ্যে ১৫৩.০৮ মিলিয়ন ডলার বণ্টন করে। নিম্নে ১৯৬৪ সালের মার্চ মাসের বণ্টন ও অনুমোদনের অবস্থা দেখানো হলো:

সারণি-৪

বন্টন ও অনুমোদনের অবস্থা

(৩১ মার্চ, ১৯৬৪)

(কোটি রুপি)

ক্র. নং	বৈদেশিক ঋণ	আই.ডি.পিকে মোট বন্টন	আই.ডি.পির মাধ্যমে মোট বন্টন
১.	দ্বিতীয় ইউ.কে. ঋণ	১২.৯৮	১২.৯৭
২.	তৃতীয় ইউ.কে. ঋণ	৪.৩৪	৪.৩৪
৩.	পঞ্চম ইউ.কে. ঋণ	৯.৩৫	৯.৩৫
৪.	ষষ্ঠ ইউ.কে. ঋণ (পাটের তাঁতের জন্য ৭.৬ ডলার)	১২.০০	৯.৫৫
৫.	১ম জাপানিজ টেক্সটাইল ক্রেডিট	২০.০০	২০.২৯
৬.	১ম ইয়েন ক্রেডিট	৪.১১	৩.৮০

৭.	২য় জাপানিজ টেক্সটাইল ক্রেডিট	১৩.০০	১২.৯৮
৮.	২য় ইয়েন ক্রেডিট	১.০০	০.১৭
৯.	২য় ইয়েন ক্রেডিট (সোডা এ্যাশ প্ল্যান্ট)	৪.০০	-
১০.	৩য় ইয়েন ক্রেডিট (সোডা এ্যাশ প্ল্যান্ট)	১.৫০	-
১১.	৩য় ইয়েন ক্রেডিট	১.০০	-
১২.	৩য় ইয়েন ক্রেডিট (পিভিসি প্ল্যান্ট)	৪.০০	৪.০০
১৩.	এক্সিম ব্যাংক ক্রেডিট	৬.৪০	৬.৬০
১৪.	এক্সিম ব্যাংক ক্রেডিট	২.৫০	০.৫২
১৫.	১ম জার্মান ক্রেডিট	৩৮.৫৮	৩৮.৫৮
১৬.	২য় জার্মান এক্সপোর্ট ক্রেডিট (সিমেন্ট)	২.৫০	২.৫০
১৭.	২য় এবং ৩য় জার্মান ক্রেডিট	২১.০০	১০.৮১
১৮.	২য় এবং ৩য় জার্মান ক্রেডিট (সোডা কস্টিক)	০.৭৫	০.৬৩
১৯.	ফ্রান্স ক্রেডিট	২.০০	২.৩৪
২০.	ফ্রান্স ক্রেডিট (তেল)	৩.০০	৩.০০
২১.	ইয়োগোস্লাভিয়া ক্রেডিট	৬.৫০	৫.৯০
২২.	সুইস ক্রেডিট	২.৫০	০.৪৯
২৩.	এক্সিম ব্যাংকের ঋণের অধীনে জামানত	১১.৩১	৪.২৬
২৪.	৮ম ইউ.কে ক্রেডিট (জুট মিল)	১০.০০	-
	মোট	**১৯৫.৩০**	**১৫৩.০৮**

উৎস: *Economic Survey of Pakistan* 1963-64, Rawalpindi, p. 162.

নিম্নে এই ব্যাংকের (I.D.B.P) নতুন মূলধন সরবরাহ লাভের উপায়/উৎস দেখানো হলো:[৪২]

১. কেন্দ্রীয় সরকার থেকে ঋণ;
২. পাকিস্তান সরকারের জামানতের মাধ্যমে স্টেট ব্যাংক অব পাকিস্তান থেকে ঋণ;
৩. স্টেট ব্যাংক অব পাকিস্তানের সাথে বিল হ্রাসের পুর্নবন্টন; এবং
৪. ব্যাংকের মূলধনের অংশ বৃদ্ধি।

এভাবে দেখা যায়, পাকিস্তান আমলে আধুনিক শিল্পকারখানা গড়ে তোলার জন্য আইডিবিপি বিভিন্ন ধরনের ঋণ দিয়ে সহায়তা করত। যদিও তা ছিল প্রয়োজনের তুলনায় অপর্যাপ্ত। তথাপি এই ব্যাংকের মাধ্যমে ঢাকাস্থ সমগ্র পূর্ব পাকিস্তানের ব্যবসায়ীরা লাভবান হয়।

পাকিস্তান কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক (Agricultural Development Bank of Pakistan): পূর্বের Agricultural Development Finance Corporation (1952) এবং The Agricultural Bank of Pakistan (1957) একত্রিত হয়ে ১৯৬১ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় The Agricultural Development Bank of Pakistan। কৃষকদের ঋণের সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধিতে এটি চালু করা হয়। যদিও এই সময় (১৯৬১) ব্যাংকের মূলধন তেমন বৃদ্ধি পায়নি,

যার অবশিষ্ট ছিল ১০ কোটি রুপি। স্টেট ব্যাংক থেকে ধারের মাধ্যমে এই ব্যাংক তার ঋণের কার্যক্রম চালাত এবং তার আমানতের মাধ্যমে কিছুটা পূর্বের অবস্থায় ফিরে যায়।

১৯৬২-৬৩ সালে করাচিতে প্রধান অফিস ছাড়াও ব্যাংকের ১০০টি অফিস ছিল। জেনারেল ম্যানেজারের দপ্তর পূর্ব পাকিস্তানের ঢাকায় অবস্থিত ছিল এবং ৯টি প্রধান আঞ্চলিক ব্যবস্থাপকের দপ্তরের মধ্যে ৪টি পূর্ব পাকিস্তানে এবং ৫টি পশ্চিম পাকিস্তানে অবস্থিত। প্রতিটি প্রদেশে ৫টি করে আরো ১০টি অফিস ছিল। ফলে দেখা যায় যে, দপ্তর/ অফিসের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে ১২০-এ দাঁড়ায়। যার মধ্যে ৬৬টি পশ্চিম পাকিস্তানে এবং ৫৪টি পূর্ব পাকিস্তানে অবস্থিত।

পাকিস্তান কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক কৃষকদের জন্য সব ধরনের ঋণের সুযোগ-সুবিধা গ্রহণ করে। স্বতন্ত্র কোনো প্রতিষ্ঠান ছাড়াও কৃষি অথবা কৃষির উন্নয়নের সাথে সম্পৃক্ত সরকারি ও বেসরকারি সীমিত প্রতিষ্ঠানকে ব্যাংক ঋণ দেওয়া হয়। ১৮ মাসের মধ্যে পরিশোধযোগ্য স্বল্পমেয়াদী ঋণ দেওয়া হতো। যেমন- বীজ, সার, উদ্ভিদ সংরক্ষণের ব্যবস্থা এবং নির্দিষ্ট শস্যের জন্য শ্রমিকের মজুরি দেওয়া। মাঝারি ধরনের ঋণ যার সময়সীমা ছিল ১৮ মাস থেকে পাঁচ বছর। এই ব্যবস্থায় যেসব পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়: কৃষিকাজে ব্যবহৃত ক্ষুদ্র হাতিয়ার, ভূমি সমতল করা, কুয়া খনন করা, এবং গাড়ি টানার কাজে ব্যবহৃত পশু, যেমন, ঘোড়া, যান্ত্রিক চাষের জন্য আধুনিক পদ্ধতি গ্রহণ (The adoption of modern method of mechanized farming) এবং ভূমির অধিক উন্নতিসাধনের জন্য পাঁচ বছরেরও বেশি সময়ের জন্য দীর্ঘমেয়াদী ঋণ পদ্ধতি গ্রহণ করা/ প্রদান করা। যেমন, টিউবওয়েল স্থাপন করা, ট্রাক্টর ক্রয় করা এবং ফলবাগান গড়ে তোলা। উদ্যানবিদ্যা (Horticulture), অরণ্যবিদ্যা (Forestry), মৎস্যচাষ (Fisheries), পশু ব্যবস্থাপনা (Animal Husbandry), হাঁস-মুরগির খামার, দুগ্ধ খামার/গব্য খামার ব্যবসা (Dairying), মৌমাছি পালন (Bee Keeping), রেশম চাষ (Sericulture) এবং গ্রামীণ এলাকায় কুটির শিল্পের জন্যও এই ব্যাংক ঋণের আরো সুযোগ-সুবিধা গ্রহণ করে। অপব্যবহারের সম্ভাবনা থেকে পরিত্রাণের উদ্দেশ্যে যতদূর সম্ভব বিভিন্ন ধরনের ঋণ দেওয়া হয়। স্বল্প এবং মাঝারি ধরনের ঋণের জন্য সুদের হার ছিল ৭% এবং দীর্ঘমেয়াদি ঋণের জন্য ৬% সুদ ধরা হয়।[৪৩]

নিম্নবর্ণিত তালিকায় ব্যাংকের ঋণের কার্যক্রমের অগ্রগতি দেওয়া হলো:

সারণি-৫

(হাজার রুপি)

বছর	পূর্ব পাকিস্তান	পশ্চিম পাকিস্তান	পাকিস্তান
১৯৫২-৫৩	-	৮০	৮০
১৯৫৩-৫৪	১৯১	৬৯৬	৮৮৭
১৯৫৪-৫৫	৬০৬	১,৭৮২	২,৩৮৮
১৯৫৫-৫৬	১,২৯০	২,৭৭০	৪,০৬০
১৯৫৬-৫৭	২,৯৪২	৪,৫১৯	৭,৪৬১
১৯৫৭-৫৮	৬,৬৬০	৮,১৪৬	১৪,৮০৬

১৯৫৮-৫৯	১৫,২৬১	১৩,৮০২	২৯,০৬৩
১৯৫৯-৬০	৩৪,৩৩৯	৩৮,৫৭৪	৭২,৯১৩
১৯৬০-৬১	৭,২৫,৩০	৬৯,৪৭৩	১,৪২,০০৩
১৯৬১-৬২	১,১৩,০৭৪	১,১৬,৩৮৫	২,২৯,৪৫৯
১৯৬২-৬৩	১,৫০,৭৪৩	১,৫৭,০৫৬	৩,০৭,৭৯৯
১৯৬৩-৬৪ (মার্চ পর্যন্ত)	১,৭৬,৪৮৪	১,৮৫,১২৮	৩,৬১,৬১২

উৎস : *Economic Survey of Pakistan* 1963-64, p. 164.

ব্যাংকের শুরু থেকে মোট ৫,১৬,২৮৯ জন কৃষককে ৩৬.১৬ কোটি রুপি অগ্রিম প্রদান করে। দেখা যায় যে, ১৯৬৩ সালের এপ্রিল মাস থেকে ১৯৬৪ সালের মার্চ মাস পর্যন্ত তথা ১২ মাসে পাকিস্তান কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক ৮৪,৫৪২ জন কৃষককে ৭.৩৯ কোটি রুপি অগ্রিম প্রদান করে। পূর্ব পাকিস্তানের ভূসম্পত্তি কম পরিমাণে ছিল এবং শস্য উত্তোলনের জন্য ঋতুর প্রয়োজন অনুসারে স্বল্পমেয়াদি ঋণের চাহিদা ছিল। তাই ঋণের বেশিরভাগ ক্ষুদ্র চাষিদের কাছে চলে যেত, যার গড় মোট পরিমাণ ছিল প্রায় ৪৯৫ কোটি রুপি। অন্যদিকে পশ্চিম পাকিস্তানের ভূসম্পত্তি তুলনামূলকভাবে বেশি ছিল বিধায় এখানে মাঝারি ও দীর্ঘমেয়াদী ঋণের প্রচুর চাহিদা ছিল। পশ্চিম পাকিস্তানে ঋণের মোট পরিমাণ ছিল প্রায় ৩,০৪৮ রুপি।[৪৪] দায়বদ্ধকরণ শস্যের বিপরীতে অর্থকরী ও সুনির্দিষ্ট খাদ্যশস্যের উন্নয়নের জন্য একচেটিয়াভাবে বিশেষ ধরনের ঋণ বিপুল পরিমাণে দেওয়া হতো। এই ধরনের ঋণ কৃষকদের কাছে জনপ্রিয় ছিল। কারণ ঋণের কার্যপ্রণালী সহজ ছিল। ফলে ঋণগ্রহীতাদেরকে ভূমি/ জমি বন্ধক দিতে হতো না অথবা জামানত পেশ করতে হতো না (or to produce surities) ব্যাংকের দৃষ্টিকোণ থেকে বলা হয়:

> It is easier to supervise and recover these loans, as they are given mainly in kind and recoveries are made through a third party, brokers in the case of tea, ginning factories in the case of cotton, sugar mills in the case of sugercane, and the Department of Food, Government of East Pakistan in the case of paddy (in East Pakistan). Loans against hypothecation of crops are also helpful to agriculturists who have no property to offer as security.[৪৫]

নিম্নে দায়বদ্ধকরণের বিপরীতে যেসব শস্যের জন্য অগ্রিম ঋণ দেওয়া হতো তার পরিমাণ দেওয়া হলো:

সারণি-৬

বিভিন্ন শস্যের দায়বদ্ধকরণের বিপরীতে অগ্রিম ঋণ

ক. চা বাগানের ঋণ:

(পূর্ব পাকিস্তান)

সময়	বন্ধক দেওয়ার বিপরীতে ঋণ	দায়বদ্ধকরণের বিপরীতে ঋণ
১৯৬৪ সালের শুরু থেকে মার্চ পর্যন্ত	২৩,৬২,৭১৭ রুপি	৯৩,৬৪,৪৮৩ রুপি
১৯৬৩ এপ্রিল থেকে ১৯৬৪ মার্চ পর্যন্ত	১০,১২,৯১৫ রুপি	৩০,০৮,১২৫ রুপি

খ. ধান বন্ধক রাখার বিপরীতে ঋণ:

(পূর্ব পাকিস্তান)

১৯৬৪ সালের শুরু থেকে মার্চ পর্যন্ত	৫৩,২৫,৬২১ রুপি
১৯৬৩ এপ্রিল থেকে ১৯৬৪ মার্চ পর্যন্ত	৪,৪৩,৩৮৭ রুপি

গ. আখ বন্ধক রাখার বিপরীতে ঋণ:

সময়	পূর্ব পাকিস্তান	পশ্চিম পাকিস্তান	পাকিস্তান
১৯৬৪ সালের শুরু থেকে মার্চ পর্যন্ত	৯১,৪৫,০৮৩ রুপি	৬০,১৩,৮০৬ রুপি	১,৫১,৫৮,৮৮৯ রুপি
১৯৬৩ এপ্রিল থেকে ১৯৬৪ মার্চ পর্যন্ত	৩০,০২,২২৩ রুপি	৯,৬৬,৬২৫ রুপি	৯,৬৮,৮৪৮ রুপি

ঘ. তুলা বন্ধক রাখার বিপরীতে ঋণ : (পশ্চিম পাকিস্তান)

১৯৬৪ সালের শুরু থেকে মার্চ পর্যন্ত	৩৮,৭১,৩৫২ রুপি
১৯৬৩ এপ্রিল থেকে ১৯৬৪ মার্চ পর্যন্ত	১১,৪৪,৯০৪ রুপি

ঙ. তামাক বাজারজাত করণের ঋণ: (মাদান জেলা) (পশ্চিম পাকিস্তান)

১৯৬৪ সালের শুরু থেকে মার্চ পর্যন্ত	১৯,৬৫০ রুপি

চ. পাট বাজারজাত করণের ঋণ: (পূর্ব পাকিস্তান)

১৯৬৪ সালের শুরু থেকে মার্চ পর্যন্ত	৩,৩০,৮৬৫ রুপি
১৯৬৩ এপ্রিল থেকে ১৯৬৪ মার্চ পর্যন্ত	৫০,৩৭৩ রুপি

উৎস : *Economic Survey of Pakistan* 1963-64, pp. 165-66.

পাকিস্তান কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক পূর্ব পাকিস্তানে Crash Programme (জরুরী কর্মসূচী) এবং পশ্চিম পাকিস্তানে মডেল স্কিমের (Model Scheme) মাধ্যমে প্রতিষ্ঠার শুরু থেকে ১৯৬৪ সালের মার্চ পর্যন্ত মোট ৩৯৮ লক্ষ রুপি ঋণ প্রদান করে। এর মধ্যে ৩০৭ লক্ষ রুপি প্রদান করা হয় পূর্ব পাকিস্তানের Crash Programme–এ এবং পশ্চিম পাকিস্তানকে প্রদান করা হয় ৯১ লক্ষ রুপি। ১৯৬৩ সালের এপ্রিল থেকে ১৯৬৪ সালের মার্চ মাস পর্যন্ত পূর্ব পাকিস্তানে মঞ্জুরকৃত মোট ঋণের পরিমাণ ছিল ৬২.৪৯ লক্ষ রুপি এবং পশ্চিম পাকিস্তানে ৪.৯৮ লক্ষ রুপি। এই ব্যাংক শুরু থেকেই সামুদ্রিক মৎস্য চাষের উন্নয়নের জন্য পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানে ৩৮.৮৮ লক্ষ রুপি অগ্রিম প্রদান করে।

এই ব্যাংকের সার্বিক অবস্থা সম্পর্কে বলা হয়, "The overall position of recoveries since inception till the end of March 1964, is 77 per cent in both East and West."[৪৬]

সুতরাং, পাকিস্তান কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক উভয় অংশের জন্য প্রচুর পদক্ষেপ গ্রহণ করে। বিশেষ করে পূর্ব পাকিস্তানের চাষিদের জন্য। কেননা পূর্ব পাকিস্তানে বিশেষ কিছু শস্য (পাট, ধান) ভাল উৎপাদিত হতো। এসব শস্যের বিশেষ যত্ন নেওয়ার জন্য ও কৃষকদের উৎসাহিত করার জন্য এই ব্যাংক বিভিন্ন ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করে যা কৃষকদের জন্য সহায়ক হয়। আর ঋণ ব্যবস্থার এই কার্যক্রম ঢাকার দপ্তর (Office) থেকে পরিচালিত হতো। সেক্ষেত্রে এই ব্যাংকের একটি শাখা হিসেবে ঢাকায় অবস্থিত শাখা অগ্রণী ভূমিকা পালন করত।

১৯৬২ সালের ১টি রিপোর্টে দেখা যায় ঢাকা শহরে যে সমস্ত ব্যাংকের শাখা, উপ-শাখা, সাব-অফিস ছিল তার তালিকা দেওয়া হয়। নিম্নবর্ণিত ব্যাংকগুলো উল্লেখ করা হলো:

১. পাকিস্তান কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক (শাখা);
২. সেন্ট্রাল ব্যাংক অব ইন্ডিয়া (শাখা);
৩. কমরেড ব্যাংক লিঃ (শাখা);
৪. হাবিব ব্যাংক লিঃ (৫টি শাখা);
৫. ইস্টার্ন মার্কেনটাইল ব্যাংক (২টি শাখা);
৬. ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক অব পাকিস্তান;
৭. মুসলিম ব্যাংক (পাকিস্তান) লিঃ (আঞ্চলিক অফিস);
৮. নাথ ব্যাংক (পাকিস্তান) লিঃ (আঞ্চলিক অফিস);
৯. ন্যাশনাল ব্যাংক অব পাকিস্তান (৪টি শাখা, ৬টি প্রধান অফিস এবং ২টি উপ-শাখা);
১০. ন্যাশনাল এবং গ্রীন্ডলেজ ব্যাংক লিঃ (শাখা);
১১. স্টেট ব্যাংক অব ইন্ডিয়া (শাখা);
১২. ইউনাইটেড ব্যাংক লিঃ (৪টি শাখা); এবং
১৩. ইউনাইটেড ব্যাংক অব ইন্ডিয়া (প্রধান অফিস)*

নিম্নে পূর্ব পাকিস্তানের ঢাকায় যে সমস্ত তফসিলি এবং অ-তফসিলি ব্যাংক ও ব্যাংকের শাখা, উপ-শাখা ছিল তার তালিকা দেওয়া হলো:

পূর্ব পাকিস্তানের ঢাকার তফসিলি ব্যাংক অফিসের তালিকা (৩০ জুন, ১৯৬২)

১. পাকিস্তান কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক (শাখা);
২. ইস্টার্ন মার্কেনটাইল ব্যাংক, ঢাকা শহর (শাখা); এবং
৩. হাবিব ব্যাংক লিঃ
   ক. নবাবপুর রোড, ঢাকা (শাখা);
   খ. তেজগাঁও, ঢাকা (শাখা);
   গ. মৌলভীবাজার, ঢাকা (শাখা);
   ঘ. সদরঘাট, ঢাকা (শাখা); এবং
   ঙ. রমনা, ঢাকা (শাখা)

* উৎস: *Banking Statistics of Pakistan* 1961-62, Department of Statistics, State Bank of Pakistan, p. 126.

৪. ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক অব পাকিস্তান (শাখা)
৫. মুসলিম কর্মাশিয়াল ব্যাংক লিঃ
    ক. মিটফোর্ট রোড, ঢাকা (শাখা);
    খ. জনসন রোড, ঢাকা (শাখা);
    গ. নিউ মার্কেট, ঢাকা (শাখা); এবং
    ঘ. রমনা, ঢাকা (শাখা)
৬. ন্যাশনাল ব্যাংক অব পাকিস্তান
    ক. এয়ারপোর্ট, ঢাকা (প্রধান অফিস);
    খ. আজিমপুর, ঢাকা (শাখা);
    গ. ক্যান্টনমেন্ট, ঢাকা (উপ-শাখা);
    ঘ. চক বাজার, ঢাকা (শাখা);
    ঙ. মিউনিসিপ্যালিটি, ঢাকা (প্রধান অফিস);
    চ. মৌলভীবাজার, ঢাকা (উপ-শাখা);
    ছ. নিউ মার্কেট, ঢাকা (প্রধান অফিস);
    জ. পরীবাগ, ঢাকা (প্রধান অফিস);
    ঝ. বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা;
    ঞ. রমনা, ঢাকা (শাখা); এবং
    ট. সদরঘাট, ঢাকা (শাখা)
৭. ন্যাশনাল এবং গ্রীন্ডলেজ ব্যাংক লিঃ
    ক. ঢাকা (শাখা)
৮. স্টেট ব্যাংক অব ইন্ডিয়া (শাখা)
    ক. ঢাকা (শাখা)
৯. ইউনাইটেড ব্যাংক অব ইন্ডিয়া, ঢাকা (প্রধান অফিস)
১০. ইউনাইটেড ব্যাংক লিঃ
    ক. ইমামগঞ্জ, ঢাকা (শাখা);
    খ. রমনা, ঢাকা (শাখা);
    গ. নবাবপুর, রোড, ঢাকা (শাখা); এবং
    ঘ. সদরঘাট, ঢাকা (শাখা)

পূর্ব পাকিস্তানের ঢাকার অ-তফসিলি ব্যাংক অফিসের তালিকা (৩০ জুন, ১৯৬২)

১১. কর্মাশিয়াল ব্যাংক লিঃ
    ক. ঢাকা (শাখা)
১২. নাথ ব্যাংক (পাকিস্তান) লিঃ
    ক. ঢাকা (আঞ্চলিক অফিস)*

* উৎস: *Banking Statistic of Pakistan* 1961-62, pp. 115-22.

উপর্যুক্ত তালিকায় পাকিস্তান আমলে তফসিলি ও অ-তফসিলি ব্যাংক থাকলেও পূর্ব পাকিস্তানের ঢাকায় এসব ব্যাংকের প্রধান কার্যালয় ছিল না। বেশিরভাগই ছিল শাখা। নীতি-নির্ধারণের দায়-দায়িত্ব ছিল পশ্চিম পাকিস্তানের। সেখান থেকেই পরিচালনা করা হতো।

১৯৬৯ সালের *ঢাকা গেজেটিয়ারে* উল্লিখিত ব্যাংক ছাড়াও যেসমস্ত ব্যাংক ঢাকায় কাজ করত তাও উল্লেখ করা হয়:

১. দ্যা কর্মাস ব্যাংক;
২. দ্যা স্ট্যান্ডাড ব্যাংক লিঃ;
৩. দ্যা ঢাকা সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাংক; এবং
৪. দ্যা ইস্ট পাকিস্তান প্রভিনশিয়াল কো-অপারেটিভ ব্যাংক

দ্যা ঢাকা সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাংক এবং দ্যা ইস্ট পাকিস্তান প্রভিনশিয়াল কো-অপারেটিভ ব্যাংক সম্পর্কে বলা হয়, "The two Banks are the Government sponsored Co-operative Organisations which advance money to the Agriculturists as well as to the petty artisans through the affiliated banks."[৪৭]

স্বাধীনতার ঠিক পূর্ববর্তী কয়েক বছরে বাঙালি-অবাঙালি মালিকানাধীন ব্যাংকের প্রতিযোগিতায় ব্যাংক ব্যবসার কিছুটা প্রসার ঘটে। শহরাঞ্চলের বাইরে ব্যাংকের শাখা স্থাপিত হয়। কিন্তু ব্যাংক ঋণের কার্যক্রম সীমিতই থেকে যায়। কৃষি ঋণ অথবা গ্রামীণ উন্নয়নমূলক কার্যক্রমে ব্যাংক ঋণ ছিল যৎসামান্য। এমন একটা অবস্থার মধ্যেই পাকিস্তান আমলের ব্যাংকিং-এর সমাপ্তি ঘটে।

সারণি-৭

ব্যাংকিং চিত্র ১৯৭০*

(কোটি রুপি)

ক্রমিক নং	সাল	পূর্ব পাকিস্তান	মোট পাকিস্তান (পূর্ব+পশ্চিম পাকিস্তান)
১.	মোট আমানত (ডিসেম্বর, ১৯৫০)	-	১১৩.৪৮
২.	মোট ঋণ (জুন, ১৯৫৫)	-	৮৮.৪১
৩.	মোট তফসিলি ব্যাংক (ডিসেম্বর, ১৯৭০)	১২	৩৬
৪.	শাখা সংখ্যা (মার্চ, ১৯৭১)	১১০০	৩,৩৪৮
৫.	মোট আমানত (মার্চ, ১৯৭১)	২৭৫	১,৩১৭.৫
৬.	মোট ঋণ (মার্চ, ১৯৭১)	-	১,১৬৮.১৮
৭.	মোট মূলধন (ডিসেম্বর, ১৯৭০)	-	৪৮.১৩
৮.	মোট সংরক্ষিত তহবিল (ডিসেম্বর, ১৯৭০)	-	২৬.৮৩

* উৎস: আর. এম. দেবনাথ, *বাঙালির ব্যাংক ব্যবসা*, পৃ. ৫৭।

উল্লিখিত তথ্য ও অন্যান্য প্রাপ্ত তথ্য থেকে দেখা যায় যে, ১৯৪৭ সালে পাকিস্তানের যাত্রা শুরু মাত্র দুটো ব্যাংক, অর্থাৎ, ব্যাংক অব অস্ট্রেলেশিয়া ও হাবিব ব্যাংক দিয়ে। তিন বছরের মধ্যে, অর্থাৎ, ১৯৫০ সালে পাকিস্তানে ব্যাংকগুলো মাত্র ১১৩.৪৮ কোটি রুপির আমানত সংগ্রহ করে। ১৯৫৫ সালের জুনে পাকিস্তানের ব্যাংকগুলো কর্তৃক প্রদত্ত মোট ঋণের পরিমাণ মাত্র ৮৮.৪১ কোটি রুপি। ১৯৭০ সালের মধ্যে অবশ্য পাকিস্তানে 'তফসিলি ব্যাংকের' সংখ্যা ৩৬টিতে উন্নীত হয়। এর মধ্যে মাত্র ১২টি ছিল পূর্ব পাকিস্তানে কার্যরত। বারোটি কার্যরত ব্যাংকের মধ্যে ১টি ছিল বাঙালি মালিকানাধীন ও আরেকটি ছিল আংশিক। ১৯৭১ সালের মার্চ মাসে ৩৬টি 'তফসিলি ব্যাংকের' মোট শাখা সংখ্যা ছিল ৩,৩৪৮টি। এর মধ্যে মাত্র ১১০০টি শাখা ছিল পূর্ব পাকিস্তানে। আমানতের ক্ষেত্রে ১৯৭১ সালের মার্চ মাসে পাকিস্তানের ব্যাংকগুলোর সর্বমোট আমানত ছিল ১,৩১৭.৫ কোটি রুপি। এর মধ্যে পূর্ব পাকিস্তানে অবস্থিত ব্যাংকগুলোর আমানত ছিল ২৭৫ কোটি রুপি। এদিকে ১৯৭০ সালের ডিসেম্বরে সর্বমোট পরিশোধিত মূলধন ও সংরক্ষিত তহবিল ছিল ৪৮.১৩ ও ২৬.৮৩ কোটি রুপি।[৪৮]

জনসংখ্যার ভিত্তিতে তুলনা করলে একটি বিষয় পরিষ্কারভাবে ধরা পড়ে, ১৯৭০ সালের দিকে পাকিস্তানের মোট জনসংখ্যার ৫৫% ছিল বাঙালি। অথচ তৎকালীন পশ্চিম পাকিস্তানে যখন ৩৬টি ব্যাংক কার্যরত তখন পূর্ব পাকিস্তানে মাত্র ১২টি। আবার শাখার দিক থেকে পূর্ব পাকিস্তানে যখন মাত্র ১১০০ শাখা কার্যরত তখন পশ্চিম পাকিস্তানে কার্যরত ২,২৪৮টি। আর আমানতেরক্ষেত্রে পূর্ব পাকিস্তানে কার্যরত ব্যাংকগুলোর আমানত যখন মাত্র ২৭৫ কোটি রুপি, তখন পশ্চিম পাকিস্তানে কার্যরত ব্যাংগুলোর আমানতের পরিমাণ ১০৪২.৫ কোটি রুপি।[৪৯]

উপরে উল্লিখিত ব্যাংক ছাড়াও পাকিস্তান আমলের শুরুতে আরো কিছু প্রতিষ্ঠান ঋণ প্রদান করত।

পাকিস্তান ইন্ডস্ট্রিয়াল ফাইনান্স কর্পোরেশন (Pakistan Industrial Finance Corporation): এই সংস্থাটি ১৯৪৯ সালে গঠিত হয়। শিল্পে স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদী ঋণের সুযোগ-সুবিধা প্রদানের উদ্দেশ্যে এটি প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৫৪ সালের ৫ জানুয়ারি পর্যন্ত শিল্প সংশ্লিষ্ট আবাসনের জন্য এই কর্পোরেশনের মাধ্যমে যে অর্থ মঞ্জুর করা হয় তার পরিমাণ হলো ৩৮.১ মিলিয়ন রুপি।[৫০]

১৯৫২ সালে পাকিস্তান ইন্ডাস্ট্রিয়াল ফাইন্যান্স কর্পোরেশন এ্যাক্ট ১৯৪৯ অনুযায়ী একত্রীভূত বা একত্রীভূত না এমন সকল শিল্পকে আর্থিক সহযোগিতা ও ঋণ প্রদান করতে এই কর্পোরেশনের ক্ষমতা বাড়ানো হয়। এই আইনের মাধ্যমে মূলত কর্পোরেশনকে সরকারি সীমাবদ্ধ ব্যবসা প্রতিষ্ঠান/ কোম্পানি বা সমবায় সমিতিকে ঋণ প্রদান করার ক্ষমতা প্রদান করা হয়। আইন সংশোধনীর পর কর্পোরেশন কয়েকটি ক্ষেত্রে যে পরিমাণ ঋণ অনুমোদন করে তা একটি রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়: "The Corporation sanctioned loans

amounting to about Rs. 3.3 million to individuals and Rs. 10.3 million to private limited companies as against Rs. 4.3 million for public limited companies."[৫১]

অপরদিকে ১৯৫২ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় পাকিস্তান ইন্ডস্ট্রিয়াল ডিভেলপমেন্ট কর্পোরেশন যা দেশের শিল্প সংক্রান্ত উন্নয়নে ঋণের সুযোগ-সুবিধা প্রদানের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করে। এটি সাড়ে ৮ বছর একটি প্রতিষ্ঠান হিসেবে কাজ করে। ১৯৫৯ সালের ডিসেম্বরের শেষের দিকে পিআইডিসি ৫০টি প্রকল্প সম্পাদন করে এবং বিনিয়োগ করে ৯৯৮.৪ মিলিয়ন রুপি।[৫২]

হাউজ বিল্ডিং ফাইনান্স কর্পোরেশন (House Building Finance Corporation): এটা ১৯৫২ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। এর কার্যক্রম শুরু হয় ফেডারেল রাজধানী এলাকায়। অন্যান্য/ বিভিন্ন প্রদেশের গুরুত্বপূর্ণ শহরগুলোতে-এর ব্যবসা সম্প্রসারণ করে এবং ঢাকা ও লাহোরে দুটি আঞ্চলিক দপ্তর খোলা হয়। যতদূর সম্ভব এই কর্পোরেশন ২.৫ মিলিয়ন রুপিরও বেশি ঋণ অনুমোদন করে।[৫৩] আবাসন সমস্যা সমাধান করতে শহর এলাকায় বাড়ি তৈরির জন্য এই প্রতিষ্ঠান আর্থিক সহায়তা প্রদানের উদ্দেশ্যে দীর্ঘমেয়াদী ঋণ প্রদান করত। ১৯৬২-৬৩ সালে এই কর্পোরেশন রেকর্ড পরিমাণ ঋণ অনুমোদন করে যার পরিমাণ ছিল ৪.৮৭ কোটি রুপি। ১৯৬১-৬২ সালে যার পরিমাণ ছিল ২.৮৫ কোটি রুপি।[৫৪]

এই ঋণের মধ্যে করাচির জন্য ২১২ লক্ষ রুপি (৪৩%) পশ্চিম পাকিস্তানের জন্য ১৫৯ লক্ষ রুপি (৩২%) এবং পূর্ব পাকিস্তানের জন্য বরাদ্দ ছিল ১১৬ লক্ষ রুপি (২৪%)।[৫৫]

১৯৬৩ সালের ৩০ জুন পর্যন্ত এই প্রতিষ্ঠানের সার্বিক ঋণ বণ্টনের অনুমোদনের একটি হিসাব পাওয়া যায়: Karachi Zone Rs. 1,011 lakhs, West Pakistan Zone Rs. 455 lakhs; and East Pakistan Zone, Rs. 353 lakhs, total Rs. 1,819 lakhs.[৫৬]

এগ্রিকালচারাল ডেভলপমেন্ট ফাইনান্স কর্পোরেশন (Agricultural Development Finance Corporation): অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের মতো এই সংস্থাটি ১৯৫৩ সালের মার্চ মাসে তার কাজ শুরু করে এবং কৃষির উন্নয়ন ও কৃষিজাত দ্রব্য (উদ্যানবিদ্যা, বনবিদ্যা, মৎস্যচাষ, পশু ব্যবস্থাপনা, হাঁস-মুরগির খামার, দুগ্ধ খামার) তৈরি করে। এছাড়া কৃষির যান্ত্রিককরণের জন্য যন্ত্রপাতি সরবরাহ, পানি উত্তোলনের যন্ত্রপাতি, ট্রাক্টর, রসায়ন এবং অন্যান্য সার উৎপাদন ও বণ্টন, বীজ, কৃষিজাত হাতিয়ার/ অস্ত্র ক্রয় এবং বণ্টন এবং পশুর প্রজনন ক্রিয়া ইত্যাদির জন্য কৃষকদেরকে ঋণের সুযোগ সুবিধা প্রদান করে।

সাধারণত এই কর্পোরেশন দ্রব্যের মাধ্যমে ঋণ দিত। আবার নগদ অর্থও প্রদানকরত। ঋণের পরিমাণ ব্যক্তিগত ক্ষেত্রে ১,০০,০০০ রুপি এবং কোনো কোম্পানি বা সমবায় সমিতির ক্ষেত্রে অর্ধ মিলিয়ন রুপি পর্যন্ত অনুমোদন করা হতো। তবে বিশেষ সময় সরকার এই আইন শিথিল করে। যথাক্রমে ২,০০,০০০ রুপি এবং ২ মিলিয়ন রুপি পর্যন্ত করতে

পারত। ১৯৫৪ সালে ব্যক্তিগত/ স্বতন্ত্র ধরনের ক্ষেত্রে সুদের হার ৬.২৫% থেকে ৫% হ্রাস করা হয় এবং সমবায় সমিতির ক্ষেত্রে ৪% হ্রাস করা হয়।[৫৭]

এই প্রতিষ্ঠানের প্রধান অফিস ছিল করাচি এবং দেশের বিভিন্ন ইউনিটের প্রয়োজনীয় চাহিদা পূরণ করতে ৩টি আঞ্চলিক অফিস ঢাকা, লাহোর এবং সুক্কুরে অবস্থিত ছিল।

এই সময় দেশের কৃষি ঋণের সমস্যা ছিল ব্যাপক এবং জটিল। এই প্রতিষ্ঠান তার কার্যক্রমের প্রথম বছর ২.৫ মিলিয়নেরও বেশি রুপি ৫৩০ জন কৃষকের জন্য অনুমোদন করে। সুতরাং এসব প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে পাকিস্তান আমলের শুরুতে কৃষি ও শিল্পের উন্নয়নের বিভিন্ন পদক্ষেপ নেওয়া হয়।

পাকিস্তান ইন্ডাস্ট্রিয়াল ক্রেডিট এন্ড ইনভেস্টমেন্ট কর্পোরেশন (Pakistan Industrial Credit and Investment Corporation): এটি ১৯৫৭ সালের অক্টোবরে স্থাপিত হয়। বেসরকারিখাতে নতুন ও বিদ্যমান পুরাতন শিল্পের উন্নয়নে আর্থিক সহায়তা প্রদানে এটি গঠিত হয়। এক বছর এবং অর্ধ বছরের চেয়েও কম সময়ের মধ্যে ১৯৫৯ সালের মার্চ মাসে এই প্রতিষ্ঠান ৪৮.২ মিলিয়ন পরিমাণ রুপি অনুমোদন করে। যার মধ্যে ৩৩.৮ মিলিয়ন রুপি অথবা ৭০% ছিল বৈদেশিক বিনিয়োগ।[৫৮]

আবার ১৯৬৩-৬৪ সালের একটি রিপোর্টে উল্লেখ করা হয় যে:

> Sixty per cent of the capital has been subscribed by private Pakistani investors, while the remaining forty per cent is held by private interests in the U. S. A., the U. K., Japan and West Germany and the I. F.C. (International Finance Corporation). The International Finance Corporation (IFC) became a shareholder of P.I.C.I.C in 1963 when it was allotted shares worth Rs. 20 lakhs.[৫৯]

পিআইসিআইসি (P.I.C.I.C) বোর্ড অব ডিরেক্টর ২০ জন পরিচালক নিয়ে গঠিত। যার মধ্যে ১২ জনকে পাকিস্তানি শেয়ারহোল্ডার-এর মাধ্যমে, ৪ জন বিদেশী শেয়ার হোল্ডারের মধ্যে একজন আইএফসি (I.F.C)-এর মাধ্যমে এবং ৩ জন সরকারের মাধ্যমে নিয়োগ করা হয়।

এই কর্পোরেশন দেশীয় ও বিদেশী মুদ্রার মাধ্যমে দীর্ঘ ও মাঝারি মেয়াদী ঋণ প্রদান করত। বড় প্রকল্পের অর্থায়নের ক্ষেত্রে বিদেশী প্রতিষ্ঠানের সাথে ভাগাভাগি করে নিত। এছাড়া কর্পোরেশন যেসব কাজ সম্পাদন করে সে সম্পর্কে বলা হয়:

> The Corporation also underwrites shares as part of its programme to assist in the development of the capital market. P.I.C.I.C. has received two long-term loans totaling Rs. 6 crores from the Central Government. These loans are subordinated to all its other liabilities and the share capital and hence count as equity for all purposes. It has also received several lines of credit in foreign currencies from the World Bank, U.S. Agency for International Development (A.I.D) and some friendly countries.[৬০]

নিম্নে দেশসমূহ থেকে পি.আই.সি.আই.সি ঋণ গ্রহণ করত:

সারণি-৮

পি.আই.সি.আই.সির মাধ্যমে বৈদেশিক গৃহীত ঋণ*

দেশ/সংস্থা	মিলিয়ন ডলার	মিলিয়ন রুপি
আই.বি.আর.ডি	৪৯.২০	২৩৪.২৮
ইউ.এস.	২১.৭০	১০৩.৩৩
পশ্চিম জার্মানি	২৫.০০	১১৯.০৬
জাপান	১২.০০	৫৭.১২
ফ্রান্স	৮.০০	৩৮.১০
ইউ.কে.	২.৫০	১১.৯১
মোট	**১১৮.৪০**	**৫৬৩.৮০**

পি.আই.সি.আই.সির মোট সম্পদের পরিমাণ ছিল ৬৭.১২ কোটি। নিম্নে দেখানো হলো–

পরিশোধিত মূলধন ও মজুদ	৪.৭৪ কোটি রুপি
দীর্ঘ মেয়াদী সরকারি ঋণ	৬.০০ কোটি রুপি
বৈদেশিক ঋণ	৫৬.৩৮ কোটি রুপি
মোট	**৬৭.১২ কোটি রুপি**

শুরু থেকে পি.আই.সি.আই.সি. ১৯৬৪ সালে ৩১ মার্চ পর্যন্ত ৫৯.৩৯ কোটি রুপি অনুমোদন করে। যার মধ্যে ৫৫.৮৭ কোটি রুপি বৈদেশিক মুদ্রা ছিল এবং স্থানীয় মুদ্রা ছিল ৩.৫২ কোটি রুপি।[৬১]

এছাড়া পি.আই.সি.আই.সি. ১০টি প্রকল্পের জন্য সুদবিহীন ০.৮৮ কোটি রুপি দিয়ে সহায়তা করে। ১.৬৩ কোটি রুপি দিয়ে সরকারি পাঁচটি ইস্যুর দায়িত্ব সম্পূর্ণ গ্রহণ করে। এছাড়া বড় ধরনের ৬টি প্রকল্পের বাস্তবায়নের জন্য বিদেশ থেকে ১৩.৭৫ কোটি রুপির ব্যবস্থা করে। ১৯৬৪ সালের ৩১ মার্চ পর্যন্ত পি.আই.সি.আই.সি. মোট সহায়তার পরিমাণ ছিল ৭৪.১৫ কোটি রুপি।[৬২]

* উৎস: Economic Survey of Pakistan, 1963-64, p. 157.

নিম্নের তালিকার মাধ্যমে বিষয়টি স্পষ্ট করে তুলে ধরা হলো:

সারণি-৯

পি.আই.সি.আই.সির সহায়তা:*

বৈদেশিক ঋণ	৫৫.৮৭ কোটি রুপি
দেশীয় ঋণ	৩.৫২ কোটি রুপি
সমতার ভিত্তিতে সরাসরি অংশগ্রহণ	০.৮৮ কোটি রুপি
১.৬৩ কোটি রুপি পি.আই.সি.আই.সির কর্তৃক সর্বসাধারনের জন্য অবলিখন করা।	০.১৩ কোটি রুপি
পি.আই.সি.আই.সির প্রজেক্টের জন্য সরাসরি বিদেশ থেকে ঋণ	১৩.৭৫ কোটি রুপি
মোট	**৭৪.১৫ কোটি রুপি**

এছাড়া পি.আই.সি.আই.সি. কিছু গুরুত্বপূর্ণ অর্থায়নের চিত্র হলো:[৬৩]

1. æOf the projects financed, thirteen were joint ventures resulting in inflow of foreign capital of Rs. 2.80 crores besides valuable technical know-how and Co-operation.
2. As many as 187 were new projects and in 72 of these, the entrepreneurs were entering the industrial field for the first time.
3. Of 372 projects (with a total investment of nearly Rs. 146.11 crores) financed by P.I.C.I.C. 176 had been completed up to March 31, 1964 and were in production.
4. P.I.C.I.C. endeavours to broaden the base of industrial ownership by requiring as a condition of finance that larger enterprises should be public limited companies with a general issue of shares to the public. As a result, 42 enterprises have been, or will soon be, converted into joint stock companies; the shares of 22 companies are already listed on the Stock Exchange."

উল্লেখ্য ১৯৫২ সালে পাকিস্তান সরকার একটি স্টক-এক্সচেঞ্জ প্রতিষ্ঠা করে। এর উদ্দেশ্য ছিল ঢাকায় পাকিস্তানি শেয়ার ও জামিন দলিলপত্রের (Securities) কারবার চালান এবং সেই সাথে স্থানীয় ব্যবসায়ী ও অর্থনীতিকে সহায়তা করা।[৬৪]

উপরের অর্থায়ন ছাড়াও পি.আই.সি.আই.সি.'র মাধ্যমে মঞ্জুরীকৃত ঋণ বিভিন্ন শিল্পের মধ্যে বণ্টন করা হয়। ১৯৬২ সালে পি.আই.সি.আই.সি. পূর্ব পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহন শিল্পের আধুনিকায়ন ও সম্প্রসারণের জন্য ৩.৪৩ কোটি রুপি প্রদান করে। ১৯৬৪ সালের ৩১ মার্চ পর্যন্ত দেখা যায় যে, বস্ত্রশিল্পের জন্য ২১.৬২ কোটি রুপি এবং অন্যান্য শিল্পের মধ্যে আখ এবং আখ দ্বারা উৎপাদিত দ্রব্য (৯.৪৬ কোটি রুপি); ইঞ্জিনিয়ারিং, ধাতু এবং

* উৎস: Economic Survey of Pakistan 1963-64, p. 157.

ইলেকট্রিকাল ইন্ডাস্ট্রির জন্য (৫.৬৩ কোটি রুপি); সিমেন্ট, কাচ, মাটি, সিরামিক (৪.৩৭ কোটি রুপি); কাগজ এবং কাগজজাত দ্রব্য (৪.৩৪ কোটি রুপি); কেমিক্যাল এবং ফার্মাসিউটিকল (৪.০৩ কোটি রুপি); খাদ্যদ্রব্য এবং খাদ্যের প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্পের জন্য (৩.৭৮ কোটি রুপি) এবং অন্যান্য শিল্পের জন্য (২.৭৩ কোটি রুপি) ঋণ প্রদান করে।[৬৫]

সুতরাং, পি.আই.সি.আই.সি. পাকিস্তান তথা পূর্ব ও পশ্চিমের শিল্পের আধুনিকীরণের জন্য বিভিন্ন অর্থ দিয়ে সহায়তা করত।

উপর্যুক্ত আলোচনা থেকে দেখা যায় যে, দেশভাগের আগে পূর্ববাংলা তথা ঢাকায় তেমন কোনো উল্লেখযোগ্য ব্যাংক ছিল না। যা ছিল তা যৎসামান্য এবং তাদের কর্মপরিধি ছিল সীমিত। কেননা দেশভাগের আগে সকল ব্যবসা-বাণিজ্য থেকে শুরু করে ব্যাংক ব্যবসা কলকাতা কেন্দ্রিক ছিল। সে কারণে রিজার্ভ ব্যাংক অব ইন্ডিয়ার (১ এপ্রিল ১৯৩৫) কোনো শাখা ঢাকায় প্রতিষ্ঠিত হয়নি। দেশভাগের পর থেকে, অর্থাৎ, ১৯৪৭ সাল থেকে রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের সাথে সাথে ব্যাংক ব্যবসার ক্ষেত্রে বড় ধরনের পরিবর্তন দেখা যায়। উল্লেখ্য ১৯৪৭ সালে দেশভাগের পর রিজার্ভ ব্যাংক অব ইন্ডিয়া ১৯৪৮ সাল পর্যন্ত পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় ব্যাংক হিসেবে কাজ করে। ১৯৪৮ সাল থেকে ১৯৭১ পর্যন্ত তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের মুদ্রা ও ব্যাংকিং ব্যবস্থা স্টেট ব্যাংক অব পাকিস্তানের দ্বারা পরিচালিত বা নিয়ন্ত্রিত হতো। বিভিন্ন তথ্য থেকে জানা যায় যে, ১৯৬৯ সাল পর্যন্ত ঢাকায় ১৩টি ব্যাংক ছিল ; তার বেশিরভাগই ছিল শাখা, উপশাখা, অন্যান্য অফিস। এদের বেশির ভাগেরই সদর দপ্তর পশ্চিম পাকিস্তানে অবস্থিত। মাত্র দুটো বাণিজ্যিক ব্যাংকের সদর দপ্তর ঢাকায় অবস্থিত ছিল। এগুলো হলো ইস্টার্ন ব্যাংকিং কর্পোরেশন লিমিটেড (Eastern Banking Corporation Limited) ও ইস্টার্ন মার্কেন্টাইল ব্যাংক লিমিটেড (Eastern Mercantile Bank Ltd.)। এই দুটি ব্যাংকের শাখা সংখ্যা ছিল যথাক্রমে ২১ ও ৫৮টি। উল্লেখ্য যে, পূর্ব পাকিস্তান তথা ঢাকায় ১৩টি ব্যাংকের মধ্যে ২টি আর্থিক প্রতিষ্ঠান ও বাকিগুলো বাণিজ্যিক ব্যাংক ও সমবায় প্রতিষ্ঠান। আর এই দুটি আর্থিক প্রতিষ্ঠান হলোঃ Industrial Development Bank of Pakistan অপরটি হলো Agricultural Development Bank of Pakistan, এবং স্বাধীনতার উত্তরকাল পর্যন্ত I.D.B.P ও A.D.B.P-সহ পশ্চিম পাকিস্তানি মালিকানাধীন ব্যাংক ছিল ১২টি। ১৯৬৯ সাল পর্যন্ত ঢাকায় ৫টি বিদেশী ব্যাংক কার্যকর ছিল।[৬৬] (1) The State Bank of India; (2) The Central Bank of India; (3) The United Bank of India; (4) The National Bank and Grindlay's Ltd.; and (5) The Australasia Bank Ltd.

এই দুটো ব্যাংক সরকারি মালিকানাধীন ছিল। স্বাধীনতার পূর্বে ঢাকায় কোনো বাণিজ্যিক ব্যাংক ছিল না। কিন্তু স্বাধীনতার পরে ঢাকায় ১২টি বাণিজ্যিক ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয়। তবে এসব ব্যাংকের বেশিরভাগেরই শাখা ঢাকাসহ সারা পাকিস্তানে ছিল। এই শাখার মাধ্যমে ঢাকার ব্যবসা চলত। এছাড়া আরো দেখতে পাওয়া যায় কতগুলো ভারতীয় ও বিদেশী ব্যাংকের শাখা ছিল। তবে আর. এম. দেবনাথ উল্লেখ করেন যে, এসব ভারতীয় ব্যাংক

বস্তুত অকার্যকর ছিল। ১৯৬৫ সালে পাকিস্তান-ভারত যুদ্ধের পর সরকার এগুলোকে 'শত্রু সম্পত্তি' বলে ঘোষণা করে।[৬৭] ব্যাংকগুলোর ব্যবস্থাপনার ভার দেওয়া হয় 'ডেপুটি কাস্টডিয়ান'-এর উপর। কারণ এগুলো ছিল অবসায় (লিক্যুইডেশন) কার্যক্রমের অধীনস্ত।

কৃষি ও শিল্প ব্যাংক দুটো ক্ষেত্রেই উন্নয়নের জন্য যথেষ্ট পদক্ষেপ গ্রহণ করে। তবে এক্ষেত্রে পূর্ব পাকিস্তানের চেয়ে পশ্চিম পাকিস্তানকেই বেশি সুবিধা দেওয়া হয়। যেকোনো ব্যাংকের শাখার নীতি নির্ধারণী, কাজ, মুদ্রা ও ব্যাংকিং জাতীয় যাবতীয় গুরুত্বপূর্ণ কাজ হতো করাচিতে। ঢাকা কার্যালয় শুধু ঐসব সিদ্ধান্ত কার্যকর করত। মূল কেন্দ্রীয় ব্যাংকিংয়ের কাজে ঢাকা কার্যালয়ের ভূমিকা ছিল খুবই সীমিত। তাছাড়া পাকিস্তান আমলে যেসব ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয় তার অধিকাংশেরই মালিক অবাঙালি পাকিস্তানি (১০টি) ও বাঙালি মালিকানাধীন ছিল ২টি (Eastern Marcantile Bank Ltd. & Eastern Banking Corporation)। পাকিস্তান আমলের সব ব্যাংক (১২) ছিল ব্যক্তিমালিকানাধীন।

পাকিস্তান আমলে (১৯৪৭-৭১) সীমিত আকারে ব্যাংক ব্যবসাতে বাঙালি উদ্যোক্তাদের যে যাত্রা শুরু হয়, স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার পর তা রুদ্ধ হয়ে যায়। শুধু পাকিস্তানী অনুপস্থিত মালিকদের ১০টি বাণিজ্যিক ব্যাংক নয়, প্রাক স্বাধীনতাকালের বাঙালী মালিকানাধীন দুটো ব্যাংকসহ অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠানও স্বাধীনতা উত্তরকালে জাতীয়করণ করা হয়। ফলে পাকিস্তান আমলে ব্যাংক ব্যবসাতে অর্জিত বাঙালির স্বল্প অভিজ্ঞতা স্বাধীনতা উত্তর বাংলাদেশে কাজে লাগানোর আর সুযোগ থাকেনি। স্বাধীনতার পর দেখা যায়, ব্যাংক, শিল্প-কলকারখানা, আমদানি-রপ্তানি প্রতিষ্ঠান ও অন্যান্য উল্লেখযোগ্য আর্থিক সম্পদের সিংহভাগের পাকিস্তানী মালিকরা অনুপস্থিত। তাদের বিষয় সম্পত্তি ও সম্পদের ভবিষ্যৎ নির্ধারণ করা জরুরি হয়ে পড়ে।

একথা সকলেরই জানা যে, স্বাধীনতার ঠিক পর মুহূর্তে দেশ ছিল অর্থনৈতিকভাবে বিপর্যস্ত ও সামাজিকভাবে অস্থির। ভবিষ্যৎ স্বপ্নে মানুষ উচ্চাভিলাষী এবং এক শ্রেণীর সুযোগ সন্ধানী মানুষ সম্পদ গ্রাসে বেপরোয়া। এমতাবস্থায় অনেকের মতে, বেসরকারী খাতে পরিত্যক্ত সম্পদ ছেড়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত মারাত্মক পরিণতি বয়ে আনতে পারে। তাছাড়া নীতি নির্ধারকদের সামনে ছিল পাকিস্তানী আমলের রাজনৈতিক একটি অভিজ্ঞতা। পুরো পাকিস্তান আমলে বেসরকারি বড় ব্যবসা ও শিল্প সম্বন্ধে বাঙালির মনে ছিল বিরূপ ধারণা। বলাবাহুল্য ব্যাংকিং খাত-এর বাইরে ছিল না। ব্যাংকগুলো সম্বন্ধে তখন অনেক অভিযোগ ছিল। এদের শাখাগুলো বেশিরভাগই ছিল মফস্বল শহরে। গ্রামাঞ্চলে শাখা ছিল খুব কম। গ্রামের উন্নয়ন ও দরিদ্র জনসাধারণের মঙ্গলে ব্যাংকের কোনো ভূমিকা ছিল না। অভিযোগ ছিল ব্যাংকগুলো মানুষের কাছ থেকে শুধু আমানত সংগ্রহ করে এবং বড় লোককে ঋণ দিয়ে আরও বড় করে। কিছু পরিবার ব্যাংকের মাধ্যমে অর্থনৈতিক ক্ষমতা কুক্ষিগত করে দরিদ্র শ্রেণীর লোক, সাধারণ মানুষ ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীকে শোষণ করত। শিল্পায়নের নামে ব্যাংকগুলো বাংলার সম্পদ লুটপাট করত। এসব অভিযোগের প্রেক্ষাপটে ব্যাংক, বীমা, পাট, অন্যান্য শিল্প এবং আমদানি-রপ্তানি ব্যবসা জাতীয়করণের দাবি ওঠে।

এই দাবিগুলো এতই জোরালো হয়ে ওঠে যে, ৬ দফা আন্দোলনের (১৯৬৬) পর ১৯৬৯ সালে গণ-অভ্যুত্থানের সময় যে ১১ দফা প্রণীত হয় তাতে অন্যতম প্রধান দফা হিসেবে ব্যাংক জাতীয়করণের দাবি অন্তর্ভুক্ত করে। বলা বাহুল্য ১১ দফা আন্দোলন ছাত্রদের কর্তৃক সূচিত হলেও দেশবাসীও দাবিগুলোর প্রতি অকুণ্ঠ সমর্থন জানায়। বস্তুত ১১ দফা আন্দোলনই বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলন ও মুক্তিযুদ্ধের প্রেক্ষাপট রচনা করে। তখন মুখে মুখে ছিল পাকিস্তানের ২২ পরিবারের শোষণের কাহিনী। ঘটনাক্রমে এই ২২টি পাকিস্তানি পরিবারই নিয়ন্ত্রণ করত ব্যাংক ব্যবসাসহ পাকিস্তানের সিংহভাগ ব্যবসা-বাণিজ্য ও শিল্প। ২২ পরিবার বিরোধী আন্দোলনে ১১ দফা ছিল একটি মাইল ফলক। এই ১১ দফার ভিত্তিতে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের সকল ছাত্র সংগঠন একত্রিত হয়। ছাত্রদের ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের ফলে সাবেক পূর্ব পাকিস্তানের রাজনীতি এক অভাবনীয় মোড় নেয়। এর ফলস্বরূপ আওয়ামী লীগ ১৯৭০ সালের নির্বাচনে পূর্ব পাকিস্তান আইন পরিষদের নিরঙ্কুশ এবং পাকিস্তান জাতীয় পরিষদে সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে। এই সংখ্যাগরিষ্ঠতাই ধীরে ধীরে মুক্তিযুদ্ধের দিকে মোড় নেয়।

তবে একথা উল্লেখ করতে হয় যে, যত বাধাবিপত্তির কথা আমরা বলি না কেন পাকিস্তান আমলেই পূর্ব পাকিস্তান তথা ঢাকার ব্যাংক ব্যবসা প্রসার লাভ করে। যদিও তা সীমিত পরিসরে। কেননা আলোচ্য সময়ের শুরু থেকে ঢাকায় তেমন কোনো উল্লেখযোগ্য ব্যাংক ছিল না, ছিল ক্ষুদ্র পরিসরে। তখন ব্যাংক ব্যবসা পরিচালিত হতো কলকাতাকে কেন্দ্র করে। তাই বলা যায় যে, পাকিস্তান আমলের সীমিত ব্যাংক ব্যবসার জ্ঞান নিয়েই পরবর্তীতে স্বাধীন বাংলাদেশের ব্যাংক ব্যবস্থা তথা কেন্দ্রীয় ব্যাংক গড়ে ওঠে। কেননা বাংলাদেশের পক্ষে সাময়িকভাবে স্টেট ব্যাংক অব পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় ব্যাংক হিসেবে কাজ করার কোনো সুযোগ ছিল না। উপমহাদেশে এই ধরনের একটি নজির ছিল। ১৯৪৭ সালে ভারত ভাগের পর *রিজার্ভ ব্যাংক অব ইন্ডিয়া* (আর.বি.আই) ১৯৪৮ সাল পর্যন্ত পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় ব্যাংক হিসেবে কাজ করে।[৬৮] কিন্তু বাংলাদেশের ক্ষেত্রে ১৯৭১ সালে ১৬ই ডিসেম্বরের পর এটি সম্ভব ছিল না। পাকিস্তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে স্বাধীনতা অর্জন করায় বাংলাদেশ পাকিস্তানের কোনো উত্তরাধিকারী রাষ্ট্র ছিল না। সরকারিভাবে পাকিস্তান ও বাংলাদেশের মধ্যে ক্ষমতা হস্তান্তরে ও ক্ষমতা গ্রহণের কোনো ঘটনা এখানে ছিল না। এমতাবস্থায় কালবিলম্ব না করে কেন্দ্রীয় ব্যাংক গড়ে তোলা জরুরি হয়ে পড়ে। কেন্দ্রীয় ব্যাংক গঠন প্রক্রিয়া শুরু হয় ঢাকাস্থ *স্টেট ব্যাংক অব পাকিস্তান*-এর প্রাদেশিক কার্যালয় ঘিরে। পূর্ব পাকিস্তানের ঢাকাস্থ কার্যালয়টি ছিল ডেপুটি গভর্নরের কার্যালয়। তাছাড়া ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা ও বগুড়াতে ৪টি শাখা ছিল এবং সিলেট ও রাজশাহীতে ছিল দুটো নিয়ন্ত্রণাধীন কার্যালয়। মূল কেন্দ্রীয় ব্যাংকিংয়ের কাজে ঢাকা কার্যালয়ের ভূমিকা ছিল সীমিত। অথচ এই কার্যালয়টিকে ১৯৭১ সালে ১৬ ডিসেম্বর দেশ সম্পূর্ণ শত্রুমুক্ত হলে পূর্ণ কেন্দ্রীয় ব্যাংকের দায়িত্ব নিতে হয়। শুধু কেন্দ্রীয় ব্যাংকের দায়িত্ব নয়, পুরো ব্যাংক ব্যবস্থার পুনর্বাসনের দায়িত্বও জরুরি ভিত্তিতে বর্তায় এই কার্যালয়ের উপর। এটি করতে গিয়ে আইনগত জটিলতার সৃষ্টি হয়। তা দূরীকরণের লক্ষ্যে ১৯৭১ সালে ১৭ই ডিসেম্বরে

রাষ্ট্রপতির আদেশ (বাংলাদেশ ব্যাংক টেম্পরারি-অর্ডার) বলে কেন্দ্রীয় ব্যাংক গঠন করা হয়। অবশ্য এ আদেশ ১৬ ডিসেম্বর থেকে কার্যকর করা হয়। অর্থাৎ 'বাংলাদেশ ব্যাংক' সাময়িকভাবে কেন্দ্রীয় ব্যাংক হিসেবে কাজ শুরু করে ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর থেকে (বিজয় দিবস)। ১৯৭২ সালের ৩১শে অক্টোবর জারিকৃত রাষ্ট্রপতির ১২৭ নং আদেশ বলে এটি একটি পরিপূর্ণ কেন্দ্রীয় ব্যাংকে পরিণত হয়।[৬৯] এই আদেশের মাধ্যমে সাবেক 'স্ট্রেট ব্যাংক অব পাকিস্তান' এর বাংলাদেশ সম্পর্কিত সকল 'দায়িত্ব ও কর্মভার', সকল 'সম্পদ ও অধিকার' অধিগ্রহণ করা হয়। ব্যাংকের প্রধান কার্যালয় স্থাপিত হয় ঢাকায়। ব্যাংকটি যাত্রা শুরু করে ৩ কোটি টাকার পরিশোধিত মূলধন নিয়ে, যার পুরোটাই সরকার কর্তৃক পরিশোধিত।

সুতরাং, বলা যায় পাকিস্তান আমলের ব্যাংক ব্যবস্থার অভিজ্ঞতা নিয়েই স্বাধীন বাংলাদেশের ব্যাংক গঠন করা হয়। এই সময়ই বাণিজ্যিক ব্যাংক গড়ে উঠলে ব্যবসার সম্প্রসারণ ঘটে। পূর্ব পাকিস্তানে আধুনিক ধরনের মাঝারি ও ভারি শিল্পকারখানা গড়ে ওঠে এই ব্যাংকগুলোকে ঘিরে যা ১৯৭১ সালের স্বাধীন বাংলাদেশের অর্থনীতিতে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখবে।

তথ্যনির্দেশ

১. S.N. Gupta, *The Banking 'Law': Theory and Practice*, New Delhi, 1994 উদ্ধৃত, আর.এম. দেবনাথ, *বাঙালির ব্যাংক ব্যবসা*, নবযুগ প্রকাশনী, ২০০৩, পৃ. ১২

২. জেমস ওয়াইজ, *পূর্ববঙ্গের বিভিন্ন জাতি, বর্ণ ও পেশার বিবরণ*, অনুবাদঃ ফওজুল করিম, ইউনিভার্সিটি প্রেস লি., ডিসেম্বর ২০০২, পৃ. ১৮৬

৩. *পূর্বোক্ত*

৪. *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৮৬-১৮৭

৫. আর.এম. দেবনাথ, *বাঙালির ব্যাংক ব্যবসা*, পূর্বোক্ত, পৃ. ২২

৬. *পূর্বোক্ত*, পৃ. ২২

৭. শরীফ উদ্দিন আহমেদ, *ঢাকা ইতিহাস ও নগরজীবন* (১৮৪০-১৯২১), একাডেমিক প্রেস এন্ড পাবলিশার্স লাইব্রেরি, ঢাকা, ২০০৬, পৃ. ১১৬

৮. মুসতাসীর মামুন, *ঢাকার স্মৃতি-বিস্মৃতির নগরী*, অনন্যা প্রকাশনী, জুলাই ২০০৮, পৃ. ২৮

৯. শরীফ উদ্দিন আহমেদ, *ঢাকা ইতিহাস ও নগরজীবন* (১৮৪০-১৯২১), পূর্বোক্ত, পৃ. ১২৫

১০. *পূর্বোক্ত*

১১. আর. এম. দেবনাথ, *বাঙালির ব্যাংক ব্যবসা*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪০

১২. *ঢাকা প্রকাশ*, ১৬ জুলাই ১৯৩৯, ৩১ শে আষাঢ়, ১৩৪৬

১৩. *ঢাকা প্রকাশ*, ২৯শে ডিসেম্বর ১৯৩৫, ১৩ই পৌষ, ১৩৪২

১৪. *ঢাকা প্রকাশ*, ৩০ মে, ১৯৪৩, ১৬ জ্যৈষ্ঠ ১৩৫০

১৫. আর. এম. দেবনাথ, *বাঙালির ব্যাংক ব্যবসা*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪১

১৬. *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৫৩

১৭. *Economic Survey of Pakistan 1963-64, DUL,* p. 152.

১৮. *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৫২

১৯. *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৫২
২০. *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৫২
২১. *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৫২
২২. *The State Bank of Pakistan: Its Growth, Function and Organisation,* Development of Research, State Bank of Pakistan, *DUL,* pp. 18-27
২৩. *পূর্বোক্ত*, পৃ.১৮-২৭
২৪. *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৮-২৭
২৫. *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৩০
২৬. *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৮-২৭
২৭. *Pakistan* 1953-54, Pakistan publication, Karachi, *DUL,* p. 33.
২৮. *Pakistan Trade,* October 1960, *DUL,* p. 147.
২৯. *Pakistan* 1953-54, Pakistan publication, Karachi, p. 33.
৩০. *পূর্বোক্ত*, পৃ. 33
৩১. আর.এম. দেবনাথ, *বাঙালির ব্যাংক ব্যবসা*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৫
৩২. *Pakistan Trade,* October 1960, op. cit., p. 147
৩৩. *Economic Survey of Pakistan* 1963-64, Economic Adviser to the Government of Pakistan, Ministry of Finance, Rawalpindi, *DUL,* p. 160
৩৪. *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৬০
৩৫. *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৬০
৩৬. *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৬০
৩৭. *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৬০
৩৮. *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৬০
৩৯. *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৬০
৪০. *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৬১
৪১. *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৬২
৪২. *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৬৩
৪৩. *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৬৪
৪৪. *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৬৪
৪৫. *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৬৪
৪৬. *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৬৬
৪৭. S.N.H Rizvi, *East Pakistan District Gazetteers, Dacca 1969*, p. 244
৪৮. আর.এম. দেবনাথ, *বাঙালির ব্যাংক ব্যাবসা*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৭.
৪৯. *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৫৭
৫০. *Pakistan* 1953-54, Pakistan Publication, Karachi, p. 34
৫১. *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৩৪
৫২. *Pakistan Trade,* October 1960, op. cit., p. 148
৫৩. *Pakistan*, 1953-54, p. 35.

৫৪. *Economic Survey of Pakistan,* 1963-64, p. 166
৫৫. *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৬৬
৫৬. *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৬৬
৫৭. *Pakistan, 1953-54,* pp. 34-35
৫৮. *Pakistan Trade,* October 1960, p. 148
৫৯. *Economic Survey of Pakistan,* 1963-64, p. 156
৬০. *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৫৭.
৬১. *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৫৮.
৬২. *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৫৮
৬৩. *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৫৮
৬৪. এ কে এম গোলাম রব্বানী, 'ঢাকার অর্থনৈতিক পরিবতন/বিবর্তন পাকিস্তান আমল: ১৯৪৭-১৯৭১', এম মোফাখখারুল ইসলাম ও ফিরোজ মাহমুদ (সম্পাদিত), *রাজধানী ঢাকার ৪০০ বছর ও উত্তরকাল (২য় খণ্ড), অর্থনীতি ও সংস্কৃতি*, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ২০১২, পৃ. ৪৪
৬৫. *Economic Survey of Pakistan,* 1963-64, p. 158
৬৬. S.N.H Rizvi : *East Pakistan District Gazetteers, Dacca 1969,* p. 245
৬৭. আর.এম. দেবনাথ, *বাঙালির ব্যাংক ব্যাবসা*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৮
৬৮. পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৯
৬৯. পূর্বোক্ত, পৃ. ৬২

বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি পত্রিকা, দ্বাত্রিংশ খণ্ড, শীত সংখ্যা, পৌষ ১৪২১/ডিসেম্বর ২০১৪

আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের গল্পে মুক্তিযুদ্ধ ও উত্তরকাল

সান্‌জীদা মাসুদ*

সারসংক্ষেপ

আখতারুজ্জামান ইলিয়াস বাংলাদেশের একজন অসামান্য কথাশিল্পী, যাঁর অধিকাংশ গল্প মুক্তিযুদ্ধ ও মুক্তিযুদ্ধোত্তর সমাজ-রাজনীতির নান্দনিক উপস্থাপনায় ভাস্বর। তাঁর গল্পে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে, কখনো ন্যারেটিভে, কখনো পরিপ্রেক্ষিত হিসেবে কার্যকর থেকেছে দেশ-মাটি-মানুষ-মুক্তিযুদ্ধ; ব্যাপক অর্থে বাংলাদেশ। অভিজ্ঞতা ও বোধশক্তির সংশ্লেষে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও দর্শনকে স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশের সমাজ, রাজনীতি ও জনজীবনের সঙ্গে অঙ্গীভূত করেই ইলিয়াস তাঁর গল্পের ন্যারেটিভ নির্মাণ করেন। তাঁর দৃষ্টিতে স্বাধীনতা আন্দোলন গণমানুষের স্বপ্ন-আশ্রিত এক গণ-আন্দোলনের নাম, জনগোষ্ঠীর লড়াইয়ের স্পন্দন। একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ তাঁর চেতনালোকে সাহসিকতার সঞ্চার করলেও, মুক্তিযুদ্ধোত্তর বিভঙ্গ সমাজকাঠামো তাঁকে করেছে সংক্ষুব্ধ। সুস্থির কিংবা সুসজ্জিত জীবন-মঞ্চ নয়, তাঁর গল্পের মূলনীতি হিসেবে চিহ্নিত করা যায় স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা, গৌরবগাথা ও উত্তরকালের আশাভঙ্গের বহুবিধ চিত্র। ইলিয়াসের গল্প তাই হয়ে উঠে গণস্বপ্নের আখ্যানভাগ, যার মধ্য দিয়ে প্রকটিত হয়েছে সাহস আর ক্ষোভের শিল্পপ্রতিমা। বিবিধ অনুভব-উপলব্ধি এবং বাস্তব অভিজ্ঞতার সমন্বয়ে গড়ে ওঠা তাঁর গল্পসমূহের আয়ুধ হিসেবে আবিষ্কার করা যায় মুক্তিযুদ্ধের সমকাল ও উত্তরকাল, যা এ প্রবন্ধে যৌক্তিকভাবে বিবেচিত হয়েছে।

আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের গল্পসম্ভারের অন্যতম প্রধান অনুষঙ্গ হলো মুক্তিযুদ্ধ। মুক্তিযুদ্ধ ছিল ইলিয়াসের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার অংশ। সুতরাং, বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের অন্তরঙ্গ চিত্র তাঁর রচনায় স্বাভাবিকভাবেই প্রত্যাশিত। আর পাঠকের এই প্রত্যাশাকে ছোটগল্পে যোগান দেওয়ার ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন দ্বিধাহীন ও পরিশ্রমী কথাশিল্পী। তিনি অধিকাংশ গল্প লিখেছেন যুদ্ধোত্তর সময়ে। ফলে তাঁর গল্প কেবল মুক্তিযুদ্ধের প্রত্যক্ষ ঘটনার কিংবা ইতিহাসাশ্রিত বয়ান নয়, বরং তা মুক্তিযুদ্ধোত্তর সমাজ-রাজনীতির নান্দনিক উপস্থাপনায় ভাস্বর। অভিজ্ঞতা ও বোধশক্তির সংশ্লেষে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও দর্শনকে স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশের সমাজ, রাজনীতি ও জনজীবনের সঙ্গে অঙ্গীভূত করে ইলিয়াস তাঁর গল্পের ন্যারেটিভ নির্মাণ করেন। স্বাধীনতাকামী একটি জাতিসত্তার হৃৎস্পন্দনকে শিল্পরূপায়ণের জন্যে যে গভীর জীবনাকাঙ্ক্ষার দরকার, তা যেমন ইলিয়াসের ছিল, তেমনি স্বাধীনতা

* প্রভাষক, বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ, সাউথইস্ট ইউনিভার্সিটি, ঢাকা

লাভের পর সেই জাতিসত্তার স্বপ্ন ও স্বপ্নভঙ্গের টানাপোড়েনকে শিল্পরূপ প্রদানের দক্ষতাও তিনি সমানভাবে আয়ত্ত করেছিলেন। এবং তাই তিনি যেসব গল্প লিখেছেন, তাতে তাঁর চিন্তা-মনস্তত্ত্ব, প্রত্যাশা-হতাশা সবকিছুই নিয়ন্ত্রিত হয়েছে মুক্তিযুদ্ধের স্বপ্ন সাহস ও এর পরিণতির দ্বারা। মুক্তিযুদ্ধকালীন এবং মুক্তিযুদ্ধ-উত্তর সময়ে সমাজে ও জীবনে যেসব সংকট ও অসঙ্গতি দেখা দিয়েছিল, কখনো কখনো সেসব সমস্যা ও সংকট তাঁর গল্পে ঠাঁই পেয়েছে মুক্তিযুদ্ধের চেতনার অনুষঙ্গী হয়েই। অর্থাৎ, একাত্তর ও একাত্তর-পরবর্তী বাংলাদেশের বহুবিধ চিত্র তাঁর গল্পে স্থান পেয়েছে। বলা যেতে পারে, তাঁর গল্পকার সত্তার অন্যতম প্রধান প্রণোদনাই হচ্ছে মুক্তিযুদ্ধ ও মুক্তিযুদ্ধোত্তর বাংলাদেশের চালচিত্র। মুক্তিযুদ্ধ তাঁর চেতনালোকে যেমন সাহসিকতা সঞ্চার করেছে, মুক্তিযুদ্ধোত্তর বিভঙ্গ সমাজকাঠামো তেমনি তাঁকে করেছে ক্ষুব্ধ। এর প্রতিফলন ঘটেছে তাঁর অধিকাংশ গল্পে। আর তাই তাঁর গল্পগুলো পরিণত হয়েছে সাহস ও ক্ষোভের ডিসকোর্সে। বর্তমান প্রবন্ধের মূললক্ষ্য তাঁর গল্পসম্ভার বিশ্লেষণ করে এই চিন্তাকেই যুক্তি সহকারে উপস্থাপন করা।

ইঙ্গ-পাক ঔপনিবেশিক পরাভব ও স্বাধীন বাংলাদেশের উদ্ভবকালের প্রত্যক্ষদর্শী কথাসাহিত্যিক ইলিয়াসের জন্ম ১৯৪৩ সালে। ইতিহাসের এক সংকটাপন্ন কালপর্ব এটি। জীবিত অবস্থায় তিনি অবলোকন করেছেন রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন, সামরিক শাসন, গণ-অভ্যুত্থান, ১৯৭১-এর মুক্তিযুদ্ধ ও তৎপরবর্তী বাংলাদেশের চালচিত্র। এছাড়া পঠন-পাঠনসূত্রে ধারণা লাভ করেছিলেন দাঙ্গা ও দুর্ভিক্ষ বিষয়ে। টালমাটাল এই সময়ের দহন সংবেদনশীল ইলিয়াসের হৃদয়কে তপ্ত করেছে এবং সেই উত্তাপকে তিনি সঞ্চারিত করেছেন ছোটগল্পে। *আমি ও আমার সময়*–এ ইলিয়াস জানিয়েছেন: 'আমার সময় ১৯৭১ সালের স্বাধীনতা যুদ্ধ দিয়ে আঁকা। সাড়ে চার বছর বয়স থেকেই 'চাঁদ তারা শাদা আর সবুজ নিশান' বলে গলা হাঁকড়িয়ে মরেছি, সেই নিশানের ফাঁস গলায় দিয়ে মারা হলো অসংখ্য মানুষকে।'[১] একাত্তরে তিনি অবস্থান করছিলেন ঢাকা শহরে। মুক্তিযোদ্ধাদের সঙ্গে গোপন যোগাযোগ ছিল তাঁর, এমনকি তাঁদের নিজ বাড়িতে আশ্রয় দেওয়ার মতো ঝুঁকিও গ্রহণ করেছিলেন আনন্দের সঙ্গে, ব্যক্তিহৃদয়ের একান্ত দায়বোধ থেকে। দেখা যায় যে, ইলিয়াস ছোটগল্পে সবচেয়ে বেশি মহিমান্বিত করলেন আমাদের এই মুক্তিযুদ্ধকে। সমাজতান্ত্রিক বিপ্লববাদী চেতনায় আস্থাশীল ইলিয়াস বুর্জোয়া নেতৃত্বে সংঘটিত হওয়া মুক্তিযুদ্ধকে সমর্থন করছেন। রাজনৈতিক আদর্শিক দিক থেকে তিনি ছিলেন চীনপন্থী বাম ঘরানার সমর্থক। নিজে যে ঘরানার রাজনীতি করতেন, সেই ঘরানার অনেকেই মুক্তিযুদ্ধকে ইতিবাচক দৃষ্টিতে দেখে উঠতে পারেননি। কিন্তু মুক্তিযুদ্ধের প্রশ্নে বরাবরই ইলিয়াস ছিলেন দ্বিধাহীন; স্বাধীনতার প্রশ্নে ছিলেন দৃঢ় প্রতিজ্ঞ।

অপরদিকে, নকশালবাড়ি আন্দোলনের অভিজ্ঞতা সংবেদনশীল ইলিয়াসের চৈতন্যকে আলোড়িত করেছে ব্যাপকভাবে। মুক্তিযুদ্ধকালীন ও মুক্তিযুদ্ধ-উত্তর সার্বিক জীবনচেতনাকে ইলিয়াস নিরলসভাবে তাঁর অভিজ্ঞতার সকল নির্যাস ঢেলে সাজিয়েছেন ছোটগল্পের

অন্তর্বয়নে। আলোচনার সুবিধার জন্যে তাঁর গল্পে মুক্তিযুদ্ধের প্রসঙ্গ দু'টি পর্যায়ে বিভক্ত করা হলো:

ক) যুদ্ধকালীন প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার রূপায়ণ; এবং
খ) মুক্তিযুদ্ধ-উত্তর সমাজ ও রাজনীতির রূপায়ণ।

১.

আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের মুক্তিযুদ্ধের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাসঞ্জাত গল্পের সংখ্যা স্বল্প। তিনি মুক্তিযুদ্ধকে সরাসরি পটভূমি হিসেবে ব্যবহার করেছেন "অপঘাত"(*দোজখের ওম*) ও "রেইনকোট" (*জাল স্বপ্ন, স্বপ্নের জাল*) গল্পদ্বয়ে। মুক্তিযুদ্ধের মধ্যবর্তীকালে মিলিটারি কর্তৃক বগুড়া জেলার পাশের একটি গ্রামের আক্রমণের সচিত্র বর্ণনা রয়েছে "অপঘাত" গল্পে। যুদ্ধকালীন ঘটনার বিবরণ নয়, বরং ঘটনার প্রতিক্রিয়া বিশ্লেষিত হয়েছে এ গল্পের ন্যারেটিভে। মিলিটারি-আতঙ্কিত, লাশের গন্ধে ভারি হয়েওঠা বাংলার জনপদের রূপকল্প নির্মাণ করেছেন তিনি গল্পের অনেকটা জায়গা জুড়ে:

> মিলিটারি এসে গ্রামকে গ্রাম উজাড় করে দিচ্ছে... মিলিটারি কলেরার মতো আসে, ম্যালেরিয়ার মতো আসে। যে গ্রামে একবার হাত দেয় তার আর কোনো চিহ্ন রাখে না।... শনিবার দিনগত রাত্রে সিঙড়া ক্যাম্প থেকে মিলিটারি এসে গোটা গোটা গ্রাম জ্বালিয়ে দিলো।[২]

মিলিটারি-ম্যালেরিয়া-কলেরা একই রেখায় বিধৃত হয়েছে এখানে। মিলিটারিরা বাঙালির ওপর যে ধ্বংসযজ্ঞ, গণহত্যা চালিয়েছিল তা সংক্ষিপ্ত ও সরল বাক্যবন্ধে ধারণ করেছেন তিনি। এ রকম বেশ কিছু টুকরো টুকরো কোলাজধর্মী দৃশ্যপটের আশ্রয়ে মুক্তিযুদ্ধের সময়পটকে এক স্বতন্ত্র ন্যারেটিভে এ গল্পে সার্থকতার সঙ্গে জীবন্ত করে তুলতে সমর্থ হয়েছেন ইলিয়াস। তিনি দৃশ্যপটগুলো এমনভাবে বিন্যস্ত করেছেন যে, মুক্তিযুদ্ধের প্রত্যক্ষদর্শী নয় কিংবা মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস অজানা এমন পাঠকের কল্পনায়ও জীবন্ত হয়ে ওঠে সংগ্রামী ও রক্তাক্ত সেই সময়। সমকালীন ভীতিকর পরিস্থিতি ও নারীজীবনের ট্র্যাজিক পরিণতির চিত্র তিনি এঁকেছেন ইঙ্গিতময় ও গ্রামীণ জীবন-অনুষঙ্গী ভাষিক কাঠামোতে:

> ... সেরপুরে জনমনিষ্যি কেউ নাই, বড়ো রাস্তায় খালি মিলিটারি, খালি মিলিটারি। তা এখানে হাইস্কুল ক্যাম্পের ক্যাপ্টেন সাহেবের সঙ্গে চেয়ারম্যানের একটু আলাপ হয়েছে, তবে ওদের সাহায্য চাইতে ভয় হয়, ঘরে সোমত্ত বয়সের মেয়েরা আছে, কিসের বিনিময়ে আবার কী চেয়ে বসে! ... বিছানা থেকে নেমে মোবারক আলি ঘরের উল্টো প্রান্তে বৌয়ের বিছানার দিকে পা বাড়ায়। তক্তপোষের কাছাকাছি যেতে পা লেগে নেভানো হ্যারিকেনটা গড়িয়ে পড়ে।... বুলুর মা বলে ওঠে, 'আস্তে হাঁটো...'বাতি জ্বালায়ো না।' স্ত্রীর ভিজে ভিজে গলায় এই সতর্ক নিষেধ শুনে মোবারক এসে দাঁড়ায় তক্তপোষের মাথায়।[৩]

শ্মশানের চেয়েও ভয়ঙ্কর নীরবতা বিরাজিত ছিল তখনকার সমাজে। এমনই ভীতিকর পরিবেশের সৃষ্টি হয়েছিল যে, প্রয়োজনে সামান্য আলোটুকু প্রজ্বলনের সাহসও মানুষ হারিয়ে ফেলেছিল। কেননা আগুন দেখে মিলিটারি যদি মানুষের অবস্থিতি টের পেয়ে যায়— এ

জাতীয় ভয় কাজ করেছে বাঙালিদের মধ্যে। হানাদার বাহিনী গণহত্যার পাশাপাশি মা-বোনের সম্ভ্রমকে আমোদের অনুষঙ্গে পরিণত করেছিল। নারীজাতির এই সম্ভ্রমহানির ঐতিহাসিক বয়ানের সত্যতা লঙ্ঘন করেননি ইলিয়াস, বরং সেটিকে মান্য করেছেন পুরো মাত্রায়। খণ্ড খণ্ড চিত্রে এভাবেই তিনি প্রমূর্ত করেন যুদ্ধকালীন বাস্তবতা। পাকবাহিনীর এই বর্বরতার চিত্র আলাউদ্দিন আল আজাদের (১৯৩২-২০০৯) "নীরবতা"(*আমার রক্ত স্বপ্ন আমার*) কিংবামাহমুদুল হকের (জন্ম ১৯৪০) "বুলু ও চড়ুই" গল্পের আখ্যানকে স্মরণ করায়। একদিকে হত্যা-বর্বরতা-অশ্লীল আমোদ, অন্যদিকে মৃত্যু-কান্না-স্বাধিকার চেতনা– সমকালীন সমাজে বিরাজমান বৈপরীত্য উল্লিখিত গল্পকারদের রচনায় যেমন, তেমনি ইলিয়াসের গল্পেও বিশিষ্ট স্বাতন্ত্র্যে রূপায়িত হয়েছে।

মিলিটারি-আক্রান্ত অঞ্চলে অজস্র অপঘাতমূলক মৃত্যুর মধ্যে "অপঘাত" গল্পে একটি স্বাভাবিক মৃত্যু ঘটে শাজাহানের। গল্পটির সিংহভাগ জুড়ে রয়েছে তার শববহনের দীর্ঘ বর্ণনা, বর্ণনশৈলীর কারণে পাঠক কখনো কখনো খেই হারিয়ে ফেলেন; মূলকাহিনী থেকে দূরে সরে যাওয়ার আপাত আশঙ্কা তৈরি হয় তার; এমনকি যানও কখনো কখনো। কিন্তু লেখকের অভিপ্রায় ভিন্ন। লেখকের উদ্দেশ্য শাজাহানের মৃত্যুকে নয়, বরং মুক্তিযোদ্ধা বুলুর মৃত্যুকে মহিমান্বিত করে তোলা। তাঁর মতে, 'ঐ যে লোকগুলো লাশ নিয়ে যাচ্ছে, তাতে যে কষ্টটা হচ্ছে আমি চাই ঐ description এর মধ্যেই সেই কষ্টটা প্রকাশ পাক। আমি সরাসরি কখনো বলতে চাই না যে ওরা কষ্ট করছে। কিংবা ঐ 'খোঁয়ারি'র বাড়ীটার যে description তাতে আমার মনে হয় না কাউকে আর বলে দিতে হবে যে বাড়ীটা জীবন্ত না। যতই তাতে মাধবীলতা থাকুক সেখানে life নেই'।[৪] তিনি শাজাহানের লাশ বহনকারীদের ক্লান্তি ও কষ্টের সঙ্গে পাঠককে একাত্ম করে দিতে চান দীর্ঘ বর্ণনার কৌশল অবলম্বনের মাধ্যমে। লক্ষণীয় যে, বক্তব্যকে সরাসরি উপস্থাপন করার প্রবণতা ইলিয়াসে স্বল্পদৃষ্ট নয়। এটাই ইলিয়াসের স্বতন্ত্র বর্ণনভঙ্গি। তিনি তাঁর অন্বিষ্ট ন্যারেটিভকে গল্পের আধার ও আধেয় উভয় ভাগেই শিল্পবিন্যস্ত করতে সচেষ্ট হন। যেমন, এ গল্পের নামকরণেও বুলুর আত্মত্যাগের ব্যঞ্জনাকে ছড়িয়ে দিয়েছেন ইলিয়াস। সাধারণ মানুষের দৃষ্টিকোণ থেকে যেটি অপঘাত বলে বিবেচিত (এমনকি বুলুর পিতার দৃষ্টিতেও), নতুন চেতনার আলোকে সেটিই যে সবচেয়ে গৌরবের, মহত্ত্বের— লেখকের অভিপ্রায় মূলত তা-ই তুলে ধরা। প্রচলিত অর্থকে ছাপিয়ে শব্দটির ভিন্ন ব্যঞ্জনাগত অর্থ নির্মাণের প্রয়াস লক্ষ্য করা যায় নামকরণে। আবার দেখা যায় যে, শহীদ বুলুর বীরত্বগাথাকেও সরাসরি তুলে না এনে লেখক আশ্রয় নিয়েছেন পিতা মোবারক আলির মনোচিন্তনের:

> জুম্মার ঘর একেবারে ভরে বারান্দায় পর্যন্ত মুসল্লিদের ভিড়। ... মোবারক আলি নামাজে উপযুক্ত মনোনিবেশ করতে পারে না। নিরাকার আল্লার জায়গায় তার চোখ জুড়ে ঝাঁঝরা-বুকে চিৎ-হয়ে-থাকা লাশ। বুলুর চুল ধুয়ে যাচ্ছে খালের পানি।... নামাজের পরও ছেলেটা ওর চোখ-ছাড়া হয় না। তা থাক না। ওর জন্য মোবারক আলির অসুবিধা হচ্ছে না।[৫]

এখানে চরিত্রের আন্তরচৈতন্যের আলোকে গল্পকার মুক্তিযুদ্ধকে মহিমান্বিত করেন অনায়াসেই। মোবারক আলির চিন্তাকাঠামোয় উদ্ভাসিত হয়েছে শহীদ বুলুর স্মৃতি। বৌডোবা খালের ব্রিজের ওপর মিলিটারির জীপ উড়িয়ে দেওয়ার পর মুক্তিযোদ্ধা বুলু শহীদ হন। গল্পের শুরুর দিকে যে মোবারক আলি ভীত ছিল, ঘটনার ক্রম-বিকাশের মধ্য দিয়ে সে সাহসী তথা অস্তিত্বকামী হয়ে ওঠে। এর মূলে রয়েছে পুত্র শহীদ বুলু তথা ব্যাপক অর্থে মুক্তিসেনাদের আত্মত্যাগ। পুত্রের এই আত্মত্যাগ তার গর্বের বিষয়। লেখক শেষ পর্যন্ত তাঁকে স্বাধীনতাযুদ্ধে পুত্রহারা অগণ্য পিতার প্রতিচ্ছবি হিসেবে চিহ্নিত করেন। মোবারক আলির রক্তাক্ত হৃদয় আর বাংলাদেশের হৃদয় ইলিয়াসের দৃষ্টিতে অভিন্ন দ্যোতনা লাভ করেছে।"রেইনকোট"(১৯৯৫) গল্পেও লেখক আত্মকথনসূত্রে একটি আপাত ছা-পোষা চরিত্রের প্রকৃত অর্থেই সাহসী হয়ে ওঠার পেছনে মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে ক্রিয়াশীল রেখেছেন সচেতনভাবে। ঢাকার একটি কলেজের রসায়নের প্রভাষক নুরুল হুদাকে লেখক কেবল একটি রেইনকোটের বরাত দিয়ে ক্রমশ সাহসী করে তোলেন। তাই মিলিটারিদের প্রহার মিন্টুর রেইনকোট পরিধানের অভিজ্ঞতালব্ধ নুরুল হুদার নিকট:

> মনে হচ্ছে যেন বৃষ্টি পড়ছে মিন্টুর রেইনকোটের ওপর। রেইনকোটটা এরা খুলে ফেলেছে, কোথায় রাখল কে জানে। কিন্তু তার ওম তার শরীরে এখনো লেগেই রয়েছে। বৃষ্টির মতো চাবুকের বাড়ি পড়ে তার রেইনকোটের মতো চামড়ায় আর সে অবিরাম বলেই চলে, মিসক্রিয়েন্টদের ঠিকানা তার জানা আছে।...তাদের সঙ্গে তার আঁতাতের অভিযোগ ও তাদের সঙ্গে তার আঁতাত রাখার উত্তেজনায় নুরুল হুদার ঝুলন্ত শরীর এতটাই কাঁপে যে চাবুকের বাড়ির দিকে তার আর মনোযোগ দেওয়া হয়ে ওঠে না।[৬]

বিপর্যস্ত জীবনের অজস্র অস্থিরতার মধ্যেও ইলিয়াস রেইনকোটের প্রতীকে নির্মাণ করেন সম্ভাবনার শিল্পমূর্তি। মুক্তিযুদ্ধকালীন মানুষের স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষার স্মারক মুক্তিযোদ্ধা মিন্টুর ব্যবহৃত রেইনকোটটি। শ্যালক মিন্টুর মুক্তিবাহিনীতে যোগদানের খবর গোপন রাখতে চারবার বাড়ি বদল করেন ভীতু নুরুল হুদা। অথচ বৃষ্টিস্নাত এক সকালে তার চৈতন্যে জেগে ওঠে এক মুক্তিযোদ্ধার সাহসী সত্তা। তাই চাবুকের আঘাত আর বৃষ্টির ফোঁটা তার চেতনায় একই রেখায় সমীকৃত হয়ে গেছে, মনোলোকে তিনি হয়ে উঠলেন পুরোদস্তুর একজন মুক্তিযোদ্ধা। মুক্তিযুদ্ধের মধ্যে তিনি যে কয়েকটি বিষয়কে 'পজেটিভ' হিসেবে দেখেছেন তার একটি হচ্ছে মানুষের এই পরিস্থিতি-সঞ্জাত সাহসিকতা। এর বিপরীতে লেখক যুদ্ধকালীন বাস্তবতায় আপোসকামী দেশদ্রোহী শ্রেণীকে চিহ্নিত করেন কলেজের পিওন ইসহাক মিয়ার প্রসঙ্গ এনে:

> মিলিটারি প্রার্দুভাবের পর থেকে তাকে দেখে কলেজের সবাই তটস্থ। এপ্রিলের শুরু থেকে সে বাংলা বলা ছেড়েছে।... প্রিনসিপ্যাল গাট্টাগোট্টা বেঁটেখাটো মানুষ, নিজের চাপরাশির সঙ্গে নতুন জবাব লব্জ করতে গিয়ে গলায় তার রক্ত উঠে যায়, 'ইসাক মিয়া, দেশতে বহুত মুসিবত হো রহা হ্যায়। প্রফেসর লোক আদমিকো হুঁশিয়ার থাকতে বলিয়ে।'... 'জরুর।' দেশলাইয়ের কাঠির মতো রোগাপটকা শরীরের ওপর ফিট-করা ভিজে বাবুদের মতো ছোট্ট মাথাটা ঝাঁকিয়ে ইসহাক আরো তিনবার সম্মতি দেয়, 'জরুর, জরুর, জরুর।'[৭]

পাকবাহিনীর কাছে আত্মবিক্রিত তোষামুদে এই শ্রেণীর প্রতি লেখকের মনোলোকের ক্ষোভ উল্লিখিত উদ্ধৃতির মধ্য দিয়ে বিশিষ্ট হয়ে উঠেছে। তোষামুদে ইসহাকের দৈহিক গড়নকে তিনি সমীকৃত করেছেন দেশলাইয়ের কাঠির সঙ্গে। দেশলাইয়ের কাঠি যেমন আগুন জ্বালাতে সাহায্য করে, তেমনি তোষামুদে, দেশদ্রোহী এই শ্রেণীটিও হানাদার বাহিনীকে সহায়তা করে স্বদেশের মাটি আর মানুষের প্রাণ নিয়ে বহ্ন্যুৎসবে মেতেছিল। স্বকীয়তা-নিজস্বতা বিস্মৃত হয়ে তারা উজ্জীবিত হয়েছিল পাকিস্তানবাদী জীবনচেতনায়। ফলে স্বাধীনতা অর্জনের পথ হয়ে উঠেছিল আরও বেশি প্রতিবন্ধকতা সংকুল। '৭১-এরএই কষ্টার্জিত অর্জন ও গৌরব '৭২-এ ভিন্ন রূপ পরিগ্রহ করে, ঘুরে যায় জনজীবনের মোড়; যা একই সঙ্গে পাল্টে দেয় ইলিয়াসের গল্পেরও বয়ন-কৌশল।

২.

ইলিয়াসের গল্পের প্রধান অংশ জুড়ে রয়েছে স্বাধীনতা-পরবর্তী সমাজ ও জীবন বাস্তবতার প্রসঙ্গ। পলেস্তরার পর পলেস্তরা খুলে স্বাধীনতা-উত্তর ছেঁড়াখোঁড়া সময়ের আঁকাড়া বাস্তবতাকে তিনি গল্পের বিষয় করেছেন। স্বাধীনতা-পরবর্তী নতুন দেশ ও জাতি গঠনের কাজ শুরু হতে না হতেই জাতির জনকের হত্যাকাণ্ড আর সেই সূত্র ধরে গণতন্ত্র-সমাজতন্ত্রের সমন্বয় প্রত্যাশী লোকতন্ত্রের অপমৃত্যুময় বাস্তবতায় দিকহীন, আশাহীন সমাজকাঠামোর উদ্ভট বিন্যাস ইলিয়াস-চৈতন্যকে স্বভাবতই করেছে ক্ষতাক্ত, বেদনার্ত। তিনি যুদ্ধ-পরবর্তী সময়কে ব্যাখ্যা করেছেন এভাবে: 'আসলে মুক্তিযুদ্ধের পরের সময়টা তো চরম frustrating; মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে আমাদের দারুণ স্বপ্ন ছিল। সে কি সীমাহীন স্বপ্ন। ... মুক্তিযুদ্ধ তো তেমন organized কিছু ছিলো না...আর মুক্তিযুদ্ধের পরের সময়টা তো চরম স্বপ্নভংগের কাল।'[৮] ইলিয়াস এই সময়কে গল্পে বিচিত্রভাবে তুলে ধরেছেন:

ক. মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক প্রত্যাশিত সমাজের অনুপস্থিতি;
খ. প্রতিক্রিয়াশীল মধ্যবিত্তের আধিপত্য বিস্তার; এবং
গ. যুদ্ধ-পরবর্তী অর্থনীতির বিভঙ্গ দশা।

ক.

'সমাজের বাণী ছাড়া আমার কম্ম নয়, সমাজের দিকে চোখ মেলে তাকালে বরং নিজেকে চিনতে সুবিধা হয়'— এ ধরনের একটি দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে ইলিয়াস যুদ্ধোত্তর সমাজের দিকে তাকিয়েছিলেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ফলে ইউরোপের সমাজ ও জীবনে যে বিরূপ পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছিল, টি.এস. এলিয়ট (১৮৮৮-১৯৬৫) যেমন সেই সমাজকে অবলোকন করেছিলেন ওয়েস্টল্যান্ড রূপে; ঠিক তেমনি মুক্তিযুদ্ধোত্তর সমাজ ইলিয়াসের চোখে ধরা দিয়েছিল বিষাক্ত ফোঁড়ারূপে। সমাজের এই বিভঙ্গ দশা ইলিয়াসকে ক্ষুব্ধ করেছে। রিকশা শ্রমিকের সংলাপে সেই ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে এভাবে:

> ... এই ফোঁড়াটা না হলে ইগল্যান ঝামেলা হয়? আপনে কোদ্দ করেন আর আগ করেন, হামি কই এই ফোঁড়া না হলে হামি আজ পোলোয়া কোর্মা না হলেও খিচড়ি আর গোরুর গোশত ব্যাটা-বিটির মুখোত ঠিকই তুল্যা দিতাম।... রিকশাওয়ালা বলে, 'দ্যাখেন না, শালার কত বড়ো ফোঁড়া!...'ভাইজান, ফোঁড়াটা দ্যাখেন, এই যে দ্যাখেন! অক্ত বারাচ্ছে গো!'[৯]

এই ফোঁড়া অবক্ষয়িত সমাজের প্রতীক। একে সমকালীন নষ্টপ্রায় সমাজের প্রতিরূপক হিসেবে না ধরলে "ফোঁড়া"(১৯৮০) গল্পের মূলভাবের সঙ্গে পাঠকের পক্ষে পুরোপুরি একাত্ম হওয়া সম্ভব হয়ে ওঠে না। প্রতীকরূপে গৃহীত এই ফোঁড়া সমাজদেহের স্ফীত ও পচনশীল অংশ যা সুস্থ ও স্বাভাবিক সমাজগতিকে ব্যাহত করেছে। ইলিয়াস লক্ষ্য করেছেন যে, আসলে একটি বক্র ও মেকী গতিতে সমাজ এগুতে শুরু করেছে। সর্বত্র একটা মিথ্যাচারের বাস্তবতা তাঁর দৃষ্টিতে প্রকট হয়ে উঠছিল।

সংখ্যালঘু-সমস্যার যে রক্তবীজ পাকিস্তান আমলেই উপ্ত হয়েছিল, মুক্তিযুদ্ধোত্তর সময়ের নানামুখী সংকটের মধ্যে সুবিধাবাদীদের তৈরি করা অনুকূল পরিবেশে তা আরও ফুলে-ফেঁপে ওঠে; অসাম্প্রদায়িক চেতনায় জন্ম নেওয়া বাংলাদেশকে আক্রমণ করে বারংবার। ইলিয়াসের দৃষ্টিতে 'minority supression'-এর মধ্যে অন্যতম। স্বাধীনতার আগে ও পরে রাজনীতির নামে সংখ্যালঘুদের ওপর নির্যাতন বহাল ছিল। '৪৬-এর দাঙ্গা, '৪৭- এর দেশভাগ উস্‌কে দেয় সাম্প্রদায়িক ভেদনীতি, যার ফলে সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর জীবনে নেমে আসে চরম বিপন্নতা। ইলিয়াস এই নষ্টপ্রায়-সমাজের প্রত্যক্ষদর্শী কথাশিল্পী। সেজন্যেই লক্ষণীয় যে, শিল্পীমনের দায়বোধ থেকে তিনি এ সংকটকে ছোটগল্পের প্রকরণে বিন্যস্ত করেছেন। তাঁর মতে, 'এখানে হিন্দুরা সাপ্রেসড আমি সেটাই বলতে চেয়েছি।... যে দেশে যে সাপ্রেশন আছে সেখানকার লেখকেরা তাই নিয়ে লিখবেন।'[১০] মূলত পাকিস্তান 'না-পাক' উদ্দেশ্য নিয়ে প্রতিষ্ঠিত প্রতিক্রিয়াশীল ঘরানার একটি রাষ্ট্র। পশ্চিম পাকিস্তান যখন পূর্ব পাকিস্তান আক্রমণ করে তখন সাধারণ মানুষের সঙ্গে বেশি করে বিপাকে পড়ে হিন্দু সম্প্রদায়। অস্তিত্বরক্ষার তাগিদে তারা আশ্রয় নেয় পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতে। এই অনিবার্য পলায়নপরতা ইলিয়াস-সৃষ্ট চরিত্রগুলোর মনোজগতে অন্তর্দাহের সৃষ্টি করেছে। স্বাধীনতা-উত্তরকালে সমরজিৎ-এর অনুভাবনায় তারই আলেখ্য নির্মিত হয়েছে "খোঁয়ারি"গল্পে:

> ফারুকের কথা সম্পূর্ণ হওয়ার আগেই সমরজিতের শরীরের রক্ত উজান উঠে বসে তার করোটির ছাদে, ছাদের বীমে এবং মেঘ হয়ে কিছুক্ষণ থমকে থেকে অবশেষে বৃষ্টিপাত শুরু করে। এই বৃষ্টির উৎস করোটির মেঘ, করোটির মেঘের উৎস তার শরীরের রক্ত। সুতরাং বর্ষণের রঙও লাল, অবিরাম লাল বৃষ্টিপাত চোখের সামনে একটি সীমাহীন জলপর্দা টাঙিয়ে দেয়। পর্দায় দ্যাখা যায়, হাজার হাজার মানুষের সঙ্গে সমরজিৎও পালিয়ে যাচ্ছে।... সাত আট মাইল পর নদীর দক্ষিণ পাড় জুড়ে দগ্ধ জনপদ, ঝলসানো গাছপালা, নদীতে গুলি-বিদ্ধ ফেঁটে-ওঠা লাশদের জলকেলি — সব মনে আছে। কিন্তু হলে কি হবে, বৃষ্টির ঘন পর্দায় সব ছায়া ফ্যালে সিল্যুয়েটের মতো। কানের পাতলা পর্দায় ঢাকের মতো বাজে কেবল ঝড়ের মধ্যে প্রবল বৃষ্টিপাত।[১১]

চরিত্রের স্মৃতিচারণা-সূত্রে এখানে যোজিত হয়েছে মুক্তিযুদ্ধের অনুষঙ্গ, যা ইলিয়াসের রচনার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। সমরজিতের করোটি মূলত তার চৈতন্য। তার চৈতন্য আলোড়িত হয় রক্তঝরা সেই যুদ্ধদিনের স্মৃতিকথায়। কল্পনার ডানায় ভর করে এভাবেই গল্পকার চরিত্রকে নিয়ে গেছেন মুক্তিযুদ্ধের পটে। স্বাধীনতার পর দেশে ফিরে এসেও স্বস্তিকর পরিবেশ পায়নি

এই মানুষগুলো। ইলিয়াসের "অন্য ঘরে অন্য স্বর"গল্পের প্রদীপের ও ননীদার পরিবারের হালচালেও এই সত্যই উঠে এসেছে:

> রাত্রে খাওয়ার পর গল্প করতে করতে ননীদা বলে, 'কিসের বিজনেস? এই দ্যাশে ক্যামনে থাকি? বিজনেস এট্টু যদি ভালো হইছে তো চান্দা লইয়া লইয়া ব্যাকটি পয়সা খসাইয়া লইবো।...সপ্তার মধ্যে তিনখান চাইরখান কনফারেন্স, সম্মেলন, সমাবেশ লাইগাই রইছে। পয়সা আদায়ের ফন্দি, বুঝলি না?'[১২]

চাঁদাবাজি, জোচ্চুরি মুক্তিযুদ্ধোত্তর সময়ের সমগ্র সমাজের চিত্র হলেও সংখ্যালঘুদের ওপর এর প্রভাব বেশি পড়েছিল। সংখ্যালঘু ননী, তার ব্যবসা ও পরিবারে নেমে আসে চরম বিপর্যয়। ক্ষমতাসীন দলের অর্থলিপ্সু ও স্বার্থান্ধ মানসিকতা সমাজের মেরুদণ্ডটি দুমড়ে মুচড়ে দিয়েছিল। বিবেকবান ও মনুষ্যত্ববোধে উজ্জীবিত মানবাত্মাকে পীড়িত করেছে এই শ্বাসরুদ্ধকর পরিবেশ। ইলিয়াস খণ্ডিত দৃষ্টিকোণ থেকে সময় ও সমাজকে বিশ্লেষণ করেননি; তাঁর দৃষ্টি ছিল সমগ্রতার দিকে। আর সেজন্যেই সদ্য-স্বাধীন দেশের চিকিৎসা ব্যবস্থার নাজুক অবস্থাও তাঁর দৃষ্টিসীমায় জায়গা করে নিয়েছে এবং সমকালীন অন্যান্য কথাসাহিত্যিকের মতো চিন্তিত ও ব্যথিত করেছে। "যোগাযোগ" গল্পে স্বল্প পরিসরে হলেও বিষয়টি পাঠকের জ্ঞাতার্থে উপস্থাপন করলেন লেখক। গল্পটির মূলবিষয় ভিন্ন হলেও লেখক সচেতনভাবে তুলে ধরেন স্বাধীনতা-উত্তর সময়ের চিকিৎসার অসঙ্গতি; তাঁর দৃষ্টিতে ঢাকার হাসপাতালগুলি যেন মানুষ মারণের ফ্যাক্টরিতে পরিণত হয়েছে। স্বাধীনতার পর এদেশের হাসপাতালগুলোতে চিকিৎসার নামে যে নির্মম-নিষ্ঠুর প্রহসন চলেছে এখানে সেদিকেই ইঙ্গিত করলেন গল্পকার। যাঁরা জীবন বাজি রেখে পরতন্ত্রমুক্ত একটি ভূখণ্ড এনেছিলেন, তাঁদের মধ্যে যাঁরা আহত অবস্থায় ফিরে এসেছিলেন, তাঁরা উত্তরকালে যথাযথ চিকিৎসা না পেয়ে কখনো কখনো বিনা চিকিৎসায় প্রাণ হারিয়েছিলেন। গুটিকয়েক বিত্তবানের দুঃশাসনে ভরা এদেশে সাধারণ কৃষক-শ্রমিক ন্যায্য চিকিৎসা পায় না। এই বাস্তবতা বিবেচনা করে লেখক মনে করেন এদের বাঁচাতে হলে মধ্যবিত্তের বা পাতি-বুর্জোয়ার মেকি বিপ্লব নয়, প্রয়োজন প্রকৃত বিপ্লব ও সাহস, যা ১৯৭১-এ বাঙালি দেখিয়েছিল পাকবাহিনীর বিরুদ্ধে।

খ.

পাকিস্তান পর্বের অর্থপিপাসুগোষ্ঠীর উত্তরাধিকার বহন করে স্বাধীনতা-উত্তর কালে গড়ে উঠতে শুরু করে একটি সুবিধাবাদী শ্রেণী। স্বার্থসর্বস্ব এই শ্রেণীটি একাত্তরের মূল্যবোধকে জলাঞ্জলি দিতে এতটুকু কুণ্ঠিত হয়নি। তারা এমনভাবে ফুলে-ফেঁপে উঠেছিল, যাকে বলা যেতে পারে 'আঙুল ফুলে কলাগাছ' হওয়া। ফলে সমাজে শোষক-শোষিতের চিরায়ত বিভাজনটি আরো প্রকট আকার ধারণ করে, যা মুক্তিযুদ্ধোত্তর সমাজে প্রত্যাশিত ছিল না। সমাজ সচেতন এই শিল্পী 'বাংলাদেশ লেখক শিবির'-এর সঙ্গে সংশ্লিষ্টতা-সূত্রে আরো গভীরভাবে পরিচিত হন সমাজস্থ শ্রেণী-ভেদনীতির সঙ্গে এবং সে অভিজ্ঞতা ও উপলব্ধিকে তুলে আনেন ছোটগল্পের কথাশরীরে। এ কথা বললে অত্যুক্তি হবে না যে, সমাজকে তিনি যেভাবে শ্রেণীসচেতন বীক্ষা থেকে বিশ্লেষণ করেছেন তা আসলে মুক্তিযুদ্ধের চেতনার সঙ্গে

প্রাসঙ্গিক। কেননা তিনি মনে করেন, 'মানুষের শাসিত স্পৃহা ও দমিত সংকল্পকে আবর্জনার ভেতর থেকে খুঁজে বার করে আনার দায়িত্বও বর্তায় কথাসাহিত্যিকের ঘাড়ে। সমাজের প্রবল ভাঙচুর, সমাজ ব্যবস্থায় নতুন নতুন শক্তি ও উৎপাদনের সংযোগ প্রভৃতির ফলে মানুষের গভীর ভেতরের রদবদলের পর্যবেক্ষণ ও অনুসন্ধানের কাজে নিয়োজিত ছোটগল্পের শরীরেও পরির্বতন ঘটতে বাধ্য।'[১৩]

স্বাধীনতা যুদ্ধকালের অদম্য ইচ্ছাশক্তি ও স্বপ্ন-সাধ-আশা-আকাঙ্ক্ষা যুদ্ধোত্তরকালে ক্রমে তা ভেজালস্বপ্নে পরিণত হয়। "জাল স্বপ্ন স্বপ্নের জাল" (*জাল স্বপ্ন স্বপ্নের জাল*)গল্পে লেখক মুক্তিযুদ্ধের ঘটনা প্রবাহ স্বাধীনতা-উত্তর নতুন প্রজন্মের সামনে মেলে ধরলেন অতীত-কথনরীতিতে (ফ্লাশব্যাক)। গল্পটির গড়নে লেখক সচেতনভাবে মুক্তিযুদ্ধের টুকরো টুকরো ঘটনা যোজনা করেছেন (যেমন, নারীদের হানাদার বাহিনীর হাতে তুলে দেওয়া, বস্তিতে আগুন দেওয়া ইত্যাদি)। এ গল্পে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য চরিত্র শহীদ মুক্তিযোদ্ধা ইমামুদ্দির সন্তান বুলেট। পিতার সংগ্রামী ভূমিকার গল্প শুনে শুনে মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে স্বপ্ন-কল্পনায় মাতে **১৯৭১** সালে জন্ম নেয়া বুলেট চরিত্রটি:

> তারা সম্পূর্ণ অদৃশ্য হওয়ার আগেই ঘুমের মধ্যেই বুলেট গড়িয়ে পড়ে অন্য স্বপ্নে। এখানে সে নিজেকে দেখতে পায় হাউস বিল্ডিং কর্পোরেশনের উঁচু ছাদের ওপর। ...আজ কি হরতাল–টরতাল আছে? মিটিং হচ্ছে নাকি? স্বপ্নের ভেতরেই এইসব ভাবনায় সে অস্থির, এই লোকটির নেতৃত্বে ওল্টানো পা-ওয়ালার একটি পার্টি বুলেটের দিকে তেড়ে এসেছিল... লোকটির পায়ের পাতাজোড়া মেরামত করতে হলে ওগুলো আগে ফেলে দেওয়া দরকার – এই বিবেচনায় বুলেট ওদিকে কী ছুঁড়বে তাই নিয়ে বেশ ভাবনায় পড়ে। ...এই রকম ভাবতে ভাবতে তার বড্ডো পেচ্ছাব চাপে। ...এক রকম বাধ্য হয়েই বুলেট ছাদ থেকে হলুদ প্রস্রাবের ধারা বইয়ে দেয় নিচের দিকে। ...এইসময় ঘুম ভেঙে গেলে বুলেট তার লুঙ্গিতে পানির অল্প তাপ পায় এবং উঠে দেখে তার লুঙ্গি তো বটেই, এমনকি তার ডানদিকে শোয়া হাশেমের মায়ের পোলা হাশেমের হাফপ্যান্ট সম্পূর্ণ ভিজে গেছে।[১৪]

ইলিয়াসের ঝোঁক যে বরাবরই ডিটেইলের দিকে; ওপরের স্বপ্নদৃশ্যে তার প্রমাণ মেলে। উত্তর প্রজন্মকে তিনি বিশ বছর পূর্বের মুক্তিযুদ্ধের সময়পটে নিয়ে গেছেন স্বপ্নডানায় ভর করে। বুলেটের অস্তিত্বের অবলম্বনও আসলে তা-ই। অপচয় আর অনিশ্চয়তার এই যুগে মুক্তিযুদ্ধের গৌরবগাথা কেবল স্মৃতিকথন কিংবা প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার গল্প হিসেবে থাকতে পারে না, গল্প তাই ঢুকে পড়ে মানুষের চৈতন্যে, ভাবনা-কল্পনায়। স্বাধীনতা-উত্তর পর্বে যে বিশৃঙ্খল রাজনৈতিক ধারা গজিয়ে উঠেছিল, সে-রাজনীতির প্রতি লেখকের মনোভাব সর্বত্র শ্রদ্ধাপূর্ণ ছিল না। সে রাজনীতি তাঁর নিকট মানবদেহের বর্জ্য তুল্য, বুলেটের প্রস্রাবতুল্য। দ্বিধাহীনভাবে তিনি এ সাদৃশ্য-সূত্র নির্মাণ করে রূঢ় বাস্তবতাকে শাণিতভাষার দীপ্তিতে ভাস্বর করে তুলেছেন। অন্যদিকে, তাঁর ইঙ্গিতময়তা আশ্চর্য রকমের ভিন্ন আর ব্যঞ্জনাময়। চরিত্রের নাম দিয়েছেন বুলেট। 'বুলেট' এই একটি মাত্র শব্দে আভাসিত হয়েছে একাত্তরের রক্তঝরা ইতিহাস। বুলেট, মুক্তিযোদ্ধার সন্তান স্বাধীনতা-উত্তর সমাজে সে আশ্রয় পায় না। তাকে জীবিকার তাগিদে আশ্রয় নিতে হয় স্বাধীনতা বিরোধী শক্তির ধারক নাজির আলির নিকট।

এই বুলেটকে নিয়ে প্রতিক্রিয়াশীল নাজির আলির ভাবনা, '... একটা মুক্তিযোদ্ধার ছেলে মানে একটা দেশের অ্যাসেট, কখন কী হয় কে জানে?'– নাজির আলির এই ভাবনার মধ্যে সংগুপ্ত রয়েছে একাত্তরের বীরযোদ্ধাদের সাহসী পদক্ষেপ। একাত্তরে যারা মুক্তিসেনাদের সাহসিকতায় ভীত ছিল, একাত্তর-পরবর্তীকালে সেই যোদ্ধাদের উত্তরাধিকারীদের নিয়েও তারা চিন্তিত থেকেছে। লেখক আবারও সেই সাহসের ডিসকোর্স নির্মাণ করলেন এখানে। দূষিত, পঙ্কিল এ রাজনীতির প্রতি লেখকের বীতরাগ সুস্পষ্ট। আর তাই প্রতিপক্ষ হিসেবে চরিত্রের হাতে তুলে দিয়েছেন '৭১-এর সেই স্টেনগান:

> আকাশের দিকে মুখ তুললে মিলি টের পায় যে চারিদিকের বাতাস চাপা হয়ে আসছে। চাঁদ তাহলে এতক্ষণে শত্রুর কব্জায় চলে গেছে। দখলকারী সেনাবাহিনীর একনাগাড় বোমাবাজিতে চাঁদের হাল্কা মাটির ধুলা এবং বারুদের কণা নিচে ঝরে পড়েছে। রোদ ও বাতাস তাই ধোঁয়াটে ও ভারি, শ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে বৈ কি! হাতের স্টেনগানের ইস্পাতে আঙুল বুলাতে বুলাতে পায়ের পাতায় চাপ দিয়ে মিলি আরো ওপরে দেখার চেষ্টা করে।...এবার একটা উড়াল দেওয়ার জন্য মিলি পা ঝাপ্টায়।[১৫]

স্বাধীন দেশ এখানে চাঁদের রূপকল্প হিসেবে গৃহীত হয়েছে। স্বাধীনতার পর বেশিরভাগ সময় সেনাশাসন থাকায় ভূলুণ্ঠিত হয়েছিল গণতান্ত্রিক বোধ ও জনগণের প্রত্যাশাসমূহ। সুবিধাবাদী একটি শ্রেণী মেকী দেশপ্রেম আর অপরাজনীতিতে লিপ্ত হয়ে দুর্বিষহ পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছিল। মিলির ভাই ও তার ভাইয়ের নামহীন বন্ধুমহল এই কলুষিত রাজনীতিকে লালন করেছে। এই শ্রেণীর প্রতি লেখকের বিরূপ মনোভাব সহজেই অনুমেয়।

মিলির মতো কিশোরীর হাতে ইলিয়াস তুলে দিলেন অস্ত্র। বিষয়টি বিশেষভাবে ইঙ্গিতপূর্ণ। মিলি এখানে রূপক, সে (নারী) সততার প্রতীক। ইলিয়াস কলুষিত এই সমাজ-রাজনীতির প্রেক্ষাপটে মিলিকে গড়লেন নিষ্কলুষ প্রতিমা রূপে। আবার, আব্বাস পাগলা একজন মুক্তিযোদ্ধা। কিন্তু মুক্তিযুদ্ধোত্তরকালে সে সকলের দৃষ্টিতে একটি অস্বাভাবিক চরিত্রে পরিণত হয়েছে। সমাজের দৃষ্টিতে অসুস্থ, অস্বাভাবিক চরিত্র হলেও জীবনচেতনায় সেও কিন্তু এই গল্পে শুভ্র ও শুদ্ধতার প্রতীকী ধারক। তার এই সততা হয়ত সমাজের মানুষের কাছে হাস্যরসের উদ্রেক ঘটায়। কিন্তু এর মধ্য দিয়ে যে বার্তাটি ইলিয়াস পৌঁছে দিতে চান তা হলো: আব্বাস স্টেনগান চাচ্ছে কল্যাণের জন্যে, আর যুবকরা অস্ত্র চাচ্ছে অকল্যাণের জন্যে। মিলি ও আব্বাস পাগলা এ গল্পে লেখকের অভীষ্ট লক্ষ্য পূরণের হাতিয়ার। অথচ সুস্থ জীবনে ফিরে আসার পর সে যুবকদের সঙ্গে মিলে ব্যবসা করতে চাচ্ছে। দেখা যাচ্ছে যে, অসুস্থ অবস্থায় সে শুদ্ধসত্তা লালন করেছে, যা সে হারিয়ে ফেলে সমাজ-প্রত্যাশিত সুস্থতার কালে। আশেপাশের মানুষ তার যে অস্বাভাবিকত্ব নিয়ে বিদ্রূপ করেছে, তা-ই প্রকৃতপক্ষে আব্বাসের সবচেয়ে কাম্য অবস্থা। মূলত আব্বাস পাগলার মতো শুদ্ধ দেশচেতনায় জাগ্রত মানবচৈতন্য এই শ্বাসরুদ্ধকর পরিস্থিতিতে অস্বাভাবিক হয়ে উঠেছিল, হারিয়ে ফেলেছিল জীবন-জ্যামিতির স্বাভাবিক সূত্রসমূহ। এখানে মিলি ও আব্বাসের ব্যক্তিক স্বরের মধ্য দিয়ে প্রতিবিম্বিত হয়েছে সামষ্টিক স্বাধিকার ও প্রতিবাদী চেতনা।

বিপর্যস্ত এই সময়ের সন্তান যে মধ্যবিত্ত শ্রেণী, তারা হয়ে ওঠে অন্তঃসারশূন্য-দ্বিধাসংকুল-কল্পনায় বিভোর, আদর্শচ্যুত-চাটুকার। এরাই যুদ্ধোত্তর বাংলাদেশের কাণ্ডারীরূপে চিহ্নিত। অথচ এই শ্রেণীটি প্রায়শই হয়ে পড়ে মেরুদণ্ডবিবর্জিত, কেঁচো সদৃশ। তাদের প্রতি লেখকের মনোভাব শ্লেষাত্মক। মস্কোপন্থী বাম রাজনীতির নামে যারা মাতোয়ারা হয়েছিল ("প্রতিশোধ" গল্পে ওসমানের ভগ্নিপতি হাশেম) নষ্ট-নৈতিকতাহীন ও সুবিধাবাদী রাজনীতিতে, তাদের প্রতি লেখকের এক ধরনের তির্যক দৃষ্টিকোণ এ গল্পে খুব সহজেই লক্ষণীয়। আবার উত্তরকালের উদ্ভিন্ন মধ্যবিত্তের মধ্যে ইলিয়াস লক্ষ্য করেছেন ক্ষোভ। কিন্তু সেই ক্ষোভ কেবল তাদের মগ্নচৈতন্যকে আচ্ছন্ন করে থাকে। যেমন, "প্রতিশোধ" গল্পে ঘাতক ভগ্নিপতির প্রতি ওসমানের মননভূমির ক্রোধ বা ক্ষোভ লক্ষণীয়:

> রড নিয়ে খেলতে খেলতে হঠাৎ একেবারে অতর্কিতে হাশেমের মাথায় ১টা লাগিয়ে দাও। অথবা রডের ১টা মাথা যদি ঠিকমতো সেঁধিয়ে দেওয়া যায় ওর মাথার ঠিক মাঝখানটায়... ওসমান এই দৃশ্য কখনো চোখে দ্যাখেনি, সিনেমাতেও না। তবু বেশ বোঝা যায়, তীক্ষ্ণ ধারায় প্রবাহিত হয় রক্ত; মাথার ওপর ঘোলাটে শাদা পাখা লাল হয়ে গেলো। পাখার ঘুরন্ত ব্লেডের কল্যাণে রক্তাক্ত হলো চারদিকের দেওয়াল, গড়িয়ে নিচে পড়ে গেলো ওসমানের লাশ। বুকের হৃদপিণ্ড ছিঁড়ে যায় এই দৃশ্য দেখে, সে ওপরে তাকালো।... বিচলিত হয়ে ওসমান একটু ঝুঁকে নিচে দেখলো। খুব ব্যস্ত হাতে তাড়াতাড়ি করে সে ছুঁড়ে ফেললো লোহার রডটা।[১৬]

যুদ্ধ-পরবর্তী উঠতি ধনবাদী সমাজের প্রতিভূ আবুল হাশেমের প্রতি তীব্র প্রতিহিংসা, প্রতিশোধস্পৃহা ওসমানের মনোজগতকেই আলোড়িত-বিলোড়িত করে। কিন্তু তার মনোচিন্তনের বাস্তব রূপ দুর্নিরীক্ষ্য। ভেতরে ভেতরে প্রতিবাদচেতনাকে লালন করলেও প্রকাশ্যে তারা মূলত আপোসকামী হয়। এ হলো মধ্যবিত্তীয় দোলাচলবৃত্তি। পুরো গল্পটি জুড়ে রয়েছে কেবল প্রতিশোধ না নিতে পারার নিষ্ফল আস্ফালন। এই অর্ন্তদ্বন্দ্বের ফলে অধিকাংশ সময় ইলিয়াসের চরিত্ররা হয়ে ওঠে বিকারগ্রস্ত।

গ.

সাধারণ মানুষ কোনো বিশেষ স্বার্থকে সামনে রেখে যুদ্ধ করেনি। পরবর্তীকালে লক্ষ লক্ষ শহীদের রক্তের বিনিময়ে অর্জিত স্বাধীনতা আর মুক্তিযুদ্ধের দর্শনকে খেলো রাজনীতিতে পরিণত করেছিল ক্ষমতাসীন একটি চক্র। আর এতে করে মুক্তিযোদ্ধার অকল্পনীয় ত্যাগ-তিতিক্ষা নিদারুণভাবে ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। অনেক সাধের স্বাধীনতার মধ্য দিয়ে অর্থনৈতিক মুক্তি মেলেনি। মুক্তিযুদ্ধোত্তর কালে মুষ্টিমেয় ব্যক্তির স্বার্থ, দুর্নীতিপরায়ণ মানসিকতা ইত্যাদির ফলে বৃহত্তর জনজীবনে চরম হতাশার সৃষ্টি হয়েছিল। অনুপম সেনের ভাষ্যে– "রাষ্ট্রের অনুকূলে আজ যখন মুষ্টিমেয় ভাগ্যবান ব্যক্তির ঐশ্বর্য ও আকাঙ্ক্ষা গগন স্পর্শ করছে তখন দেশের জনগণ ক্রমশ ক্রমবর্ধমান বৈদেশিক ঋণ, ক্ষুধা, মূর্খতা, দারিদ্র্য ও স্বাস্থ্যহীন নির্জীবতার অতল অন্ধকারে তলিয়ে যাচ্ছে।"[১৭] বস্তুত দেশ স্বাধীন হলেও নিম্নবিত্তের জীবনের কোনো পরিবর্তন ঘটে না, তাদের এতটুকু স্বাদ-আহ্লাদও অপূর্ণ থেকে

যায়। যাদের চেতনায় মুক্তিযুদ্ধ আর বেঁচে থাকা সমার্থক দ্যোতনা লাভ করেছিল,কিন্তু উত্তরকালের পরিস্থিতি ছিল তাদের স্বপ্নের উল্টোপিঠ। এই পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করে "ঘরগেরস্থি" (*নামহীন গোত্রহীন*) গল্পে হাসান আজিজুল হক যেসব প্রশ্ন তুলে দিয়েছেন রামশরণের কণ্ঠে তার বাস্তবঘনিষ্ঠ প্রান্তটি প্রসঙ্গত উল্লেখ্য:

> স্বাধীন হইছি আমরা — ঘৃণায় আর রাগে রামশরণের গলায় আওয়াজ চিড় খেয়ে গেল, স্বাধীন হইছি তাতে আমার বাপের কি? আমি তো এই দেহি, গত বছর পরাণের ভয়ে পালালাম ইন্ডেয় — নটা মাস শ্যাল কুকুরের মতো কাটিয়ে ফিরে আলাম স্বাধীন দ্যাশে। আবার সেই শ্যাল কুকুরের ব্যাপার।...স্বাধীনটা কি, আঁ? আমি খাতি পালাম না — ছোওয়াল মিয়ে শুকিয়ে মরে, স্বাধীনটা কোঁয়ানে? রিলিফের লাইনে দাঁড়াও ফকিরের মতো... আমি বলতিছি কি- স্বাধীন হইছি না কি হইছি আমি বোঝবো কেমন করে? আগে এট্টা ভিটে ছিলো, এখন তাও নেই। আমি স্বাধীন কিসি?[১৮]

স্বাধীন দেশ নিয়ে সাধারণ মানুষের স্বপ্ন-কল্পনা যখন ব্যর্থতার চূড়ান্ত পর্যায়ে উপনীত হয়, তখন কখনো কখনো তারা প্রতিবাদী হয়ে ওঠে। ফলে সমাজের অন্তস্তলে অনিবার্যভাবে দানা বাঁধতে শুরু করেছিল ভূমিহীন আর গুটিকয়েক ভূপতির মধ্যকার দ্বন্দ্ব। এই দ্বান্দ্বিক সমাজকাঠামো প্রতীকী উন্মোচন লক্ষণীয় "পায়ের নিচে জল"গল্পে। পাটগাছ ক্ষেতের প্রায় সব ফসলকে ছাপিয়ে যেমন বেড়ে ওঠে, তেমনি যুদ্ধোত্তরকালে কতিপয় স্বার্থান্বেষী ব্যক্তির উত্থান ঘটে মানবসমাজে। আলতাফ মৌলবির সূত্রে বাংলাদেশের গ্রামীণ জোতদারের শোষণ প্রক্রিয়া এখানে চিহ্নায়িত হয়েছে। তাঁর মতে, জোতদার স্বাধীনতার পূর্বে ও পরে আর্থ-সামাজিক পটে দুর্লভ ছিল না। তাঁর রাজনৈতিক বিশ্বাসবোধের একটি বিশেষ জায়গা জুড়ে বিরাজিত এই বঞ্চনার ইতিহাস। প্রকৃত অর্থে নিম্নবর্গীয় জীবনকাঠামো সবকালে, সবযুগে একই; রিক্ততাই তাদের একমাত্র চিহ্নায়ক। এদেশের মানুষ পরতন্ত্রের হাত থেকে মুক্ত হয়ে আটকে পড়েছে ধনতন্ত্রের কবলে। দখলদারিত্বমূলক মনোভাব হলো উঠতি জমিদারতন্ত্রের মৌল চারিত্র্য। মুসলিম লীগ, কমিউনিজম, নব্য-স্বাধীন দেশের ক্ষমতাসীন দল — ইতিহাসের এইসব দ্বন্দ্বপূর্ণ রাজনৈতিক মাত্রাগুলোকে অভিন্ন আখ্যানে সুবিন্যস্ত করে ইলিয়াস মূলত জোতদারি মানসিকতার বয়ান করেছেন "দখল"(*দুধেভাতে উৎপাত*) গল্পে:

> ... বয়স্ক লোকটি তার কথায় আমল না দিয়ে বলে, 'তুমি বাপ্ তোমার দাদার সাথে হাত মিলাও ক্যা কও? তোমার দাদা তোমাক সম্পত্তি দিবি? তোমার চাচা,– তাঁই পয়সার জোঁক, পিঁপড়ার গোয়া টিপ্যা তাঁই গুড়ের অস বার করে, তাঁই তোমাক জমির ভাগ দিবি?[১৯]

ইলিয়াসের কথনবিশ্ব এমনই: সতত জনজীবন সংলগ্ন, মৃত্তিকাশ্রয়ী, প্রাকৃত মানুষের জীবনানুষঙ্গী, সাবলীল ও সহজবোধ্য গুণে ঋদ্ধ। শোষক শ্রেণীকে তিনি রক্তচোষা জোঁকের সঙ্গে সমীকৃত করেছেন। তিনি আমৃত্যু অবলম্বন করেছেন শোষিতের পক্ষ– তাঁর শিল্পীসত্তার মানবতাবোধের মূলসূত্র এখানেই নিহিত। এই চেতনাবোধের অংশীদার হিসেবে তিনি কখনো কখনো শোষিত শ্রেণীকে ঐক্যবদ্ধ করে তুলেছেন। 'স্বাধীন দেশের মধ্যে শালারা

আরেক দেশ বানায়'— এই বোধে উপনীত হয়ে তাই তাঁর গল্পে সংগ্রামে লিপ্ত হয় শোষিতেরা।

> মোয়াজ্জেম হোসেন এসব ভাবতে না ভাবতে পশ্চিমদিকে অজস্র মানুষের সমবেত পদধ্বনি এবং রাইফেলের আওয়াজ কানে আসে।... মানুষের চিৎকার এখন খুব প্রকট। তাহলে কাঁঠালপোঁতার মানুষ কি বিলের সবটা দখল করে এবার এপারে চলে আসছে? ... মোয়াজ্জেম হোসেন কাঁপতে কাঁপতে বলে, 'কেন?' ...'ফোর্স তো আসছে। ততোক্ষণে আমরা কি থাকবো? এই বাড়ির কিচ্ছু রাখবে না ওরা! তোমার বাপের কবর ছাড়া এই বাড়ির কিছু ছাড়বে না। সব ধ্বংস করবে। সর্বনাশ হবে।... পেছনে হাজার হাজার মানুষের হাতে কাস্তে, সড়কি, লাঠি ও দা। ইকবাল এটুকু জানে যে, এই গোষ্ঠীবদ্ধ মানুষ বড়োজোড় সকাল পর্যন্ত টিকবে।... টিকে থাকবে কেবল ওর বাপের কবর।... এই কবরে মোয়াজ্জেম হোসেনের থাকার কী অধিকার? ... বিপুল সমবেত পদযাত্রায় প্রচণ্ড ধ্বনি শুনতে শুনতে ইকবালের চোখ চকচক করে, জিভ দিয়ে সে ঠোঁট চাটে।[২০]

মুক্তিযুদ্ধকে তিনি 'glorify' করেননি, মুক্তিযুদ্ধকে নিয়ে 'objectively' চিন্তা করেছেন। মুক্তিযুদ্ধের সময় বাঙালীর সাহস ও প্রতিবাদ-প্রতিরোধের চেতনাকে ইলিয়াস ইতিবাচক দৃষ্টিতে দেখেছেন। এই দিকটিকে তিনি মহিমান্বিত করেছেন। স্বাধীনতা-পরবর্তী বিভঙ্গ সমাজ পুনর্গঠনের জন্যে তিনি জনমনে সেই চেতনার সঞ্চার করতে প্রয়াসী হয়েছেন। প্রতিরোধের চেতনাকে এখানে তিনি ব্যবহার করেছেন হাতিয়ার হিসেবে। সবকালেই শোষক শ্রেণী শোষিতের যূথবদ্ধতায় ভীত,শঙ্কিত। বামপন্থী রাজনৈতিক দর্শনের সূত্রে তিনি এ গল্পে নিম্নবর্গের সংঘবদ্ধতার চিত্র বিন্যস্ত করেছেন। তাই হাতিয়ার হিসেবে এসেছে কাস্তে-দা-লাঠি- সড়কি প্রভৃতি। তিনি অনবগত নন যে, সংঘবদ্ধ এই সংগ্রামও তাসের ঘরতুল্য; তবুও ইতিহাসের বিভিন্ন সময়ে এ ধরনের গণবিপ্লব সংঘটিত হয় অনিবার্য কারণেই।

৩.

লক্ষণীয় যে, ইলিয়াসের গল্পে সরাসরি মুক্তিযুদ্ধের প্রসঙ্গ অনেক স্বল্প পরিমাণে এসেছে; এর বিপরীতে গল্পের অন্তর্বয়নে নানা-কৌশলে স্থান পেয়েছে মুক্তিযুদ্ধ। তার মানে কি এই যে, মুক্তিযুদ্ধের ঘটনাকাল স্বল্প পরিসরের ছিল বলেই এমনটা হয়েছে? যুদ্ধকালীন নয় মাসের চেয়ে কি তাঁর নিকট যুদ্ধোত্তর দীর্ঘ সময় গুরুত্ব পেয়েছিল? মুক্তিযুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল তাঁর তারুণ্যের কালে। আর স্বাধীনতা-উত্তর সময়পর্বে তিনি ক্রমশ প্রাজ্ঞ হয়ে উঠেছেন। তাঁর প্রাজ্ঞ হয়ে ওঠার এ সময়টি ছিল নানাদিক থেকে স্বপ্নভঙ্গের কাল। মুক্তিযুদ্ধোত্তর সময়কে নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করেছেন বলেই হয়ত তাঁর গল্পে অবক্ষয়, হতাশা, ভাঙনের চিত্র এত প্রকট। বিভঙ্গ বাংলাদেশের চিত্রপটের সঙ্গে সঙ্গে তিনি তাঁর প্রত্যাশিত সমাজের কথাও বলেছেন অবলীলায়। বাঙালীর মৌলিক বিপ্লবীচেতনার মধ্য দিয়ে অর্জিত স্বাধীনতার প্রকৃত মূল্যমান প্রতিষ্ঠার জন্যে পুনরায় সেই বিপ্লবীচেতনার আবশ্যক বলে মনে করেন মার্কসবাদী এই কথাসাহিত্যিক। কেননা বিপ্লব, যুদ্ধ — এগুলোই বাঙালির স্বাতন্ত্র্য-চিহ্ন, বিপ্লবেই বাঙালির আনন্দ। এই আনন্দ অনুভব করেছিল ইলিয়াসের মিন্টু ("রেইনকোট"), বুলু

("অপঘাত") প্রমুখ চরিত্র। হাসিমুখে তারা আত্মত্যাগ স্বীকার করা সত্ত্বেও মুক্তিযোদ্ধাদের কাঙ্ক্ষিত সমাজকাঠামো গড়ে ওঠেনি। উত্তরকালে সামগ্রিকভাবে বিপন্ন এক সমাজপটে অবস্থান করে দোজখের আঁচ অনুভব করেন লেখক। তাই কামালউদ্দিনের স্বপ্ন-স্মৃতিতে জাগ্রত হয় পঞ্চাশের মন্বন্তর, দাঙ্গা, মুক্তিযুদ্ধ প্রভৃতি সময়পট। আর তাই সে মৃত্যুর জন্যে অপেক্ষমাণ। অথচ গল্পশেষে দেখা যায় যে,সে জীবনপ্রেমী হয়ে উঠেছে। "দোজখের ওম"গল্পে এক দীর্ঘ কাহিনি বয়ানের সূত্রে এ কথাই ব্যক্ত করলেন ইলিয়াস:

> 'বাঁচুম না ক্যালায়?' কামালউদ্দিনের এই বিড়বিড় ধ্বনি ভালো করে শোনবার জন্য হানিফের মা ভাবী মুখ ঘুরিয়ে দাঁড়ালো। দ্যাখে ডান হাতে ধরা লাঠিতে ভর দিয়ে কামালউদ্দিন উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করছে।...লাঠি এবং নাতনীর ওপর ভাঙাচোরা শরীরের ভার রেখে ডান দিকের গতর ছ্যাঁচড়াতে ছ্যাঁচড়াতে সে রওয়ানা হলো নিজের ঘরের দিকে।[২১]

উদ্ধৃতিটি প্রতীকী, পরমার্থমণ্ডিত। কামালউদ্দিনের ভাঙাচোরা শরীর সমকালীন ভগ্নপ্রায় সমাজের প্রতিরূপক। তার বেঁচে থাকার বাসনা মূলত মুখ থুবড়ে-পড়া এই সমাজে প্রাণ জাগরণের স্মারক। লক্ষণীয়, কামালউদ্দিন ভর দিয়ে আছেন তার নাতনীর ওপর — এটি কি এই ইঙ্গিত দেয় না যে, সুষ্ঠু সমাজ ও জাতি গঠনের দায়িত্ব গ্রহণ করতে হবে উত্তর প্রজন্মকে? ইলিয়াস কি তাহলে আশাবাদী হয়ে উঠেছেন? সম্ভবত তা-ই। কেননা আশাই মানুষকে বাঁচিয়ে রাখে। শেষ পর্যন্ত তিনি এই প্রত্যয়ে উপনীত হয়েছেন:

> মুক্তিযুদ্ধের সময় দেশ সম্পর্কে আমাদের প্রত্যেকের স্বপ্ন ছিল, দেশের মানুষের সর্বাঙ্গীণ মুক্তির স্বপ্ন আমরা দেখেছিলাম... আমাদের দুর্ভাগ্য, তা ঘটেনি। স্বপ্ন দেখার সাহসও আমরা অনেকে হারিয়ে ফেলেছি। সে সাহস ফিরিয়ে আনতে হবে। আবার স্বপ্ন দেখতে হবে মুক্তিযুদ্ধের চেতনাদীপ্ত বাংলাদেশের।[২২]

৪.

ইলিয়াস তাঁর গল্পসম্ভারে যেসব গ্রাম, এলাকা, মহল্লা, পুরানো ঢাকার গলি কিংবা পরিবারের কথা বুনে চলেন, তাতে অনিবার্যভাবেই অনুপ্রবেশ করে মুক্তিযুদ্ধ ও বাংলাদেশ অনুষঙ্গ। এবং শেষপর্যন্ত বাংলাদেশই হয়ে ওঠে তাঁর গল্পের চূড়ান্ত গন্তব্য। সেই গ্রাম, মহল্লা, গলি কিংবা পরিবার আসলে মুক্তিযুদ্ধের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য বন্ধনে বাঁধা। তাঁর গল্পের কথনবিশ্বের কুশীলবগণ মুক্তিযুদ্ধেরই ফসল। এমনকি তাদের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া, ভাব-অনুভাব, সুখ-দুঃখ, সংকট-স্বাচ্ছন্দ্য সবই মুক্তিযুদ্ধের চেতনাজাত। গল্পের অন্তর্বয়নে তিনি পাঠকের জন্যে যে 'মেসেজ' দেন তার বাহক কখনো উচ্চবিত্ত হয় না। এক্ষেত্রে বেশির ভাগ সময় তিনি বেছে নেন সাধারণ শ্রেণীজাত চরিত্র, কখনো বা মধ্যবিত্ত। আর এসবের মধ্য দিয়ে লেখক সমাজের ভাঙন দেখান; যা অনাকাঙ্ক্ষিত অথচ অনস্বীকার্য।

দেশ বিভাগ থেকে শুরু করে রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন, গণ-অভ্যুত্থান, মুক্তিসংগ্রাম প্রভৃতির অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে ক্রমান্বয়ে বাংলাদেশের ছোটগল্প যে নিজস্ব অবয়ব লাভ করেছে তাতে মুক্তিযুদ্ধ ও মুক্তিযুদ্ধের অনুষঙ্গ অনিবার্যভাবেই প্রধানতম প্রসঙ্গ হিসেবে গৃহীত হয়েছে।

বাংলাদেশের এই ছোটগল্পের ধারার অন্যতম কথাশিল্পী তিনি। বাংলাদেশ নামক রাষ্ট্রের উত্থান, এর আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক বিন্যাসের সঙ্গে ওতোপ্রোতোভাবে জড়িত আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের সাহিত্যিক মানসের অভিযাত্রা। ফলে তাঁর কথনশিল্পের মূলপ্রভাবক হয়ে উঠেছে একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ। কেবল একাত্তরের ঘটনার ঘনঘটার আবেগী বিবরণসর্বস্ব নয় তাঁর গল্প। তাঁর শিল্পকল্পনার ভিত্তিভূমি মূলত বাস্তব এবং এর সঙ্গে অন্বিত হয়েছে ব্যক্তিক ও সামষ্টিক আশা-আকাঙ্ক্ষা এবং সমগ্র বাঙালি জাতিসত্তার প্রত্যাশার অভিদ্যোতনা। আর এ অভিদ্যোতনা শিল্পিত আবহকে রক্ষা করেই নির্মাণ করেছেন তিনি। টুটাফাঁটা, বহুস্তরিক জীবনের আস্ত অবয়ব উন্মোচনে তিনি আশ্রয় নেন মনোচারিতার, স্বপ্ন-কল্পনার, প্রতীকের। শেষ বিচারে এ কথা বললে অত্যুক্তি হবে না যে, ইলিয়াসের সাহিত্যিক-সত্তা আর বাংলাদেশ ও মুক্তিযুদ্ধ একই চেতনাসূত্রে বিধৃত। আর এখানেই তাঁর গল্পকার সত্তার বিশেষত্ব।

তথ্যনির্দেশ

১ আনু মুহাম্মদ সম্পাদিত, *তৃণমূল: আখতারুজ্জামান ইলিয়াস সংখ্যা*, জানুয়ারি ১৯৯৮, ৪র্থ সংখ্যা, পৃ. ২৮৯
২ প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭২
৩ আখতারুজ্জামান ইলিয়াস *রচনাসমগ্র ১*, মাওলা ব্রাদার্স, সপ্তম মুদ্রণ, ফেব্রুয়ারি ২০১২, পৃ. ২৭০
৪ এজাজ ইউসুফী সম্পাদিত, *লিরিক : আখতারুজ্জামান ইলিয়াস সংখ্যা (পহেলা বৈশাখ, তেরশ নিরানব্বই)*, সংখ্যা আট, পৃ. একশ পঁয়ষট্টি
৫ আখতারুজ্জামান ইলিয়াস *রচনাসমগ্র ১*, মাওলা ব্রাদার্স, সপ্তম মুদ্রণ, ফেব্রুয়ারি ২০১২, পৃ. ২৮৫
৬ আখতারুজ্জামান ইলিয়াস *রচনাসমগ্র ১*, মাওলা ব্রাদার্স, সপ্তম মুদ্রণ, ফেব্রুয়ারি ২০১২, পৃ. ৪০৪
৭ আখতারুজ্জামান ইলিয়াস*রচনাসমগ্র ১*, মাওলা ব্রাদার্স, সপ্তম মুদ্রণ, ফেব্রুয়ারি ২০১২, পৃ. ৩৯৩
৮ এজাজ ইউসুফী সম্পাদিত, *লিরিক : আখতারুজ্জামান ইলিয়াস সংখ্যা ,পহেলা বৈশাখ, তেরশ নিরানব্বই*, সংখ্যা আট, পৃ. একশ ছেষট্টি – একশ সাতষট্টি
৯ আখতারুজ্জামান ইলিয়াস *রচনাসমগ্র ১*, মাওলা ব্রাদার্স, সপ্তম মুদ্রণ, ফেব্রুয়ারি ২০১২, পৃ. ৩৪৯-৩৫০
১০ শাহাদুজ্জামান, *কথা পরম্পরা*, পাঠক সমাবেশ, ১৯৯৭, পৃ. ০৭০
১১ আখতারুজ্জামান ইলিয়াস *রচনাসমগ্র ১*, মাওলা ব্রাদার্স, সপ্তম মুদ্রণ, ফেব্রুয়ারি ২০১২, পৃ.১০৮-১০৯
১২ আখতারুজ্জামান ইলিয়াস *রচনাসমগ্র ১*, মাওলা ব্রাদার্স, সপ্তম মুদ্রণ, ফেব্রুয়ারি ২০১২, পৃ. ০৮০
১৩ আখতারুজ্জামান ইলিয়াস, *সংস্কৃতির ভাঙা সেতু*, নয়া উদ্যোগ, প্রথম প্রকাশ ১৯৯৭, পৃ. ০৬৫
১৪ আখতারুজ্জামান ইলিয়াস *রচনাসমগ্র ১*, মাওলা ব্রাদার্স, সপ্তম মুদ্রণ, ফেব্রুয়ারি ২০১২, পৃ. ৩৭৪-৩৭৫
১৫ প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৩
১৬ প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৬
১৭ অনুপম সেন, *বাংলাদেশ : রাষ্ট্র ও সমাজ*, সাহিত্য সমবায়, ১৩৯৫, পৃ. ৯৪
১৮ হাসান আজিজুল হক, *রচনাসংগ্রহ ১*, জাতীয় সাহিত্য প্রকাশ, ৩য় মুদ্রণ, ২০১১, পৃ. ৩৫৩
১৯ প্রাগুক্ত, পৃ. ২২৫
২০ প্রাগুক্ত, পৃ. ২২৯-২৩০
২১ প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১৮
২২ আনিসুজ্জামান, *মুক্তিযুদ্ধ এবং তারপর*, আগামী প্রকাশনী, ৩য় মুদ্রণ, পৌষ ১৪১৯, পৃ. ১৮

বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি পত্রিকা, দ্বাত্রিংশ খণ্ড, শীত সংখ্যা, পৌষ ১৪২১/ডিসেম্বর ২০১৪

সাঈদ আহমদ-এর ত্রয়ী নাটক: বিষয় ও শিল্পরূপ

সানজিদা হক মিশু*

সারসংক্ষেপ

বাংলাদেশের নাটকে ভিন্নসুরের ব্যঞ্জনাকে তুলে ধরে পেছনে যিনি সেতার নিয়ে বসেছিলেন তিনি হলেন সাঈদ আহমদ। যুদ্ধোত্তর ইউরোপের নব উন্মোচিত দর্শন, অস্তিত্ববাদ, মানুষের অস্তিত্ব সম্পর্কে নতুন ধ্যান-ধারণার একজন ভাবাদর্শী হলেন সাঈদ আহমদ। তাঁর নাটকের বিষয় গতানুগতিক নয়। বাংলা নাট্যসাহিত্যে বিষয় ও প্রকরণে নবতরঙ্গের সৃষ্টি করেছেন সাঈদ আহমদ। বুদ্ধি ও বোধের প্রখরতা তাঁর নাটকে খুঁজে পাওয়া যায়। তাইতো সাঈদ আহমদের নাটকের চরিত্র শুধু মানুষ নয়, অন্যান্য জীবও।

এক

বাংলাদেশের নাটকের ইতিহাসে সাঈদ আহমদ (১৯৩১–২০১০) এক স্মরণীয় নাম। বাংলা নাট্যসাহিত্যে এ্যাবসার্ডিজমের অবয়বকে উন্মোচিত করেছেন সাঈদ আহমদ তাঁর শাণিত অথচ স্পর্ধিত ও ব্যতিক্রমী ধারায়। যুদ্ধোত্তর ইউরোপের নবদর্শন, অস্তিত্ববাদ ও নতুন ধারণার একজন ভাববাদী নাট্যকার সাঈদ আহমদ। বাংলা নাটককে, বাংলা ভূ-খণ্ডের ছোট্ট সীমানা অতিক্রান্ত করে বিশ্বময় পরিচিত করানোর গুরুদায়িত্ব সাঈদ আহমেদ-ই গ্রহণ করেছিলেন একনিষ্ঠভাবে। আর তাঁর এ প্রয়াস উপমহাদেশীয় নাট্যসাহিত্যে সৃষ্টি করেছে অনন্য দৃষ্টান্ত যেন নবপ্রতিমার কণ্ঠে প্রোথিত সুর–লহরী।

সাঈদ আহমদ কেবল নাট্যকারই নন, তিনি সংগীতজ্ঞ ও শিল্পরসিকও বটে। নাটক রচনায় তিনি নিরীক্ষাপ্রবণ। তাই তিনি প্রথাগত নাটকের কাঠামোকে ভেঙে নতুন রূপে সাজিয়েছেন তাঁর কাঙ্ক্ষিত পরিসরকে। ফলে নাট্যসাহিত্যেও সৃষ্টি হয়েছে নবতরঙ্গ। অধিবাস্তববাদের আঙ্গিককে লেখনীর সুচারুতায় তিনি ফুটিয়ে তুলেছেন একেবারে প্রাণের নিধির মতো করে। আর তাই সাঈদ আহমদ বাংলা সাহিত্যে এ্যাবসার্ড নাটকের পথিকৃৎ।

চৈতন্যে ক্ষত সৃষ্টি করাই হলো যুদ্ধের কাজ। তাই যুদ্ধ সবসময় অভিশাপস্বরূপ, আশীর্বাদ নয়। যুদ্ধ জীবন ও জীবন সম্পর্কিত চিন্তাকে করে তোলে জটিল থেকে জটিলতর। আর এ্যাবসার্ড নাটক যুদ্ধজনিত চেতন-অবচেতন মনের ফসল। পাশ্চাত্য সাহিত্যে এ্যাবসার্ড নাটকের উদ্ভব গত শতাব্দীর পাঁচের দশকে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়কার আত্মবিচ্ছিন্নতা, পরাভূত অস্তিত্বের সংকটের বীজ হিসেবেই এ্যাবসার্ড নাট্যরীতির আবির্ভাব। ভবিষ্যৎ অনিশ্চয়তা-অর্থহীনতা-উদ্বেগ-ক্লান্তি-হতাশার শিল্পিত প্রকাশ ঘটে এ্যাবসার্ডধর্মী নাটকে।

---

* প্রভাষক, বাংলা, নটরডেম কলেজ, ময়মনসিংহ

দুই

আর্থার অ্যাডামভ স্যামুয়েল বেকেট, জাঁ জেনে, ইউজেন আয়োনেস্কো, এ্যাডওয়ার্ড এ্যালবি, জাঁ তাঁরদু প্রমুখ ছিলেন এ্যাবসার্ড নাটকের জন্মলগ্নের পথিকৃৎ। তবে আলবেয়ার ক্যামু তাঁর রচনা চারটিতে অর্থাৎ *দ্য স্ট্রেঞ্জার* (১৯৪২), *দ্য মিথ অব সিসিফাস* (১৯৪২), *ক্যালিগুলা* (১৯৪৪) ও *দ্য মিসআন্ডারস্ট্যান্ডিং* (১৯৫৮) এ্যাবসার্ডের নাম দিয়েছেন *দ্য সাইফল অব দ্য এ্যাবসার্ড*। তাছাড়া মার্টিন এসলিন তাঁর *The Theatre of the absurd* গ্রন্থে প্রথম *এ্যাবসার্ড* শব্দটি ব্যাখ্যা করেন। তিনি *এব্যাসার্ড* নাটকের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য তুলে ধরেছেন এ গ্রন্থে:

- Circular structure
  বৃত্তাকার অবকাঠামো
- Mechanical puppet
  যান্ত্রিক পুতুল
- Arbitrary theme
  অযৌক্তিক বিষয়বস্তু
- Antithetical to purpose
  উদ্দেশ্যের সাথে বৈপরীত্যপূর্ণ
- Trivial presence of music
  সংগীতের লঘু উপস্থিতি
- Incoherent bablings
  অসংলগ্ন বক্তব্য

এ্যাবসার্ড নাটকে দেখা যায় সঙ্গীতবিহীন বিষয়, পারম্পর্যহীন ঘটনাপ্রবাহ, অসংলগ্ন সংলাপ, চরিত্রের অপরিচিত ও উদ্ভট আচরণ। কাহিনীর ধারাবাহিকতা এখানে দুষ্প্রাপ্য। তথাপি শিল্পসাহিত্যের যেকোনো ক্ষেত্রে এ্যাবসার্ড রীতি বিপ্লব-বিদ্রোহের প্রকাশ।

অর্থাৎ, এ্যাবসার্ড বলতে বুঝানো হয়েছে- ক্ষয়িষ্ণু মানবজীবনের অযৌক্তিক ভাবাবেগের সম্মোহনীকে যে ভাবাবেগের নাট্যিক গতি নেই, চরিত্রের বিকাশ নেই, এমনকি ঘটনার পারম্পর্য নেই। এ ভাবাবেগের ভবিষ্যৎ থাকে দোদুল্যমান ও শঙ্কিত অবস্থায়। এ সম্পর্কে বিশ্বজিৎ ঘোষ তাঁর *বাংলাদেশের সাহিত্য* গল্পে Martin Esslin-এর একটি উক্তি তুলে ধরেছেন:

> In the *Theatre of the Absurd*, the audience is confronted with actions that lack apparent motivation, characters that are in constant *flux*, and often happenings that are clearly outside the realm of rational experience. Here, too, the audience can ask, 'what is going to happen next?' but then anything may happen next, so that the answer to this questions cannot be worked out according to the rules of ordinary probability based on motives and characterisations that will remain constant throughout the play. The relevant question here is not so much what is going to happen next but what is happening?[১]

তিন

বিষয় উপস্থাপনার অভিনবত্বে সাঈদ আহমদ ব্যতিক্রমী। বিষয়বস্তু গতানুগতিকতার লক্ষণ সাঈদ আহমদের নেই। তাঁর নাটক রূপকধর্মী। তিনি তাঁর প্রত্যেক নাটকে বিষয়ের অভিনবত্বের সঙ্গে প্রকরণের কারুকার্যতাও তুলে ধরেছেন। তাই তাঁর নাটকের চারিত্রিক ভূমিকায় আবির্ভূত হয়েছে বন্যা, তুফান, মাইলপোস্ট, শেয়াল-কুমিরসহ বিভিন্ন জীবজন্তু। এ্যাবসার্ডের সুর ও রঙে সাঈদ আহমদ সৃষ্টি করেছেন পাঁচটি নাটক। নাটকগুলো হলো: *কালবেলা* (১৯৬২), *মাইলপোস্ট* (১৯৬৫), *তৃষ্ণায়* (১৯৬৮), *প্রতিদিন একদিন* (১৯৭৪), *শেষ নবাব* (১৯৭৮)। এ পাঁচটি নাটক বাংলা সাহিত্যের এ্যাবসার্ডধর্মীতার মাইলফলক।

সাঈদ আহমদের ইংরেজিতে লেখা 'NOT I' নাটকের মাধ্যমে এ্যাবসার্ডের সুর কণ্ঠে ধারণ করেন। ১৯৬১ সালে আবার এ ধারায় নাটক লেখা শুরু করেন সাঈদ আহমদ। পরপর ইংরেজিতে লেখা তিনটি নাটক: *The Thing, The Milepost, The Survival*। *The Thing*-এর বাংলা অনুবাদ *কালবেলা* করেন ড্রামা সার্কেল এর পরিচালক বজলুল করিম। *The Milepost*-এর বাংলা অনুবাদ *মাইলপোস্ট* করেন আতাউর রহমান এবং *The Survival*-এর বাংলা অনুবাদক নাট্যকার স্বয়ং। শুধু বাংলায়ই নয়, এ নাটক তিনটি ইংরেজী, ফরাসী, জার্মানী ভাষায় অনূদিত ও মঞ্চায়িত হয়েছে।

চার

সাঈদ আহমদ-এর *কালবেলা* (১৯৬২) বাংলাদেশের নাট্যসাহিত্যে এক ব্যতিক্রমধর্মী প্রয়াস। ১৯৬৯ সালে চট্টগ্রাম অঞ্চলে প্রচণ্ড ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাস সংঘটিত হয়। এ প্রাকৃতিক দুর্যোগে বহু ক্ষয়ক্ষতি সাধিত হয়। এমনকি মানুষও মারা যায়। *কালবেলা*-র প্রেক্ষাপট সে প্রাকৃতিক দুর্যোগের ভয়াবহতাকে কেন্দ্র করে। নাটকটির আঙ্গিকতায় দৃষ্টিপাত করলে আমরা যা দেখি তা হলো:

'কালবেলা' পাঠ: ভাগ দুটি ও দৃশ্য দুটি;
ঘটনাস্থল: চর আলেকজান্ডার;
ঘটনাকাল: কোনো এক বৃহস্পতিবারের সকাল ১১টা ও সন্ধ্যা ৬ টা;
পাত্র–পাত্রী: মোড়ল, আহমদ ও মুনীর, ঢুলী, উনেন, উপেং, কুমারী মেয়ে, শিষদার বংশীধারী, দাগী ও চারজন পর্ষদ।
রূপকধর্মী মূলচরিত্র: ঘূর্ণিঝড়।

কালবেলা সম্বন্ধে নাট্যকার সাঈদ আহমদ নিজেই বলেছেন:

> আমার 'কালবেলা' নাটকটি ১৯৬১ সালের ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসের পটভূমিকায় রচিত। এটি লিখতে এক বছর সময় লেগেছে আমার। দেড়দশক আগে 'কালবেলা' ইংরেজি ভাষায় লিখি। সেকালে কবিবন্ধু শামসুর রাহমান নাটকটির একটি অনূদিত রূপ প্রকাশের জন্য আমাকে অনুপ্রাণিত করেন। তাঁর উদ্যোগে এবং আমার সুহৃদ বজলুল করিমের অনেক প্রহরের শ্রমের ফল 'দ্য থিং' ভাষান্তরিত হয় 'কালবেলা'য়।[২]

কালবেলা নাটকের আদি, মধ্য ও অন্ত নেই। দ্বীপবাসী মানুষের বিপর্যস্ত উদ্বেগ বর্ণিত হয়েছে এই নাটকে। ঘূর্ণিপ্রলয় পূর্বেই তার আগমনী বার্তা জানান দেয় দ্বীপবাসীর নিকট। সবাই ঘূর্ণিঝড়ের জন্য সময়ক্ষেপণ করে। এক সময় প্রলয়ঙ্করী ঘূর্ণিঝড় হিংস্র দানবের মতো ছুটে আসে এবং সবকিছু ভাসিয়ে নিয়ে যায়। এ নাটকে ভবিষ্যৎ বড় হয়ে দেখা দিয়েছে। তাইতো চরিত্রসমূহ ডুবে থাকে ভবিষ্যৎ অনিশ্চয়তায়, অন্তহীন অপেক্ষমানতায়। এ নাটকের পাত্র-পাত্রীদের ভাবনাগুলো ঐক্যসূত্রে গ্রথিত হয়নি, কিন্তু এগিয়ে গিয়েছে চেতনাপ্রবাহরীতির মধ্য দিয়ে। সাঈদ আহমদ তাঁর ভাবনার বীজগুলোকে উপাত্ত করতে খণ্ড খণ্ড চিত্র ও চিত্রকল্পের সাহায্য নিয়েছেন। যেমন:

> লোকটা ॥ বিপদ আর নেই কোনো। আছে শুধু শিষদার বংশীধারী।
> মোড়ল ॥ সে নাচবে শুধু তোমার বাঁশীতেই। বাজাও, বাজাও, কলিজার টুকরো গুলো যতক্ষণ না ছিদ্র দিয়ে গলে গলে বেরিয়ে আসে। মোচড়ানো সুরের বেড়ী উদ্‌গত হয়ে তার দেহকে অজগরের মতো জাপটে ধরুক, পেষণ করুক।
> লোকটা ॥ আমার বাঁশী তো আমি ফেলে দিয়েছি।
> (সবাই আহতবোধ করে)
> দাগী ॥ এমন কাজটা তুমি করলেই বা কেন?
> লোকটা॥ বাচ্চাদের বাজিয়ে শোনাবার জন্য ওরা আমাকে ডেকেছিলো কোথায়। আমার সুরের বর্ণালী প্রকাশের জন্য– সাতটা কি আটটা ছিদ্রই যথেষ্ট ছিলো না। সেই জন্য অনেকগুলো ছিদ্র করেছিলাম আমি। তারপর সুর নয়, শুধুই হাওয়া।[৩]

পঞ্চাশের দশকে ইউরোপে অস্তিত্ববাদিতা ও অধিবাস্তববাদিতার যে প্রকাশ ঘটেছিল তার সাথে বাংলাদেশের পাঠকসমাজ পরিচিত হন সাঈদ আহমদের *কালবেলা* নাটকের মাধ্যমেই। আর এ নাটকটি বিশ্বজনীন, অর্থাৎ, নাট্যকার তাঁর বিষয়গত নাট্যিক ঘটনাপ্রবাহে দিয়েছেন আন্তর্জাতিক মনন ও বোধের পরিচয়।

চট্টগ্রাম এলাকার একটি ছোট্ট দ্বীপ-চর আলেকজান্ডার। এ দ্বীপের মানুষ জানে যে তাদের জীবনে মৃত্যুর ভয়াবহতা, ধ্বংসের ভয়াবহতা নেমে আসছে। তবুও তারা বিচলিত নয়। সঙ্গতিহীন কথোপকথনের মাধ্যমে তারা মৃত্যুকে উপেক্ষা করতে চাচ্ছে এবং তারা ঘূর্ণিঝড়কে সাদরে অভ্যর্থনা জানাচ্ছে। ঘটনার এমন ভাবসঙ্গতিহীনতাকে নাট্যকার অপূর্ব ভাষায় তুলে ধরেছেন। এক্ষেত্রে *কালবেলা* নাটক থেকে নিম্নোক্ত উক্তিটি প্রণিধানযোগ্য:

> ঢুলি ॥ এই দ্বীপের অধিবাসীকে জানানো যাইতেছে যে, অদ্য রাত্রি সাতটার মধ্যে আমরা ভীষণ এক ঘূর্ণিঝড়ের আশঙ্কা করিতেছি। ঝিরিঝিরি নরম বাতাস বহিয়া আনিবে আগুনের হল্কা । সাগরের কণ্ঠ হইতে নির্গত হইবে রক্তিম লাভস্রোত। সমস্ত কিছুই ধুইয়া, মুছিয়া যাইবে। আবহাওয়া দপ্তরের এই ঘোষণা। অনুরোধ করা যাইতেছে যেন নিরবিচ্ছন্ন শান্তি এবং শৃঙ্খলা রক্ষা করা হয়। পূর্ণমর্যাদার সহিত এই পরিস্থিতির মোকাবেলা করিতে হইবে। আমাদের নৌকাগুলি পুরাতন এবং বাচ্চাদের জন্য সেগুলি যথেষ্ট নয়। যেকোন দিক হইতেই নিকটবর্তী উপকূল পাঁচ মাইলেরও বেশি দূরে। সাঁতরাইয়া যাওয়া অসম্ভব। হাঙ্গর কুল যুগ যুগ ধরিয়া ক্ষুধার্ত। সমুদ্রের মানিক এই দ্বীপ প্লাবিত বিধ্বস্ত ও নিমজ্জিত হইবে। আমরা ঘূর্ণিবার্তার অপেক্ষায় আছি। আজ রাত সাতটা পর্যন্ত।

লোকটা ॥ বাচ্চাদের বাজিয়ে শোনার জন্য ওরা আমাকে ডেকেছিল কোথাও। আমার সুরের বর্ণালী প্রকাশের জন্য সাতটা কি আটটা ছিদ্রই যথেষ্ট ছিলো না। সেইজন্য অনেকগুলো ছিদ্র করেছিলাম আমি। তারপর সুর নয়, শুধুই হাওয়া।...

পুরোহিত ॥ শিস বাজাতে তো পারো। তোমার জিভটা তো রয়েছে।

দাগী ॥ নাও, নাও শিস বাজাও। ত্বরা করো।

লোকটা ॥ (সমুদ্র থেকে হাওয়া বইতে শুরু করে...)। আমার জিভের উপর দিয়ে হাওয়ারা সব নেচে চলেছে। তাদের সামলাতে আর পারছি না আমি।

পুরোহিত ॥ করি কি আমরা?

মোড়ল ॥ শ্বাস রুদ্ধ করো। সোজা হয়ে দাঁড়াও, শুধু কথা বলে যাও। সময় কেটে যাবে। ...এসো শুরু করি শিগগির।

মেয়েটা ॥ একটা গান গাই আমি। নাই বা রইল ঢোলক, নাই বা রইল বাঁশী।[৪]

সংলাপের ব্যবহারে *কালবেলা* সুস্পষ্টভাবে *Waiting For Godot* নাটকের বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। এ নাটকে ভাষা ব্যবহার ও সংলাপ নিমার্ণে নাট্যকার সচেতন শিল্পদৃষ্টির পরিচয় দিয়েছে। পাশ্চাত্য নিরীক্ষা সমৃদ্ধ নাটক 'কালবেলা' উপকূলবাসীদের জীবন সংগ্রাম, হতাশা-নিরাশার প্রেক্ষাপটে নাট্যকার বাস্তব সত্যকে উপস্থাপন করেছেন। নদীমাতৃক বাংলাদেশের অবস্থান এরূপ যে এখানে মানুষের জীবনকে বিপর্যস্ত করে তুলেছে। নিরুপায় হয়ে মানুষ বিসর্জন দিচ্ছে জীবন:

লোকটা ॥ না আমাদের জন্য ব্যাপারটা বড় তাড়াতাড়িই এসে গ্যালো। তোমার সে রূপকথা তুমি পারবে না বলতে, আমিও পারলাম না পুরো সুর ভাঁজতে। সবার অজান্তে, কোনদিন ... কোন একদিন, কোনখানে, কোন দ্বীপে, আর কোন শিসধারী বংশীধারী ...অন্য কোনখানে ... সবখানে। অবধারিত সত্য এ সবাইকে আমরা শ্রদ্ধা জানাই। সালাম, পৃথিবী সালাম।

পুরোহিত ॥ তারপর...

মোড়ল ॥ বলো

মেয়েটি ॥ (খিল খিল হাসি)।

দাগী ॥ কি বলবে...

মোড়ল ॥ তারপর বলো...

দাগী ॥ বলো ... কি বলবে ... বলো ...বলো

[কেউ সাড়া দেয় না। নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে এবং ঐ কথা কয়টি বিড়বিড় করে বলতে থাকে]।[৫]

মানুষ ও প্রকৃতির প্রকাশ ঘটেছে সাঈদ আহমদের *কালবেলা* নাটকে। এ দ্বন্দ্বে মানুষ কখনো তার অস্তিত্বকে টিকিয়ে রাখতে পারে, আবার কখনো অস্তিত্ব বিপন্ন হয়। এভাবে হাজার বছর ধরে চর আলেকজান্ডার এলাকার মানুষ প্রকৃতির সঙ্গে সংগ্রাম করে বেঁচে আছে। আর বাংলাদেশের মানুষের জীবন সংগ্রামের নাট্যরূপই হচ্ছে *কালবেলা*। শুধুমাত্র জীবনের ভয়াবহতা নয়, শিল্পবৈচিত্র্যে প্রকাশের অভিনবত্বে সাঈদ আহমেদের *কালবেলা* বাংলা নাটকে ভিন্ন ধারার সূত্রপাত করেছে।

পাঁচ

সাঈদ আহমদের দ্বিতীয় নাটক *মাইলপোস্ট*। নাটকটি দুর্ভিক্ষের পটভূমিকায় রচিত। এ্যাবসার্ডধর্মী এই নাটকের কেন্দ্রীয় চরিত্র রাজপথের দিক্ নির্দেশনাকারী মাইলপোস্ট। নাটক প্রসঙ্গে নাট্যকারের নিজের মন্তব্য:

> ... এই নাটকের পটভূমি দুর্ভিক্ষ। দুর্ভিক্ষ সে শুধু নিরন্নের হাহাকার নয়, মানবাত্মার এই তীব্র আর্তনাদ ও সত্য প্রকাশের তাগিদে 'মাইলপোস্ট' লেখা হয়।[৬]

নাটকের প্রথমেই রয়েছে মাইলপোস্টকে ঘিরে তাৎপর্যময় ইঙ্গিত। দুর্ভিক্ষতাড়িত মানুষ যে মানবিকভাবে বিকল হয়ে পড়ে তার নমুনা পাওয়া যায় এ নাটকে। *মাইলপোস্ট* নাটকের আঙ্গিকগত দিকটি উন্মোচন করলে আমরা পাই:

অঙ্ক বিভাজন: এক অঙ্ক বিশিষ্ট, তিন দৃশ্য সম্বলিত।

সময়কাল: একদিনের সূর্যাস্তের কিছু পূর্বে, সে রাত্রি এবং পরদিনের ভোরবেলা।

স্থান: রাজপথ।

চরিত্র: চৌকিদার, গোরখোদক, ডাকপিয়ন, সঙ, বড়ভাই, ছোটভাই এবং মা।

রূপকধর্মী চরিত্র: রাস্তার মাইলপোস্ট।

সাঈদ আহমদের *মাইলপোস্ট* নাটকে দেখা যায় প্রত্যেকটি চরিত্রই এক-একটি চৈতন্যের বহিঃপ্রকাশ। নাটকে আমরা দেখি চৌকিদার কিছু মাইলপোস্ট নিয়ে হাজির হয় এবং স্থানের নামাঙ্কিত দিক চিহ্নগুলো ইচ্ছেমত বদল করে দেয়। *মাইলপোস্ট* নাটকটি বিশ্লেষণ করে এ কাহিনীবিন্যাসকে তিনটি মূলবিষয়ে আবদ্ধ করা যায়:

ক. চৌকিদারের ইচ্ছেমতো মাইলপোস্ট পরিবর্তন;
খ. গোরখোদক কর্তৃক দুর্ভিক্ষে মৃত মানুষের লাশ কবর দেওয়া; এবং
গ. ডাকপিয়ন কর্তৃক চিঠির প্রাপককে খুঁজে বেড়ানো।

নাট্যকার তাঁর *মাইলপোস্ট* নাটকে দেশীয় লোকজ উপাদানকে ব্যবহার করেছেন। তাছাড়া পাশ্চাত্যের আঙ্গিককে ভাব ও রূপকল্পের ব্যবহারও করেছেন। বাংলার দুর্ভিক্ষপীড়িত, অত্যাচারিত, হতাশায় দগ্ধ, বেদনায় ক্লিষ্ট, বাঙালি মাকে নাট্যকার তুলে ধরেছেন আধুনিক জীবনচেতনায়। সমালোচক আতাউর রহমানের বর্ণনায় তা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে:

> তার বাংলা মা উজ্জ্বল স্বাস্থ্যের নিটোল পয়োধরা, উর্বরা কোনো নারী নয়– এ বাংলা মা শীর্ণ, বিশুদ্ধ, লোলচর্ম স্থলিত স্তনা, বিধ্বস্ত এক নারী। সমগ্র মুখাবয়বে তাঁর বন্যা, দুর্ভিক্ষ আর মহামারীর বলিরেখা। অক্ষমতার হতাশা তার দুচোখ জুড়ে, সে মা তাঁর সন্তানকে দুবেলা দুমুঠো অন্ন যোগাতে পারে না। রূপকথার বাংলা মায়ের মুখোশ ছিন্ন করে সাঈদ আহমদ আমাদের উপহার দিলেন এ সত্যিকার বাংলা মাকে।[৭]

দুর্ভিক্ষের ভয়ঙ্কর রুদ্রমূর্তি নাট্যকার রূপায়িত করেন বিভিন্ন উপমার মাধ্যমে। এ রুদ্রমূর্তি সর্বগ্রাসী, অসীম তৃষ্ণার্ত এবং ক্ষিপ্র গতিসম্পন্ন। গ্রামের পর গ্রাম উজাড় হচ্ছে দুর্ভিক্ষের থাবায় পরাস্ত হয়ে। শতশত গ্রাম গোরস্থানে পরিণত হচ্ছে। মানুষ বাঁচার জন্য গ্রাম ত্যাগ

করছে, রওনা হচ্ছে ভিনদেশে, একটু আশাই তাদের মুষ্টিগত ধন। দুর্ভিক্ষের ভয়াবহতার চিত্র চৌকিদার ও গোরখোদকের কথোপকথনে ধরা পড়েছে:

> ক) গোরখোদক॥ অসীম তৃষ্ণা নিয়ে এসেছে দুর্ভিক্ষ, অন্তহীন সর্বগ্রাসী ক্ষুধা তার। আকণ্ঠ পান করেও তার তৃষ্ণা মিটছে না। লক্ষ লক্ষ ক্ষুধার্ত মানুষকে গিলে ফেলছে সে। শতশত গ্রাম গোরস্থানে পরিণত হচ্ছে। গ্রামের পথে আজ আর কেউ হাটে না। একটি পাতাও পড়ে না। দুর্ভিক্ষের তাড়া খেয়ে মানুষ প্রাণ ভয়ে ছুটে পালাচ্ছে। কিন্তু দুর্ভিক্ষ ওদের ছাড়বে না, ক্ষিপ্র হয়ে উঠেছে তার গতি। গত রাতে কয়েক মাইল দূরে ছিলো। আজ সকালে হয়তো পাশের দরজায় ঘা মারছে। তুমি কিন্তু ভুল বুঝো না।
>
> চৌকিদার॥ ঘোড়ার ডিম কিছুই বুঝি না। দুর্ভিক্ষে তোমার তো ভালো লাগবেই। কারণ এর বদৌলতে প্রচুর খেতে ও জমাতে পারছো।
>
> গোরখোদক॥ সোজাসুজি দুর্ভিক্ষকে তুমি এজন্য দায়ী করতে পারো না। সময়ের ব্যবধান যতই কম হোক না কেন, কোনো কিছুই সংকেত না দিয়ে আসে না। শতবর্ষ চিন্তার পর সে মনস্থির করে। আর মনস্থির হয়ে গেলেই সে ছুটতে আরম্ভ করে বিদ্যুৎ গতিতে, মানুষকে গ্রাস করে অজগরের মতোই, সহজে।[৮]
>
> খ) চৌকিদার॥ সত্যি করে বল দেখি এটা কি নতুন দুর্ভিক্ষ? নাকি পুরোনোটাই ঘুরে ঘুরে আসছে।
>
> গোরখোদক॥ এর আবার নতুন পুরোনো কি? আগেও ছিলো, এখনও আছে– বলা যায় সর্বকালীন। বল দেখি, কখন তুমি এর কথা শোননি? চোখ খুলে দেখেছো সে আছে, চোখ বন্ধ করেও দেখছো সে আছে। ক্ষুধার্ত শয়তান সবকিছু গ্রাস করছে। অসহ্য।[৯]

দুর্ভিক্ষ সর্বগ্রাসী রূপ নিয়ে বাংলাকে ক্ষতবিক্ষত করছে। চৌকিদারের কথায় তা স্পষ্ট ফুটে ওঠেছে। চৌকিদারের সংলাপের ভিতর দিয়ে সাঈদ আহমদ ভাষার অপূর্ব সৌকর্য ও উপমার উদাহরণ তুলে ধরেছেন। এ প্রসঙ্গে *মাইলপোস্ট* থেকে:

> চৌকিদার॥ বন্ধ করো এসব ব্যক্তিগত সমস্যার আলোচনা, এক বিরাট দুঃখের মধ্যে আমরা আছি। আহত গোখরোর ফণা মেলে দুর্ভিক্ষ ছুটে আসছে আমাদের দিকে, আসছে পিশাচের লোভী ক্ষুধা নিয়ে।[১০]

বাঙালি সাহসী জাতি, সংগ্রামী জাতি। তাই তারা জীবন মৃত্যুর মাঝে দাঁড়িয়ে সমস্ত দুর্ভোগ, মানসিক যন্ত্রণাকে মেনে নিয়ে অসীম ধৈর্যের সাথে অপেক্ষারত, দুর্ভিক্ষের মোকাবেলা করায়:

> সঙ॥ আমরা কেবল টিকে থাকার জন্য লড়াই করছি। দুর্ভিক্ষ নিশ্চয় এ গ্রামটিকেও গ্রাস করতে চলেছে। হতে পারে এখানেই আমাদের গোর তৈরি হবে। দুর্ভিক্ষ না আসা পর্যন্ত আমরা এখানে অপেক্ষা করব। তারপর দুর্ভিক্ষ এসে দেখবে আমাদের জীর্ণশীর্ণ শরীরগুলো। এটা অবশ্যম্ভাবী। এ সংগ্রাম নিশ্চিত। এখানে, ওখানে, সবখানে। এ শুধু পালার ব্যাপার। কেউ রক্ষা করতে পারবে না। প্রলয় নাচের মাঝখানে এসে আমরা দাঁড়িয়েছি। এখানে মমতা নেই, মুক্তি নেই, বিচার নেই, চরম সত্য।[১১]

মাইলপোস্ট মূলত দেশ, সমাজ ও সভ্যতার নিশ্চয়তার প্রতীক। তবে নিশ্চয়তা শোষণের প্রতিভূ, অত্যাচারিতের নামান্তর। তাইতো চৌকিদার মাইলপোস্টের ঘাড় ভেঙে দিয়ে শোষণ থেকে মুক্ত হতে চান এবং সবাইকে মুক্ত করতে চান। অসহায় অত্যাচারের প্রতিবন্ধকতা থেকে পরিত্রাণ পেতে চায়, চায় মুক্ত বিহঙ্গের মতো আকাশে উড়ে বেড়াতে। নিরাশার অবগাহনে নিমজ্জিত মানুষগুলো ভবিষ্যৎ নিয়ে খুব বেশি ভয়ার্ত। তাইতো তাদের প্রতিনিধি

চৌকিদার আশাহত। কেননা সে জানে, এ দুর্ভিক্ষ কখনো তাদের ছাড়বে না। দুর্ভিক্ষের জয়যাত্রা শুরু হয়েছে লক্ষ লক্ষ বছর পূর্বেই। এ দুর্ভিক্ষ ড্রাগনের প্রতিভূ যার উষ্ণ নিঃশ্বাসে পৃথিবীর গায়ে ফোস্কা ফেলে। এ দুর্ভিক্ষ অজগর সাপের মতো। যার বিষাক্ত ছোবলে জর্জরিত হয় সমস্ত প্রাণিকুল। *মাইলপোস্ট* নাটকে আমরা শুনি:

> চৌকিদার ॥ এ দুর্ভিক্ষ কখনো আমাদের ছাড়বে না। লক্ষ লক্ষ বছর আগে সে তার জয়যাত্রা শুরু করেছে। সে লুকিয়ে থাকে, জড় অবস্থায় কালাতিপাত করে, ভূ-গর্ভে বিচরণ করে নিজের খুশিমতো। আমাদের আশা জাগে। ঠিক সেই মুহূর্তে ড্রাগন তার উষ্ণ নিশ্বাস আছড়ে দেয়। প্রোজ্জ্বলিত অগ্নিদাহ পৃথিবীর গায়ে ফোস্কা ফেলে দেয়। দৈবাৎ যারা বেঁচে যায়, তারা লেগে যায় নীড় বাঁধার চেষ্টায়। একবার স্থান নির্ধারিত হয়ে গেলেই অজগর তার তন্দ্রা থেকে নড়ে ওঠে। কোনো বাঁচোয়া নেই। দেহমন প্রতি মুহূর্তে আতঙ্কিত। তবুও আমি আমার মাইলপোস্ট বদলাতে থাকব। আমার একমাত্র উদ্ভাবিত খেলা যা দিয়ে খেয়াল চরিতার্থ করতে হবে।[১২]

বাঙালি চিরকালই সংগ্রামী। সংগ্রাম বাঙালির রন্ধ্রে রন্ধ্রে বহমান। এর প্রতিফলন *মাইলপোস্ট* নাটকেও পরিলক্ষিত। তাইতো দুর্ভিক্ষের কঠোর বাস্তবতাকে মেনে নিয়ে কঠিন জীবন সংগ্রামের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে মা তার সন্তানদের আশার বাণী শুনিয়েছেন। সন্তানদেরকে আহ্বান করেছেন বাংলা মায়ের মুখে হাসি ফোটাতে। শুরু করতে ইতিহাসের সোনালি অধ্যায়। মায়ের মুখে শোনা যায়:

> মা ॥ আমার সোনা মানিকেরা, সাহস ধর। বাংলা মায়ের মুখে হাসি ফোটাতেই হবে। নতুন ভোরের আলোর রশ্মি চারদিকে ছিটকে পড়ছে। এখন থেকে সোনালি ইতিহাস শুরু হবে।[১৩]

কিন্তু, আশাবাদ এ্যাবসার্ড নাটকের বৈশিষ্ট্য নয়। সুতরাং, আমরা বলতে পারি *মাইলপোস্ট* নাটকে মায়ের আশাবাদী চেতনা নাট্যকার সাঈদ আহমদের নিজস্ব। আর এখানেই তাঁর বিশিষ্টতা।

ছয়

বাংলাদেশের নাট্যসাহিত্যে একটি ব্যতিক্রমী সংযোজন নাট্যকার সাঈদ আহমদ রচিত *তৃষ্ণায়* নাটকটি। প্রচলিত লোককাহিনীকে সমকালীন জীবনের স্পর্শে সঞ্জীবিত করে নাট্যকার এ নাটকটি রচনা করেছেন। পণ্ডিত শিয়াল এবং কুমির ও তার সাতছানার কথা কাহিনীর নবরূপ হচ্ছে: *তৃষ্ণায়* নাটকটি। মানুষের অস্তিত্ব ও টিকে থাকার সমস্যা এবং টিকে থাকবার জন্য সংগ্রাম এ নাটকের মূলভাব। রূপকের মাধ্যমে এ নাটকে তুলে ধরা হয়েছে সাম্রাজ্যবাদ ও ঔপনিবেশিক শোষণ এবং শোষণ থেকে মুক্তির উপায়। আধুনিক জীবনের টানাপড়েন, অস্তিত্বের বিবমিষা, ক্লেদাক্ততা, মানসিকতার বিপর্যস্ততা এবং শ্রেণীসংগ্রামের বিভিন্ন পর্যায়কে তুলে ধরা হয়েছে *তৃষ্ণায়* নাটকে। *তৃষ্ণায়* নাটকের কাঠামো লক্ষ্য করলে আমরা পাই:

নাটকের দৃশ্য: তিনটি
স্থান: একটি জঙ্গল
সময়কাল: বিকেল, ভোর
চরিত্রসমূহ: গাধা, বাঘ, কুকুর, শিয়াল, কুমির ও ছানা।

রূপকের আড়ালের বিষয়: সমকালীন সাম্রাজ্যবাদ এবং সাম্রাজ্যবাদীর অনন্ত তৃষ্ণা।

নাটকের ভূমিকায় নাট্যকারের দর্শন সুস্পষ্ট। সভ্যতার শুরু করে আজও পর্যন্ত মানবজাতি নানা অশুভ শক্তির সঙ্গে সংগ্রাম করে আসছে। এ সংগ্রাম জীবন রক্ষার্থে, অস্তিত্ব রক্ষার্থে। দুর্বলের উপর সবলের অত্যাচার যুগপরিক্রমার ফসল। নাটকটি সম্পর্কে নাট্যকার নিজেই বলেছেন:

> 'তৃষ্ণায়' এর উপজীব্য বাংলাদেশের জনপ্রিয় লোককাহিনী শিয়াল ও কুমিরছানার গল্পকে নিয়েই আমার ধারণা কোনো রূপকথা যা লোককাহিনী সমকালীন সমাজে স্থায়িত্ব লাভ করে না যদি না সে গল্প সমসাময়িক প্রেক্ষাপটে যৌক্তিক বা অর্থবহ হয়ে ওঠে। সে সময়ে দেশ, সমাজ এমনকি আন্তর্জাতিকতার ক্ষেত্রেও চিরন্তন প্রক্রিয়ায় উদ্ভূত একটি সমস্যার প্রেক্ষিতে শিয়াল ও কুমিরছানার গল্প আমার কাছে ভীষণ জীবন্ত বলে মনে হয়েছে। এ সমস্যা হলো মানুষের অস্তিত্বের এবং টিকে থাকার সমস্যা। বড় মাছ ছোট মাছকে উদরস্মাৎ করে, বৃহৎ শক্তি ক্ষুদ্র শক্তিকে ধ্বংস করে, এইতো স্বাভাবিক এবং চিরন্তন সত্য। ডারউইন তাই 'Survival of Fittest' এর থিয়োরি দিয়েছেন। আমার মনে প্রশ্ন জাগলো সত্যি কি তাই? শিয়াল পণ্ডিত ও কুমিরের সাতটি ছানাকে আমাদের জীবন নাট্যের অঙ্গনে আমি যেন এক নতুন ভূমিকায় দেখতে পেলাম। ক্ষিপ্র বুদ্ধির অধিকারী এবং টিকে থাকার সংগ্রামে পৃথিবীর সুযোগ্য সন্তান শিয়াল কি এমনি করে কুমিরের অসহায় শিশুদের উদরস্মাৎ করে যাবে, নাকি মা কুমির তার প্রজনন যন্ত্রাগারে সাত নয়, সত্তর নয়, হাজার হাজার সন্তানদের জন্ম দিয়ে শিয়ালের মোকাবেলা করবে। শিয়াল আর কত খাবে, একদিন নিশ্চয়ই বিতৃষ্ণা আসবে, খেতে খেতে অসুস্থ হয়ে পড়বে। শিয়াল ও কুমির ছানার গল্পকে অপরিবর্তিত রেখে আমার নিজস্ব ব্যাখ্যায় ও দৃষ্টিকোণ থেকে একটি নাটক লেখার তাগিদ অনুভব করলাম, ফল— তৃষ্ণায়।[১৪]

উৎপাদক থেকে শুরু করে বিভিন্ন শ্রেণীর খাদকের মধ্যে একটি নির্দিষ্ট সম্পর্ক দেখা যায়। ছোট শ্রেণীর প্রাণীকে খাবার হিসেবে গ্রহণ করে বড় শ্রেণীর প্রাণী। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় মাকড়সা এক পিঁপড়েকে খেলো, মাকড়সাকে খেলো বিড়াল, বিড়ালকে কুকুরে খেলো, আর কুকুরটিকে খেলো একটি হায়না, অবশেষে হায়না দিয়ে উদরপূর্তি করলো এক বাঘ। অর্থাৎ–

পিঁপড়ে ⟶ মাকড়সা ⟶ বিড়াল ⟶ কুকুর ⟶ হায়না ⟶ বাঘ।

নাট্যকার সাঈদ আহমদ এ নাটকে পাশ্চাত্য ফর্মের সাথে প্রাচ্যধারার দেশীয় ঐতিহ্যের সংমিশ্রণ ঘটিয়েছেন। বাংলা সাহিত্যে এ ধরনের নাটক পূর্বে দেখা যায়নি। *তৃষ্ণায়* নাটকে সাঈদ আহমদ অস্তিত্ববাদ ও অধিবাস্তববাদের সমন্বয় ঘটিয়েছেন। শিয়াল ও ফুকরো চরিত্রের মাধ্যমে নাট্যকার মানবচরিত্রের জৈবিক ও অনধিকারময় দিকটিকে ফুটিয়ে তুলেছেন। মানুষ লোভকে সংবরণ করতে পারে না, প্রবৃত্তিকে সংবরণ করতে পারে না। হয়তো বা কখনো সে অনুশোচনা করে, নিজের ভুল বুঝতে পারে, কিন্তু তার পূর্বেই ভাগ্যের দেবী তাকে আড়ষ্টতায় বন্দি করে ফেলে। লোভের কদর্য চিত্র *তৃষ্ণায়* নাটকে শিয়ালের সংলাপে দেখা যায়:

> শেয়াল।। (বৃক্ষের প্রতি)..... তাহলে বল আমার কেন এত ক্ষুধা? কেন পারি না লোভ সংবরণ করতে? জবাব দাও, ঐ বাচ্চাদের মাংস এত সুস্বাদু কেন? হয়তো বলবে আমার প্রবৃত্তি অতি নীচু। সত্যি বলছি প্রকৃতিকে জয় করা দুরূহ।[১৫]

তীক্ষ্ণ বুদ্ধিসম্পন্ন লোভী শিয়াল প্রতারিত করে কুমির মাকে। একে একে সে কুমিরের ছয়টি সন্তানকে খেয়ে ফেলে। কিন্তু কুমিরের সাত নম্বর ছানাটি আধুনিক যুগের চাটুকারের রূপ ধারণ করেছে। শিয়ালের অপকর্মের কথা জেনেও সে তা প্রকাশ করতে নারাজ।

তিন অঙ্কবিশিষ্ট এই নাটকের ভাষা সংবেদনশীল। কয়েকটি নমুনা দেওয়া যাক:

> ক. ফুকরো॥ .... তোমার কর্মভাগ্য কারো সঙ্গে বিনিময় করা অসম্ভব।[১৬]
> খ. ফুকরো॥ ... কিন্তু সেটা তোমার দুনিয়া। আমাদের পৃথিবী অন্য।[১৭]
> গ. মা॥ ... কি পাপ করেছি, কেন এমন দিন দেখতে হলো? [১৮]
> ঘ. মা॥ ... শিক্ষা মানুষের মন থেকে ভালোবাসা শুভাকাঙ্ক্ষা আর বিবেচনা বুদ্ধি মুছে দিতে পারে না।[১৯] মানুষের 'অস্তিত্ব ও টিকে থাকার সমস্যা' চিরন্তন।

অস্তিত্ব রক্ষার অন্তহীন প্রতিযোগিতায় মানুষ অতীত বিস্মৃত হয়। নির্বিবাদে, আধুনিক জীবনের জটিলতা, অন্তহীন সংগ্রাম মানুষকে অনুভূতিহীন করে তোলে। অশুভের বিরুদ্ধে লড়াই করে মানুষকে টিকে থাকতে হয়। জীবনের করুণ বাস্তবতার স্বীকার, অত্যাচারিত কুমির মা চরিত্রটি। তবে মা অত্যাচারিত হয়ে থেমে থাকেননি। নতুন করে জেগে উঠার প্রত্যয় ব্যক্ত করেছেন দৃপ্ত কণ্ঠে:

> মা ॥... আমি যাচ্ছি, তোমার পৃথিবী থেকে অনেক দূরে। কিন্তু আবার আসব। সঙ্গে থাকবে সাত নয়, সতের নয়, কোটি কোটি নিষ্পাপ শিশু।[২০]

যারা আজ সোনালী রোদে স্নানরত, সুন্দর আগামীর স্বপ্নে বিভোর তারাই একদিন সমাজ দেশ থেকে অত্যাচারিতের কালোহাত ভেঙ্গে চুরচুর করে দেবে। সাঈদ আহমদের *তৃষ্ণায়* নাটকে মানবজীবনের বাস্তব সমস্যার উপস্থাপন করেছেন। 'বাংলাদেশের চির পরিচিত শেয়াল-কুমীর ছানার গল্প বৈশ্বিক ও আন্তর্জাতিক মাত্রিকতার অনুমোদন লাভ করেছে। 'মানুষের অস্তিত্ব এবং টিকে থাকার সমস্যা' চিরন্তন। আদিকাল থেকে বর্তমান কাল পর্যন্ত মানবজাতি তার অস্তিত্বের লড়াই-এ বেঁচে থাকার প্রশ্নে অশুভ শক্তির বিরুদ্ধে লড়াই করেছে। বিশ্বজিৎ ঘোষের বক্তব্য প্রণিধানযোগ্য:

> 'তৃষ্ণায়' যথার্থ অর্থেই বাংলাদেশের একটি পালা বদলকারী নাটক। শিয়াল এবং কুমীরের লোককাহিনীর আড়ালে আলোচ্য নাটকে অভিব্যঞ্জিত হয়েছে সাম্রাজ্যবাদ ও ঔপনিবেশিক শক্তির শোষণ থেকে সাধারণ মানুষের মুক্তির আন্তরিক আকাঙ্ক্ষা। রূপকথার মাধ্যমে আধুনিক জীবন যন্ত্রণা ও শ্রেণি সংগ্রাম উপস্থাপন করে সাঈদ আহমদ বাংলাদেশের নাটকের ধারায় সংযোজন করছেন একটি নতুন মাত্রা।[২১]

সাত.

কালবেলা, *মাইলপোস্ট*, *তৃষ্ণায়* নাটক তিনটির ফর্ম এ্যাবসার্ডধর্মী, কিন্তু বিষয় ও প্রেক্ষাপট দেশীয়। এ নাটকগুলোতে আশাবাদ–জীবনসংগ্রাম–শ্রেণীসংগ্রাম–শূন্যতা প্রভৃতি বিষয় ফুটে

উঠেছে। সাঈদ আহমদ ছিলেন জীবনবাদী নাট্যকার। জীবনের ঘটন–অঘটনের পর্যায়ভুক্ত বিভিন্ন বিষয়ে তিনি আশাবাদী চেতনার স্ফুরণ ঘটিয়েছেন, যদিও তা এ্যাবসার্ডের ভেতর দিয়েই। সাঈদ আহমদ বাংলাদেশের মানুষ ও প্রকৃতির ভিতর ও বাহিরের চেতনাকে উপস্থাপন করেছেন নিজস্ব রীতিতে। তাই তাঁর ত্রয়ী নাটক অর্থাৎ *কালবেলা*, *মাইলপোস্ট* ও *তৃষ্ণায়* বাংলার মানুষের চৈতন্যের বীজ ও অভিনব বিষয় প্রকরণের ফসল।

তথ্যনির্দেশ

১. বিশ্বজিৎ ঘোষ, *বাংলাদেশের সাহিত্য*, আজকাল প্রকাশনী, ২০০৯, পৃ. ২৭২
২. *কালবেলা* প্রথম ইংরেজি ভাষায় 'দ্যা থিং' নামে লেখা হয়। পরবর্তীতে বাংলা একাডেমী থেকে ১৯৭৬ সালে প্রকাশিত হয় সাঈদ আহমদের তিনটি নাটক। *সাঈদ আহমদের তিনটি নাটক*, দ্রষ্টব্য: *কালবেলা*, শিরোনামহীন ভূমিকা।
৩. কালবেলা, *সাঈদ আহমদের তিনটি নাটক*, বাংলা একাডেমী, ১৯৭৬, পৃ. ৩৯-৪০
৪. কালবেলা, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৮-৩৯
৫. কালবেলা, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৯-৪০
৬. নাটকটি প্রথমে ইংরেজি ভাষায় রচিত হয়। আতাউর রহমান অনূদিত *মাইলপোষ্ট* প্রথম প্রকাশিত হয় (মাসিক মোহাম্মদী ৬৭শ বর্ষ; ২য়-৪র্থ সংখ্যা, জ্যৈষ্ঠ-শ্রাবণ ১৩৭৬, পৃ. ১০৯-৪৪। রচনাকাল ১৯৬২-১৯৬৪। নাটকটির বাংলা রূপ বাংলা একাডেমী আয়োজিত নাট্য মৌসুম উপলক্ষে ১৯৬৫ সালের ২৬, ২৭ ও ২৮ মে একাডেমী মিলনায়তনের সাত রং নাট্যগোষ্ঠীর প্রয়োজনায় প্রথম মঞ্চস্থ হয়। অভিনয়ে অংশগ্রহণ করেন: সৈয়দ আহসান আলী, আবদুল্লাহ আল মামুন, আতাউর রহমান, দীন মুহাম্মদ খান, আব্দুল জলিল, ইনামুল হক এবং সাবেরা মুস্তফা। নির্দেশনা, আসকার ইবনে শাইখ। ভূমিকা, দ্রষ্টব্য পৃ. ৪৭
৭. মেহের নিগার, *সাঈদ আহমদের নাটকে অ্যাবসার্ড ধর্ম*, *সাহিত্য পত্রিকা*, বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, একচল্লিশ পর্ব, তৃতীয় সংখ্যা ॥ আষাঢ় ১৮০৫, পৃ. ১৬
৮. মাইলপোস্ট, *সাঈদ আহমদের তিনটি নাটক*, বাংলা একাডেমী, ১৯৭৬, পৃ. ৫০
৯. পূর্বোক্ত, পৃ. ৫০
১০. পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৮
১১. পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৯
১২. পূর্বোক্ত, পৃ. ৯২-৯৩
১৩. পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৬
১৪. ভূমিকাংশ, *সাঈদ আহমদের তিনটি নাটক*, বাংলা একাডেমী, ১৯৭৬
১৫. তৃষ্ণায় *সাঈদ আহমদের তিনটি নাটক*, বাংলা একাডেমী, ১৯৭৬, পৃ. ১৩১
১৬. *তৃষ্ণায়*, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৩১
১৭. *তৃষ্ণায়*, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৩২
১৮. *তৃষ্ণায়*, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৩২
১৯. *তৃষ্ণায়*, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৩২
২০. *তৃষ্ণায়*, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৩৩-১৩৪
২১. বিশ্বজিৎ ঘোষ, *নাট্য সাহিত্যের ধারা (১৯৭১-১৯৯৫)*, পৃ. ১৯৬-১৯৭